ভবতোষ দত্ত

ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

ভবতোষ দত্ত

বিশ্বভারতী গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন বিভাগ
শান্তিনিকেতন

প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৩ । সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

প্রচ্ছদলিপি : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
দিলীপ মুখোপাধ্যায়
কর্মসচিব
বিশ্বভারতী । শান্তিনিকেতন

মুদ্রক
অরিজিৎ কুমার
টেকনোপ্রিন্ট । ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৬

শ্রীমতী গার্গী দত্তকে

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের মনীষার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর চিন্তায় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা একই সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। প্রাচীন জীবনের প্রতি অনুরাগ স্বভাবতই মানুষকে রক্ষণশীল ও আধুনিক কালের প্রতি উদাসীন করে তুলতে পারে আবার আধুনিক হবার উৎসাহে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অবজ্ঞাও জন্মাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কোনোটাই হয় নি। তাঁর গদ্য-রচনায় তিনি বর্তমান কালের উপযোগী যুক্তি ও মননের অবতারণা করে থাকেন কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি পশ্চিমী ভাবুকদের থেকে উদ্‌ধৃতি দেন না। উদ্‌ধৃতি দিতে হলে উপনিষদ মহাভারত গীতা ধর্ম্মপদ ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ থেকেই দেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই-সব উদ্‌ধৃতি কখনও আধুনিক-মনস্কতার বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় নি। এজন্য প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী হলেও রবীন্দ্রনাথ একালে এখনও সম্পূর্ণই প্রাসঙ্গিক রয়েছেন।

এর কারণ হয়তো আমাদের ঐতিহ্যের সজীব প্রাণশক্তি। সেই ঐতিহ্যের শাশ্বত মর্মটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে তাতে আছে চিরন্তন মানবিকতার ধর্ম। রামায়ণ-মহাভারতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই সত্যটিকে খুঁজে পেয়েছেন। চৈতন্যের চরিতকথা আলোচনা করতে গিয়েও তিনি দেখেছেন চির-মানবের লীলা। কী করে প্রাচীনের মধ্যে আধুনিককে তিনি আবিষ্কার করলেন বা আধুনিক কোনো সমস্যার সমাধান তিনি প্রাচীন চিন্তাসূত্রে পেলেন, সে কথা ভাবতে গেলে মনে হয় ভারতবর্ষের একটা মহতী বাণী হচ্ছে ঐক্য এবং অখণ্ডতার বাণী। বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্ব উপনিষদ থেকেই এসেছিল। বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের উপলব্ধিতে সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের মীমাংসা ঘটে যায়। এটা রবীন্দ্রনাথ যেমন নির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন তেমনি তাঁর নিজের চিন্তায় ও সৃষ্টিতে এই ভাবনার দ্বারা চালিতও হয়েছেন। আমার 'বাঙালি মানসে বেদান্ত' বইতে আমি দেখিয়েছি এই বৈদান্তিক চিন্তাপ্রবণতাই বাঙালি মনীষার আধুনিকতর রূপ। এই চিন্তাই রবীন্দ্রনাথের সংহতি-চিন্তার ভিত্তি। এই চিন্তা রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথে সমান অব্যাহত আছে। এই বইয়ের একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দ

ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাসূত্রের তুলনা করেছি। তেমনি 'বঙ্কিমোত্তরণে' বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের অগ্রগতি দেখালেও দুয়েরই মানসিকতায় প্রাচীন ভারতীয় জীবনবাদকে অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখি। প্রাণ ও জড়ের অদ্বৈত চেতনার সূত্রেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতায় নৈকট্য।

এমন-কি, উনিশ শতকে পজিটিবিজম নামক যে তত্ত্বটি বাঙালি চিন্তাশীলদের ঈশ্বরহীন প্রত্যক্ষতাবাদে দীক্ষিত করেছিল রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বীকার করে নিয়ে প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর 'মানুষের ধর্ম' যার সমর্থনে—কোমৎ নয়, উপনিষদের শ্লোকই পুনঃ পুনঃ উদ্‌ধৃত করেছেন।

আমি এই বইতে চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথের চেতনায় ঐতিহ্যের ফলবান্ রূপটিকে দেখাতে। জানি, আরও বহু দিক রয়ে গেল যে দিক দিয়ে ঐতিহ্যের এই প্রবহমানতাকে নির্ণয় করা যেতে পারে। আজকাল রবীন্দ্রালোচনায় সমকালের ক্রিয়াকে যত প্রাধান্য দেওয়া হয়, ঐতিহ্যের ক্রিয়াকে ততখানি দেওয়া হয় না। কিন্তু ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারলেই রবীন্দ্রনাথকে দেখা পূর্ণতর হয় বলে মনে করি।

এই গ্রন্থের প্রেসকপি তৈরিতে সাহায্য করেছেন আমার গবেষক ছাত্রেরা—শ্রীঅপূর্বকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অঞ্জনা ঘোষ। গ্রন্থপ্রকাশে আনুকূল্য করেছেন বিশ্বভারতী গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক ড. সুব্রত চক্রবর্তী। এঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কুঞ্জকলি
রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৪০৩

ভবতোষ দত্ত

সূচীপত্র

ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে ঠিক কী বোঝায় সংক্ষেপে তা বলা কঠিন। ভারতবর্ষের আড়াই হাজার বছরের অব্যাহত ও অখণ্ডিত ইতিহাসে এত বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয়েছে, তার মধ্যে এত বিরোধিতা আছে যে ভারত-সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। বৈদিক যুগ থেকে ইদানীন্তন কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন কম হয় নি। এ দেশে সভ্যতার সূচনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা পথ ছেড়ে দিয়েছেন নবীন আগন্তুকদের। এই আগন্তুকেরা ভারতের বাইরে থেকে এসে এ দেশেই স্থায়ী হয়ে গেছে। নতুন ধর্ম, নতুন বিশ্বাস, নতুন আচারনীতি নিয়ে ভারতীয় জীবনধারাকে গড়ে তুলেছে। ইসলাম এসেছে, তার সঙ্গে এসেছে সাহিত্য শিল্প কলায় নতুনত্ব, নতুনতর জীবনচেতনা, প্রাণবান্ আদর্শ; এসেছে ইংরেজ, তারা এনেছে আর-একটা জীবনমূল্যবোধ। শুধু ধর্ম নয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণে আশ্বাসে বিশ্বাসে নতুনতর আদর্শ এবং নীতি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বস্তুত কোনো একটি ধর্ম সমাজ বা আদর্শের ইতিহাস নয়। এ-দেশে বহিরাগত শক হূন পাঠান মোগল ছাড়াও অজস্র জাতি-উপজাতির সমাবেশ প্রথম থেকেই আছে। তাদেরও নিজস্ব ধর্ম এবং আচারবিচার ভাষা সংস্কৃতি চিরকালই ছিল। উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের, পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের বৈচিত্র্যেরও সীমা নেই। যাকে আমরা আর্যধর্ম বলি সেই বেদপুরাণাশ্রিত ধর্ম ছাড়াও সহজিয়া তন্ত্রসাধনার ধারাও চলে এসেছে। আজ এদের আমরা বলি লোকধর্ম। নৃতত্ত্ববিদ্ জানেন ভারতীয় জাতি বলতে শুধু আর্যজাতিকে বোঝায় না। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলয়েড প্রভৃতি নরগোষ্ঠীও আজ ভারতবর্ষের জীবনধারায় মিলে গেছে। এই-সব জাতিদের ছিল নিজস্ব সমাজ জীবনাদর্শ এবং ভাষা। তাদের মধ্যে এখনও অনেক জাতি নিজের নিজের জীবনধারা অনুসরণ করে চলেছে। আবার তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি নামক এক সনাতন জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। আজ ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে বোঝায় বহুবিচিত্রকে নিয়ে একটি সর্বংসহ সর্বসমন্বিত এক জীবনাচরণকে।

রাষ্ট্রগঠনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য ছিল একটি

শিথিল শাসনব্যবস্থা। সম্রাট অশোক এবং সম্রাট আকবরেরর সময় ছাড়া সারা ভারত এক রাষ্ট্রশাসনে ছিল না বললেই হয়। অন্যান্য মোগল সম্রাটের আমলে দক্ষিণে রাজপুতানায় এবং অন্যান্য অঞ্চলে স্থানীয় রাজারা দিল্লির বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। হর্ষবর্ধনের সময়ে কিংবা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তাঁদের রাজ্য অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রীয় রূপটি ভৌগোলিক সীমারেখা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে, অতীতে তা কখনো দেখা যায় নি।

তবু ভারতবর্ষে আজ যে-ভৌগোলিক রূপ রাষ্ট্রীয় রূপের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, এটা কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে কীর্তিত হয়ে এসেছে প্রাচীন কাল থেকেই। পুরাণে এবং মহাভারতে ভারতবর্ষকে এই সমগ্র এবং অখণ্ড দৃষ্টিতেই দেখা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে 'ভারতবর্ষ বর্ণন' নামে একটি সুন্দর বর্ণনা আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

বিষ্ণুপুরাণেই অন্যত্র বলা হয়েছে—

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে
স্বর্গাপবর্গাস্পদ-মার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

এ একটি আশ্চর্য শ্লোক। জম্বুদ্বীপের সমস্ত দেশের মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। অন্য সব দেশই ভোগভূমি, ভারতবর্ষ কর্মভূমি। দেবতারা এই বলে কীর্তিত করেন যে স্বর্গ ধর্ম ইত্যাদি অপবর্গ লাভের পথ হচ্ছে ভারতভূমি। এখানে যারা জন্মায় তারা দেবতাদের চেয়েও ভাগ্যবান্।

এই ভারতবর্ষ এমন পবিত্র রূপে কবিদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। 'বিষ্ণু-পুরাণে' সমুদ্র-হিমালয়ঘেরা ভারতবর্ষকে বলা হল পুণ্যভূমি। রামায়ণের কাহিনীতে কবি নানা উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা দিগন্তে আমাদের নিয়ে গিয়েছেন। মহাভারতেও ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে রাজন্যবর্গকে হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রে সমবেত হতে দেখি। কবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয়ে কিংবা মেঘের পরিক্রমণে ভারতভূমিকে আমাদের সামনে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। এ-সব দিক দিয়ে ভারতের একটা সমগ্র রূপ যেন আমাদের জাতীয় চিত্তে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। এ দেশে কোনো একশাসন ছিল না, কিন্তু এ দেশের কবি ও ভাবুকদের

মধ্যে একটা ভৌগোলিক সমগ্রতার চেহারা ছিল। তাই আচার্য শঙ্কর যে চারটি প্রান্তে মঠ স্থাপন করলেন, সেই চার প্রান্ত এই ভূখণ্ডেরই প্রান্তদেশ। তাই দিয়ে যেন ভারতের সীমা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। এই একচিত্ততার একটি প্রধান কারণ অবশ্যই বৈদিক ধর্মের প্রচার। উপনিষদের রচনা হয়েছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কিন্তু তার প্রধান ব্যাখ্যাতারা ছিলেন দক্ষিণী। ভারতের অজস্র ধর্ম সম্প্রদায় উপধর্ম থাকলেও বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত স্মৃতি সংহিতা একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মানুষগুলিকে একটি সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। সমুদ্র এবং নগাধিরাজ যেমন ভারতের একটি নির্দিষ্ট সীমা রচনা করেছে, তেমনি এই সীমার মধ্যেই বৈদিক ধর্ম প্রচলিত থেকে একটি সংহতি রচনা করেছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে এল মুসলমান। তারা বৈদিক ধর্মের মানুষ নয় বলাই বাহুল্য। প্রথম কয়েকশো বছর তারা স্থায়ী হতে চায় নি। তুর্কিরা এবং মোগলরা এল বাইরে থেকে। বাবরের রাজ্য বিস্তৃত ছিল ভারতের বাইরে। কিন্তু দেখা গেল ইতিহাস-দেবতার বিধানে এই ভারত-ভূখণ্ডে এসে ইসলাম খণ্ডিত হয়ে গেল। আলবেরুনী এ দেশকে বললেন হিন্দুস্থান। এ নাম মুসলমানের দেওয়া। এই নামকরণে এ দেশের একটি স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব প্রকৃতি চিহ্নিত হয়ে গেল। এ দেশের মুসলমান হলেন ভারতীয় মুসলমান। মুসলমান ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের মিল নেই একটি অর্থে ছাড়া। দুই ধর্মই প্রাচ্যধর্ম।

ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক রূপ এবং বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সমাবেশে যে অজস্র বৈচিত্র্য বিংশ শতাব্দীর একজন কবির মনোলোকে তার সমগ্র রূপটি ফুটেছিল— তিনি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে আমরা দেখি ধ্যানগম্ভীর ভূধর এবং নদীজপমালাধৃত ধ্যানী ভারতের রূপ। এই রূপটির মধ্যে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন ভারতের ধ্যানপরায়ণ প্রকৃতিকে। রবীন্দ্রনাথের—

> নীলসিন্ধুজল-ধৌত চরণতল,
> অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
> অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল,
> শুভ্রতুষারকিরীটিনী!

—এর মধ্যে বিষ্ণুপুরাণের সেই ভারতবর্ষবর্ণনই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আবার চিরকল্যাণময়ী ভারতেই—

> প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
> প্রথম সামরব তব তপোবনে,

প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী ![১]

পুরাণের কবির চোখে এই ভারতভূমিই জ্ঞানধর্মাদি অপবর্গ লাভের তীর্থক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেও তাই। এমনি ভাবেই তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতার মধ্যে ভারতাত্মার একটি মর্মবাণীর প্রকাশ ঘটেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্যের মধ্যে একের অনুভূতি। এ দেশে এত বিচিত্র আচার ধর্ম রীতি নীতি, আবার সেই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেই একটি ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি।—

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।[২]

রবীন্দ্রনাথের মতে বহুকে নিয়ে একের এই রূপটিই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৩০৯) প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

'ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে ; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা— বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।'[৩]

রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসের গতিতে দেখেছেন ঐক্যপ্রবণতাকে। তিনি একে বলেছেন ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। এ দেশে বহুজাতির আগমন ও সমাবেশ ঘটেছে বলেই এই প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তবে এই বৈশিষ্ট্য যে রবীন্দ্রনাথের চোখেই প্রথম ধরা দিয়েছে তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের ইতিহাসের এই প্রকৃতি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর 'ভারত কলঙ্ক' (১৮৭৩) প্রবন্ধটি পড়লে দেখা যায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির আগমনকে তিনি দেখেছেন

ইতিহাসের সত্য হিসাবে, কিন্তু এর মধ্যে তিনি বিধাতার ঐক্যবিধায়ক সত্যের কোনো সাক্ষাৎ পান নি। 'এক' হয়ে উঠবার মহাঅভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেটা অনুভব করেন নি। এক জাতি হয়ে উঠবার বা গড়ে তুলবার প্রয়াস এ কালে যত সার্থক আগে তা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাটা প্রধানত ছিল বস্তুভিত্তিক—ভাবগত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা তিনি করেন নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ভারত-ইতিহাসের মধ্যে একটা তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৯১১) প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবে বলেছেন—

'এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।'[৪]

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বৈদিক এবং ঔপনিষদিক যুগের ভারতের বিচিত্র জাতিসংঘাতের একটি চমৎকার ভাবমূলক ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন জাতি তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতির আদর্শ নিয়ে ভারতে এসেছিল। সেই-সব বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সাধনা হিন্দু সাধনার ধারায় এসে সমন্বিত হয়েছে। আর্য দেবতা অনার্য দেবতায় মিলে গেছে। আর্য জাতির জ্ঞান-সাধনার সঙ্গে অনার্যজাতির ভক্তি-সাধনা মিলিত হয়েছে। পুরাণে আছে নানা বিচিত্র দেবদেবী এবং তাদের বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে আছে সমন্বয়ের নেপথ্য কাহিনী। আমরা পরে যা পেয়েছি তা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্ম নামটা পরে এসেছে, ভারতবর্ষের বিচিত্র সাধনার সমন্বিত ধারাটি পরিচিত ছিল সনাতন ধর্ম রূপে।

বিচিত্রের সমন্বয়ের তত্ত্বটি ভারতবর্ষের সনাতন প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল। উপনিষদে ঋষির উপলব্ধিজাত সত্যটি ছিল এই বহু এবং একের লীলাময় রূপ। বিশ্বের অন্তর্নিহিত পরম সত্যটি হচ্ছে এক ব্রহ্মের সত্য। তিনিই বহুরূপে প্রকাশিত বলে ঋষির উপলব্ধি ঘটেছিল। ঋষি বলেছেন একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের কাছে উপনিষদের যে দীক্ষা নিয়েছিলেন তার প্রভাব পরিব্যাপ্ত ছিল তাঁর সারাজীবনের চিন্তায়, কল্পনায় এবং কর্মে। ভারত-সংস্কৃতির এই মূল বাণীটি রবীন্দ্রনাথকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করেছিল। এমন-কি, তাঁর জীবনের মূলভিত্তিটি রচনা করেছিল এই বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ভারত-সংস্কৃতির এটাই মূল কথা। এইজন্যই আমাদের জীবনে, আচারে, অনুষ্ঠানে, ধর্মবিশ্বাসে সমাজে জাতীয়তায় বহু বিচিত্রের সহাবস্থান। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যা ঘটেছে তা ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মুসলমান এ দেশে আসার পর ভারতবর্ষের এই প্রকৃতি যে কিছু পরিবর্তিত হয়েছে তা নয়। ইসলাম ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটির সঙ্গে হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটির মিল না থাকলেও অধ্যাত্মবোধের ক্ষেত্রে কোনোই বিরোধ নেই। ভারত সব-কিছুই গ্রহণ করেছে, ইসলামকেও গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বলেছেন—

'যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেইজন্যেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী। সেইজন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা করে রেখেছে এইজন্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম করে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা।'[৫]

রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলি লেখেন ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদূ' (১৩৪২)-এর ভূমিকায়। যে বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন উপনিষদের নিবিড় অধ্যয়নে এবং ভারত-ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির অনুসরণে, সেই বিশ্বাসেই তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর মর্মগ্রহণে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালে রামমোহনের মধ্যে ভারতের সনাতন বাণীর অভিপ্রকাশ দেখেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধনাতেও বিচিত্রকে একের উপলব্ধিতে প্রকাশিত হতে আমরা দেখেছি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের প্রাচীনতম চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিচিত্রের মধ্যে এক, ভেদের মধ্যে অভেদের পরম সন্নিধানের কথা কত ভাষণে কত রচনাতেই না নির্দেশ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়েও সেই পরম এক বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রপুটের একটি কবিতায় তিনি তাঁর বিশ্বাসকে ধ্বনিত করেছেন—

মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি,
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাত জোড় ক'রে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।[৬]

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে ভারত-সংস্কৃতির যোগ এমনই নিগূঢ় যে সে রকম যোগ বোধহয় আমাদের দেশের কোনো লেখকেরই নেই। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির এই ঐক্য বাণীকে ব্যাখ্যা করেছেন তা নয়, তাঁর নিজের কাব্যসৃষ্টিও এই ভারতীয় অরূপ-সাধনারই রূপময় প্রকাশরূপে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। কাব্য-সাধনার মধ্যাহ্নকালে রবীন্দ্রনাথ এই জগৎ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য-বন্দনায় হয়েছিলেন মুখর। 'সোনার তরী' 'চিত্রা' কাব্যে কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যে ছিলেন আত্মহারা। সেই সৌন্দর্যমগ্নতার মধ্যে কবি বিশ্বের অন্তরে পরম সত্যের অনুভব করেছেন। উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন—

অগ্নির্যথৈকভুবনপ্রবিষ্টঃ
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

সেই অগ্নি ভুবনে বহুরূপে প্রকাশিত— রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও সেই পরম সৎ নানা রূপে রূপবান্। প্রকৃতির বহুবৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি সর্বান্তঃশায়ী প্রাণসত্তাটির সাক্ষাৎ পান—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

এ কথা অবশ্যই অস্বীকার্য নয় যে, যৌবনে কবি চিন্তামুক্ত রসের দৃষ্টিতেই বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকিয়েছিলেন। তাই তাঁর কবিতায় রূপ রসের বিপুল সমারোহ আমাদের কাছে এই বিশ্বজগৎকে অপরিমেয় সৌন্দর্যের আধার করে তুলেছে। তাঁর বাসনা ব্যক্ত হয়েছে গভীর মর্ত্যপ্রেমে এবং প্রকৃতির নব নব রূপ-সৃষ্টিতে। পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে এই জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দকে গ্রহণ করার মধ্যে আছে একটি ভোগপ্রবণতা যা তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিতে পরিণত করেছে আবার এই ভোগপ্রবণতার সঙ্গে মিশে আছে রূপাতীত অরূপের চেতনা। এইজন্যই রবীন্দ্র-নাথের কাব্য পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যের সঙ্গে সর্বাংশে এক নয়। অরূপের সন্ধানে তিনি খেয়া গীতাঞ্জলির ঈশ্বরলোকে যাত্রা করেছেন। সমালোচক মোহিতলাল বলেছিলেন—

'রবীন্দ্রনাথ এই অন্তরগহনের দীপশিখাকেই বস্তুপরিচয়ের মানসরঙ্গভূমিতে প্রতিফলিত করিয়া কাব্যরসধারাকে এক নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত করিলেন। তাঁহার কল্পনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ এক অভিনব ভোগবাদের সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছে, বৈরাগ্যসাধনার মুক্তি অপেক্ষা অন্যতর মুক্তির পন্থা— এই বহির্জীবনের নাটমন্দিরে কবিকরধৃত বাণীদীপের আরতি আলোকে— সুপ্রকাশিত হইয়াছে।'[৭]

গীতাঞ্জলির কাব্যরচনাকালে কবির ঈশ্বরভাবুকতা স্বদেশের বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির পথরেখা অনুসরণ করে এগিয়ে এসেছে। কবি যেন রূপের জগৎ ছাড়িয়ে অরূপের জগতে এসে পৌঁছলেন। রাজা নাটকের অরূপ ঈশ্বর গীতাঞ্জলিতে নানা রূপে প্রকাশিত হলেন কবির কাছে। এখানে ভক্ত-ভগবানের দ্বৈতলীলায় বৈষ্ণব সাধনার বাণীটি প্রতিধ্বনিত। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরাগী। বৈষ্ণব পদের অনুকরণে তিনি লিখেছিলেন ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। কিন্তু তখনও তার মধ্যে ভক্তের সেই আকুতি তেমন ভাবে প্রকাশ পায় নি। সে ছিল কেবলই অনুকরণ। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে কবি হয়ে উঠেছেন সাধক। তাঁর পিতৃদেব ছিলেন ভক্ত বৈদান্তিক। গীতাঞ্জলিতে কবি প্রকৃতির লীলায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতি ও প্রেমের আকর্ষণের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট ঈশ্বরানুভূতিকেই রূপ দিয়েছেন।

পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যে ভক্তিরসের উদ্‌বেলতা হ্রাস পেয়েছে। উপনিষদাশ্রিত দুটি প্রধান জীবনদর্শন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ। প্রথমটিতে জীব এবং ব্রহ্মের দ্বৈত সম্পর্ক অদ্বৈতবাদের সঙ্গে মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অধিকতম অংশ জুড়ে রয়েছে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। জগতের মধ্যেই পরম সত্তাকে অনুভব করেছেন। এই অনুভূতিরই চূড়ান্ত প্রকাশ গীতাঞ্জলিতে। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে দ্বৈতভাবনারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মানুভূতিতে লক্ষ্যগোচর হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অন্তিম পর্যায়ে জগতের সঙ্গে কবিচেতনার অদ্বৈত বোধ স্পষ্ট।

> যে চৈতন্যজ্যোতি
> প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
> নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়,
> আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
> মাঝখানে কিছুক্ষণ
> যাহা-কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
>
> এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
> আনন্দ-অমৃতরূপে—
> আজি প্রভাতের জাগরণে

এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তারা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।[৮]

দ্বৈতবাদী হলেন রসের সাধক। রসের লীলায় সমস্ত জগৎ লীলায়িত। উপনিষদ বলেন রস বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। সেইজন্য কবিও রসস্রষ্টা শিল্পী। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী। কবির পরিণত বয়সে কবি জ্ঞানে উপলব্ধি করেছেন 'এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে'। তাঁর এ-বোধি জ্ঞানসাধকের গভীরতম উপলব্ধিকে সরল নিরাবরণ ভাষায় প্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের সৃষ্টিতেই ভারতীয় ঋষির গভীর উপলব্ধি নানাভাবে প্রকাশিত— আর কোনো কবির কাব্যে ভারত-সংস্কৃতির নির্যাস এমন ভাবে শিল্পরূপ লাভ করে নি। তাঁর সমগ্র চেতনাই যেন উপনিষদের মর্মবাণীতে ধ্বনিত। সে-ধ্বনি এই যে, এই সৃষ্টি আনন্দের প্রকাশ। এই আনন্দময় সৃষ্টিকে তিনি দেখেছেন অখণ্ড অব্যয় অসীম সচ্চিদানন্দ রূপে। আধুনিক সমালোচক কখনও কখনও অনুযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখের তীব্রতা নেই। সত্যই নেই। কারণ সৃষ্টিকে খণ্ডিত করে দেখেন নি বলেই দুঃখ অপেক্ষাকৃত নিরর্থক হয়ে যায় যেমন ঋষির কাছে বিশ্ব ছিল অমৃতময়।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কল্পনায় ভারতীয় জীবনদৃষ্টি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। এ-প্রভাব বস্তুত কবির অবচেতন মনে আপনিই এসে পড়েছিল। কিন্তু এ ছাড়াও বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রত্যক্ষ ও সুচিন্তিত ভাবে তার যে-প্রভাব পড়েছে তার নিদর্শনও কম নয়।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি যে অনুরাগ দেখা যায় তার একটি পশ্চাৎপট আছে। বাংলাদেশে নবজাগরণের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল তার একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। এই জাগরণের সূচনায় রামমোহন নতুন করে উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের চর্চা করেছিলেন, তারই ধারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথে এসে পেঁৗছেছে। বেদান্ত চর্চা ঠাকুর পরিবারে বা ব্রাহ্মধর্মে সীমাবদ্ধ থাকে নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনের ভিত্তিতেও ছিল বেদান্ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যিক নন তিনি, ধর্মের তত্ত্ব আলোচনা করেছেন বেদান্ত অবলম্বনে। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত সাহিত্যিক। তাঁর কবিকল্পনার মূলেও ছিল বৈদান্তিক সত্য। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি যে ভাষণ দিতেন তার বিশ্লেষণ

করলেও উপনিষদ ও বেদান্তের অনুপ্রাণনা সহজেই বোঝা যায়। আবার জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি যে 'মানুষের ধর্ম' নামে জীবনতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন তারও মূলে ছিল ভারতীয় ব্রহ্মবাদ। সেই ব্রহ্মকে তিনি বলেছিলেন পরামানব।

শুধু তত্ত্বের দিক দিয়ে নয় ভারতের তপোবন-সভ্যতার প্রতি তাঁর আকর্ষণও সে-সময় থেকেই। দেবেন্দ্রনাথ বীরভূমের নির্জন প্রান্তরে ধ্যান ও সাধনার জন্য একটি আশ্রম রচনা করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনেই এই আদর্শে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। তপোবনের মধ্যে ভারতবর্ষের নিজস্ব বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। সেই ত্যাগদীপ্ত জীবন, ব্রাহ্মণের সেই সরল জীবনযাপনে জ্ঞানের সাধনা। ক্ষত্রিয় গৃহস্থেরও সেই ত্যাগপূত জীবনের থেকে অনুশাসন গ্রহণ— এই আদর্শের মধ্যেই প্রাচীন ভারতীয় জীবনের সৌন্দর্য—

নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।[৯]

এই ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন তাঁর বাল্যকালের কবিতা 'অভিলাষে'। এই চিত্রটিকেই আরও নানা ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য'র কবিতাতে। চৈতালির 'প্রাচীন ভারত' কবিতায় বলছেন—

হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।[১০]

নৈবেদ্যে তিনি বলেছেন—

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।[১১]

এই আদর্শ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ পিতার অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থাপন করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। তাঁর এই আশ্রম-পরিকল্পনার মূলে কাজ করেছিল প্রাচীন ভারতের তপোবন-আদর্শ। তপোবনের যে-ছবিটি ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে সেটি তাঁর ভাষাতেই—

'তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির

উপকরণ নিয়ে।...ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল— কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।'[১২]

শুধু পুঁথি মুখস্থ করা নয়, গুরুর সরল ঋজু চারিত্র্য শক্তিতে দীপ্ত জীবনযাত্রা শিষ্যকেও অনুপ্রাণিত করবে। শিক্ষার এই আদর্শটি ভারতের শিক্ষাদর্শের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নি এর উপযোগিতা এ-যুগে ফুরিয়ে গেছে। অবশ্য ব্রহ্মচর্যের কঠোরতা প্রথম যুগে যতখানি পালিত হয়েছে, পরবর্তী কালে তা হয় নি। সেই পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ নিজেই দেখে গিয়েছেন। কিন্তু আশ্রমের মূল অভিপ্রায়— শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিবেশে মনের বিকাশ-সাধন— এই যন্ত্রসভ্যতার যুগেও অনুসরণীয় বলে মনে করেছেন। আশ্রমের তরুণ শিক্ষার্থী-দের জন্য তিনি উপযুক্ত নাটকও রচনা করলেন শারদোৎসব, ফাল্গুনী। এই নাটকের 'পাত্র' ও পরিবেশ প্রাচীন ভারতের রাজা সেনাপতি মন্ত্রী। অচলায়তন নাটকটিও ছিল বৌদ্ধ পরিবেশে রচিত। এই-সব নাটকের মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সমপ্রাণতার নাট্যরূপ দেখতে পেয়ে আশ্রমবাসী ছাত্ররা যেন নতুন করে জীবনটাকে দেখতে পায়। সেইসঙ্গে ছিল নবপ্রবর্তিত আশ্রমের উপযুক্ত নানা ঋতু-অনুষ্ঠান। এ-সব অনুষ্ঠান বেদমন্ত্র পাঠ দ্বারা পূত হয়ে উঠত। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে সর্বত্র যখন বিদেশী ভাবাদর্শের অনুকরণ দেখা যাচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন শিক্ষাশ্রমে প্রাচীন ভারতের আশ্রম পরিবেশটি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হল, তখন তার উদ্দেশ্য হল প্রাচ্য সংস্কৃতির অনুশীলন এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঐক্য নির্ণয় করে অখণ্ড মানুষের পরিচয়টি উদ্ধার সাধন। উপনিষদের আদর্শে প্রবুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ মানুষকে দেশে কালে খণ্ডিত করে দেখতে চান নি বলেই আশ্রমের শান্ত পরিবেশের মধ্যে গুরু শিষ্যকে মানবব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেবেন— এমন আকাঙ্ক্ষাই তাঁর ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বৈদিক অথবা কালিদাসের যুগের কল্পনায় যেমন এক কালে মগ্ন ছিলেন, তেমনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ আদর্শেও তিনি ছিলেন মুগ্ধ। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল প্রথমাবধি। একদিকে উপনিষদ আর-এক দিকে বুদ্ধবাণী— দুই-ই রবীন্দ্রমানসে ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্তম নির্দেশরূপে বিরাজিত ছিল। তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্র কতখানি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন বলা যায় না। তবে বুদ্ধের নির্বাণের আদর্শের চেয়েও মৈত্রীভাবনাতেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অভিভূত। প্রেম

ও নৈতিক শুদ্ধতাটাই সর্বমানবের পক্ষে চিরন্তন বাণীরূপ লাভ করেছে। দুঃখমুক্তি ও নির্বাণের লক্ষ্য সম্প্রদায়ের ভাবনা, যেমন সংসারের মায়াবদ্ধতা সন্ন্যাসেরই প্রবর্তনা দেয়। উপনিষদ থেকে তিনি পেয়েছিলেন অখণ্ড সত্যের ধারণা, বুদ্ধদেব থেকে তিনি পেয়েছিলেন প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ। প্রেম ও মৈত্রীকে রূপ দিয়েছিলেন মহাসম্রাট অশোক। তাই অশোকের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বৌদ্ধ সাহিত্য অধ্যয়নের কেন্দ্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেছেন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষান্তরগুলি বৌদ্ধযুগের শিক্ষান্তরেরই অনুরূপ। এখানেও যেন একটি সমাজ তৈরি হয়ে উঠবে বৌদ্ধ বিহারগুলিরই মতো, যেখানে দেশের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা আসবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিখ্যাত বই *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* বইখানা পড়েন ; শুধু পড়েন নি, বইটা প্রায় নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। এই বই থেকে বহু কাহিনী নিয়ে তিনি কবিতা ও নাটক রচনা করেছেন। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কাহিনী নিয়ে যেমন 'অহল্যার প্রতি', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি বহু কবিতা ও গীতিনাট্য লিখেছেন, কালিদাসের 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব' 'শকুন্তলা'র অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরই কল্পনা নিয়ে রচনা করেছেন কল্পনা কাব্য, তেমনি বৌদ্ধ নানা জাতক থেকে তিনি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত নাটক ও কাব্য রচনা করেছেন। 'কথা' কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'মস্তকবিক্রয়', 'মূল্যপ্রাপ্তি', 'পূজারিনী', 'অভিসার', 'পরিশোধ', 'সামান্য ক্ষতি', 'নগরলক্ষ্মী' প্রভৃতি কবিতা এবং মালিনী, রাজা, অচলায়তন প্রভৃতি নাটকের গল্পাংশ তিনি নিয়েছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বই থেকে। এ-সব কবিতা ও নাটকের মধ্যে মানবচরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংশয়কে ফুটিয়ে তোলার চেয়েও বড়ো হয়েছে ত্যাগ প্রেম ও তিতিক্ষার মহৎ আদর্শ। নাগার্জুন ইত্যাদি বৌদ্ধ দার্শনিকদের তত্ত্ব অথবা বৌদ্ধ পিটকের নানা ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে বুদ্ধের মানবিক আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনুপ্রাণিত। ভারত-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দান তো আচারে-বিচারে নয় মহৎ জীবন যাপনের উদার নীতিধর্মে। রবীন্দ্রনাথ তাই একাধিক স্থলে মহাভারতের বাণী স্মরণ করে বলেছেন অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততঃ ভদ্রানি পশ্যতি। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আদর্শকে মানব সংস্কৃতি রূপেই বরণ করে নিয়েছেন। তাই বুদ্ধকে তিনি বলেন জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর বুদ্ধের নির্বাণ আদর্শ নয়— প্রেমের আদর্শকেই চিরজীবী আদর্শ বলে মনে করেছেন। বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু জীবনের শেষ

দিকে তিনি বুদ্ধকে নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন। তারই একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করি—

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।[১৬]

উল্লেখসূত্র

১. ভারতলক্ষ্মী : কল্পনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ : ১৬৮ বিশ্বভারতী
২. ভারততীর্থ : গীতাঞ্জলি, ১০৬, র.-র. ১১ : ৮৩ বিশ্বভারতী
৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস : ভারতবর্ষ, র.-র. ৪ : ৩৮১ বিশ্বভারতী
৪. ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা : পরিচয়, র.-র. ১৮ : ৪৩১ বিশ্বভারতী
৫. প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৩। দ্র. ভূমিকা : দাদূ : ক্ষিতিমোহন সেন, ১৩৪২
৬. পত্রপুট, পনেরো : র.-র. ২০ : ৪৬ বিশ্বভারতী
৭. আধুনিক বাংলাসাহিত্য : মোহিতলাল মজুমদার (১৩৪৩) 'রবীন্দ্রনাথ' (রচনা ১৩৩৮)

৮. রোগশয্যায়, ২৮ : র.-র. ২৫ : ২৯ বিশ্বভারতী

৯. অভিলাষ : র.-র. অ ১, বিশ্বভারতী

১০. প্রাচীন ভারত : চৈতালি, র.-র. ৫ : ২০ বিশ্বভারতী

১১. নৈবেদ্য, ৯৫ : র.-র. ৮ : ৭১ বিশ্বভারতী

১২. আষাঢ় ১৩৪৩, দ্র. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ : র.-র. ২৭, পৃ. ৩১৫, বিশ্বভারতী

১৩. জন্মদিনে, ৬ : র.-র. ২৫ : ৭৪ বিশ্বভারতী।

রামায়ণ চর্চা

আমাদের মধ্যে এমন একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের থেকে রামায়ণকেই বেশি পছন্দ করতেন। এ রকম ধারণার কোনো তথ্যগত প্রমাণ দেওয়া কঠিন, কারণ রামায়ণের মতো মহাভারত সম্বন্ধেও বহু সপ্রশংস উক্তি রবীন্দ্রসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। রামায়ণের মতো মহাভারত থেকেও উপকরণ নিয়ে তিনি নতুন করে কবিতা রচনা করেছেন। তবে রামায়ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ আছে, মহাভারত সম্বন্ধে নেই। সেই প্রবন্ধ লেখার অবশ্য উপলক্ষ ঘটেছিল— দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা রচনা করা। তেমনি মহাভারত নিয়ে লেখা ছোটদের গদ্যগ্রন্থ 'কুরুপাণ্ডব'ও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন।

এ-সব সত্ত্বেও রামায়ণকে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তর মনে করার কারণ সম্ভবত বাল্মীকির কবিমানসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের প্রকৃতিগত মিল। এ মিল মহাভারতের কবিমানসের সঙ্গে নেই। মহাভারত বহু কাহিনী -সমন্বিত ঘটনাসর্বস্ব মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যময় মহাকাব্য। এই কাব্যে জীবনের কঠিন গম্ভীর উদাত্ত মহিমা মানুষের ভাগ্যবৈচিত্র্যে যুদ্ধে দ্বন্দ্বে সুখে সৌভাগ্যে পাপে পুণ্যে প্রকাশিত। কাম প্রেম বীরত্ব ত্যাগ উচ্চাশা ষড়যন্ত্র সাফল্য অসাফল্য প্রতিহিংসা ক্ষমা— জীবনের নানা মানবিক বিকাশে মহাভারতের কাহিনী যেমন জটিল তেমনি নাটকীয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম নীতি ধর্ম কর্তব্য অকর্তব্য ব্যাখ্যা করেছেন সত্য, কিন্তু সমগ্র মহাভারতের কাহিনীমালায় যদি কোনো একটি তত্ত্ব থেকে থাকে, তবে সেটা দুরবগাহ নিয়তি, যার কোনো ব্যাখ্যা কবি দিতে পারেন নি, শুধু ভগবদ্গীতায় কর্মের নিষ্কামতা এবং বৈরাগ্যের শেষ আশ্রয় দিয়ে তাকে বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন মহাভারত সম্পর্কে—

'মহাভারতে যে-একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতের কর্মেই কর্মের চরম প্রাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য, রাগদ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।'[১]

এই সুর রামায়ণেও আছে।

'রামায়ণেও তাহাই; পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়ে— সকলেরই পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগে দুঃখে নিষ্ফলতাতেই কর্মের মহত্ব ও পৌরুষের প্রভাব রজতগিরির ন্যায় উজ্জ্বল অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে।'[১]

দুই কাব্যের মধ্যেই ভারতবর্ষের নিজস্ব একটি দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ করেছেন। তথাপি রামায়ণের কাব্যনির্মিতি এবং মহাভারতের কাব্য-নির্মিতিতে প্রভেদ আছে। রামায়ণ একক কবির রচনা, মহাভারত বহু কবির রচনা ও গাথার সংকলন। একক কবির রচনা বলেই রামায়ণে কল্পনার এমন একটি বিশিষ্টতা অনুভব করা যায়, যা মহাভারত থেকে আলাদা। রামায়ণে রামচরিতকে কেন্দ্রে রেখে কাহিনী গেঁথে তোলা হয়েছে। কবির সমগ্র মনোযোগ এই চরিত্রের মহিমাপূর্ণ আদর্শকে ফুটিয়ে তোলায় নিবদ্ধ। তেমনি রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রেও কয়েকটি আদর্শকে কবি ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান্। এ-সব মূল আদর্শ যাতে যথাযথ রূপ লাভ করে, কোনো প্রতিকূলতার দ্বারা খণ্ডিত না হয়, কবি সেদিকে খুবই সতর্ক। রবীন্দ্রনাথের মতে

'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামীস্ত্রীতে, যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই; সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষমাত্র।...'[২]

রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের যে-মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে আসলে তাঁর নিজের অনুরাগের বিষয়টিকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন, রামায়ণের গার্হস্থ্য সৌন্দর্যই রবীন্দ্রনাথের মনোহরণ করেছে। জীবনের এই সরল স্বাভাবিক দিক-গুলিই যে রবীন্দ্রনাথের কাছে পরম সুন্দর বলে চিরকালই প্রতিভাত হয়, এ কথা রবীন্দ্রসাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠকের অজানা নয়। নাটকীয়তা, দ্বন্দ্ব-বিরোধজনিত অশান্তি ক্ষুব্ধতা— এ-সব তাঁকে আকর্ষণ করে না। সেকালে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের মহাকাব্যের চেয়ে বিহারীলালের সরল গীতিকাব্যই ছিল তাঁর হৃদয়ের নিকটবর্তী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃত্রিম' ঘটনাপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের চেয়ে বিষবৃক্ষের 'ঘরের

মেয়ে 'সূর্যমুখী' তাঁকে বেশি টানত। বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মোহ ত্যাগ করে বাঙালির ঘরের জীবনকেই ফুটিয়ে তুলতে। ছিন্নপত্রের চিঠির পর চিঠিতে তিনি সরল স্বাভাবিক জীবনের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষণিকার কবিতাতেও তিনি মহাকাব্য রচনা ত্যাগ করে লিরিক রচনার প্রবণতাই দেখিয়ে গিয়েছেন। য়ুরোপীয় নাটকে মহাকাব্য যে-ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাত নাটকীয়তা দেখানো হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথ যে তা বিশেষ পছন্দ করতেন না, জীবনস্মৃতিতে সে আভাস স্পষ্ট।

মহাভারতের কাহিনীতে এই বিশেষত্ব। যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, হত্যা, ভূমি নিয়ে কাড়াকাড়ি, দ্যূতপণ, অগ্নিদহন, প্রবঞ্চনা ছলনা এ-সবের মধ্যে আমাদের সাধারণ জীবনের স্নিগ্ধতা মাধুর্য প্রেম ভালোবাসা হারিয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিকল্পনার পক্ষে এ ধরনের কল্পনার প্রকৃতি-সাম্য নেই। মহাভারতের জীবন যেন অন্য এক পৃথিবীর জীবন। হোমারের ইলিয়াড ওডিসির বীরযুগের কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের কাহিনী মেলে। অবশ্য মহাভারতের অতি উচ্চ নীতি ধর্ম আদর্শ পৃথিবীর কোনো মহাকাব্যেই পাওয়া যাবে না। তেমনি রামায়ণের ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির ভালোবাসা, বনবাসে রামসীতার মধুর দাম্পত্যজীবনের ছবি, সীতাকে হারিয়ে রামের বিরহ দুঃখ, প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন আলেখ্যও আর কোনো মহাকাব্যে পাওয়া যাবে না। রামায়ণ আকারে মহাকাব্য হলেও সমগ্র কাব্য জুড়ে এতে এক বিশিষ্ট কবির অন্তরের স্পর্শটি অনুভব করা যায়। তাই সব মিলিয়ে রামায়ণের একটি লিরিক সুর আছে। এটাই রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল বলে মনে হয়।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের গোড়াতেই পরিকল্পিত রামচরিত্রের যে ছবি আছে, তাও রবীন্দ্রনাথের মনোগত আদর্শেরই অনুকূল। রামায়ণ যে কোনো দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য লেখা হয় নি, বরং মানুষের চরিত্রকেই উজ্জ্বল করে তোলার জন্য লেখা— 'রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে'— এটাও একটা প্রধান কারণ যে জন্য রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই রামচন্দ্রের কিছু কিছু মনুষ্যোচিত দুর্বলতা ছিল, তবু সব মিলিয়ে রামচন্দ্র মানুষেরই আদর্শ।

'মানুষেরই চরম আদর্শ-স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শচরিত-বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।'[৩]

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি রচনার কালও রবীন্দ্রনাথের 'রামায়ণ' প্রবন্ধ রচনার কালেরই কাছাকাছি। রামায়ণের মর্ম রবীন্দ্রনাথের যা মনে হয়েছে, দুই জায়গাতেই তা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। প্রবন্ধের মধ্যে এ কথা স্পষ্টই বলেছেন দেবচরিত্রই যদি রামায়ণের বর্ণনীয় হত, তবে এই কাব্যের গৌরব থাকত না। কাব্যাংশেও ক্ষতি-গ্রস্ত হত। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাতেও কবির বক্তব্য তাই। বাল্মীকি নারদকে বললেন, এ বিশ্বচরাচর দেবতারই মহিমা, নতুন করে কাব্যে আর তাঁর কী বর্ণনা করব! মানুষের মহিমা কীর্তন করেই তিনি কাব্য রচনা করতে চান। নারদ তখন তাঁকে রামচন্দ্রের কথাই শোনালেন। রামায়ণের আদিকাণ্ড আরম্ভই হয়েছে নারদ ও বাল্মীকির সংলাপ দিয়ে কিন্তু সেখানে রামচরিত্রের বর্ণনা থাকলেও দেবমাহাত্ম্য বর্ণনা পরিহার করবেন, স্পষ্টভাবে এমন কথা নেই। নারদ রামচন্দ্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা আদর্শ মানুষের বর্ণনা। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেবতা প্রসঙ্গর অবতারণা করিয়েছেন কিন্তু পরিকল্পিত রামায়ণে দেবত্ব বর্ণনা অনাবশ্যক বলে বাল্মীকি বেশ আড়ম্বর করেই ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে কী দৃষ্টিতে দেখেন এতেই বোঝা যায়। রামায়ণ মানুষেরই কাব্য, দেবতার কাব্য নয়।

অথচ রামচন্দ্র আমাদের দেশে চিরকালই দেবতা বলেই পূজিত হয়ে এসেছেন। রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার। তিনি দশাবতারের অন্যতম। জয়দেব গীতগোবিন্দে দশাবতারের বন্দনা করবার অন্তত পাঁচশো বছর আগেই রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে রামচন্দ্রের বিষ্ণুর অবতার হয়ে আসার বর্ণনা দিয়েছেন। দশম সর্গে দেবতাদের প্রার্থনার উত্তরে বিষ্ণু বলছেন : সোঽহং দাশরথির্ভূত্বা রণভূমের্বলিক্ষমম্ করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃ কমলো-চ্চয়ম্।[৪] রঘুবংশের অন্যত্র রামচন্দ্রকে বলা হয়েছে রামাভিধানো হরিঃ।[৫] তা ছাড়া মহাভারতের শান্তি পর্বে নারায়ণীয় অংশে যে অবতারের উল্লেখ করা হয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছেন দাশরথি রাম।[৬] এ সবই হচ্ছে পঞ্চম শতাব্দী কিংবা তার পূর্ববর্তী কালের রচনা। তখন থেকেই আজ পর্যন্ত রামচন্দ্রের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বাল্মীকি-রামায়ণের আদিকাণ্ডে নারদের উক্তিতে বিষ্ণুর রামাবতার হয়ে আসার কথা ছিল না।

সেইসঙ্গে এটাও স্বীকৃত যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বিষ্ণুর অবতাররূপে মহিমারই বিস্তৃত উপাখ্যান বর্ণিত। উত্তরকাণ্ড যে পরবর্তী কালের যোজনা, এটা উনিশ শতকেই রামায়ণ-পর্যালোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছিলেন। ওয়েবার লিখেছিলেন :

It is by no means implied that the poem was of these dimensions from the first ; here, too, many parts are certainly later additions ; for example, all those portions in which Rama is represented as an incarnation of Visnu, all the episodes in the first book, the whole of the seventh book etc.[৭]

রামচন্দ্রকে মানবরূপে এবং দেবতারূপে দেখবার প্রবণতা দিয়েই পণ্ডিতেরা রামায়ণের মূল বা আদিরূপ এবং পরবর্তী সংযোজনকে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য রামায়ণের পাঠ নির্ণয়ের সূক্ষ্মতর পরীক্ষাও আছে। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের এই সূক্ষ্মতর পাঠ বিচারে যান নি, কিন্তু রামচন্দ্রের দেবত্ব-প্রতিষ্ঠাকেও গ্রহণ করেন নি। এ কথাও তো সত্য যে, রামচন্দ্রের দেবত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও প্রায় দু হাজার বছরের। বিশেষত যে-কৃত্তিবাসী রামায়ণ রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে পড়েছেন, সেই রামায়ণ রামচন্দ্রের দেবমাহাত্ম্যের বর্ণনাতে পূর্ণ। এই তথ্যকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। এর একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। 'সাহিত্য-সৃষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রকে মানুষ হিসাবে দেখিয়ে সমাজ কীভাবে ভক্তি দিয়ে তাঁকে দেবতা বানিয়ে তুলেছিল, জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির যোগ বোঝাতে গিয়ে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বললেন—

'রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে-সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে-ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয়, কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

'সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক-চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন।··· এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।'[৮]

রামায়ণের উত্তরকাণ্ড রামচন্দ্রের মানুষী মহিমা নয়, দৈবী মহিমাতেই পূর্ণ। পণ্ডিতেরা এই কাণ্ডকে বাল্মীকির রচনা বলে মনে করেন না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব যুক্তিও আছে। 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধে (১৩০৬) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে গল্প রচনার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতবর্ষের গল্প শুনতে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। কারণ প্রায়শ দেখা যায় গল্পের গতি তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে বার বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ তাই মূল গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ে। 'প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না।' তিনি উত্তরকাণ্ডকে মূল রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। তাঁর উক্তি—

'ছয়টি কাণ্ডে যে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, একটিমাত্র উত্তরকাণ্ডে তাহাকে অসংকোচে চূর্ণ করিয়া ফেলা কি সহজ ব্যাপার!··· গল্পের উপর যাহার কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকস্মিক উপদ্রব সহ্য করিতে পারে? যে বৈরাগ্য-প্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি, সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুতে আমাদের ধৈর্য রক্ষা করিয়া থাকে।'[৯]

সুতরাং উত্তরকাণ্ডের সীতা বিসর্জন ও রামচন্দ্রের দৈবীমহিমা কীর্তন গল্পের অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়েছে। মূল রামায়ণে সপ্তম কাণ্ডটি ছিল না, গল্পের স্বাভাবিকতার বিচারে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন। সীতাকে উদ্ধার করে আবার তাকে বিসর্জন দেওয়া কাহিনীকারের পরিকল্পনা হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ রসের বিচারে যা বলেছেন, পাঠের বিচারেও তাই সমর্থিত হয়। বাল্মীকি-রামায়ণের আদিকাণ্ডে কাব্যপরিকল্পনার দুটি সূচী আছে। প্রথম সূচীটি কাব্যের একেবারেই আরম্ভে বাল্মীকির জিজ্ঞাসার উত্তরে নারদের রামকাহিনীর সূত্রাকারে বর্ণনা। এই বর্ণনায় সীতা উদ্ধার এবং রামচন্দ্রের 'পিতার ন্যায়' প্রজাপালন পর্যন্তই আছে এবং যথা-রীতি কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি আছে। সুতরাং বোঝা যায় আদি কবি এই পর্যন্তই কাব্যকাহিনী রচনা করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় সূচীটি আছে সেই কাণ্ডেরই দ্বিতীয় সর্গে।[১০] এতে ক্রৌঞ্চবধ দর্শনে ব্যথিত বাল্মীকি সুপরিচিত শ্লোক উচ্চারণ করে ধ্যানাসনে বসেছেন এবং তখন রামচরিতকে আরও বিশদভাবে দেখতে পেলেন। সেই বিশদ সূচীতে সীতা-পরিত্যাগের বিষয়ও রয়েছে। পণ্ডিতরা মনে করেন পরবর্তী কোনো কবি যিনি উত্তরকাণ্ডে সীতা-বিসর্জনের কাহিনী মূল রামায়ণে জুড়ে দিয়েছিলেন দ্বিতীয় সূচীটি তিনি যোগ করেছেন রামায়ণের আদিকাণ্ডে। নারদের কাছে রামকাহিনী একবার শুনে নিয়ে সেটার পুনরাবৃত্তি এবং তার সঙ্গে সীতা-ত্যাগের অংশ যোগ করে দেওয়ার আর কোনো অর্থ হয় না। নারদের বাল্মীকিকে রামচন্দ্র সম্বন্ধে অবহিত করার পর আবার শ্লোকরচনার জন্য ব্রহ্মার আশীর্বাদ—এই দুই ঘটনা যেন কাহিনীতে স্বাভাবিক ধারাবহ নয়। তা ছাড়া উত্তরকাণ্ড লেখার শৈলীও মূল রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে মেলে না। উত্তর-কাণ্ড লেখার পদ্ধতিটা পুরাণ রচনার পদ্ধতির মতো— নানা অতিলৌকিক ও দেব-দেবীর কার্যকলাপে ভরা।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধেও এই বিশ্বাসই পোষণ করতেন মনে হয়। তিনি পরবর্তীকালে স্পষ্ট করেই বলেছেন—

'উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে।··· সে যুগে ব্যবহারের যে আট-ঘাট বাঁধবার দিন এল তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তার অগ্নি-পরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে, সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। সেই বাহবার জোরে এই জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।'[১১]

কিন্তু আদিকাণ্ড সম্বন্ধে কোথাও কোনো সংশয় প্রকাশ করেছেন বলে জানি না। অথচ আদিকাণ্ড সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা নিঃসংশয় নন। ওয়েবারের মত উদ্ধৃত করেছি। তিনি আদিকাণ্ডের সব আখ্যানকেই পরবর্তী যোজনা বলে মনে করেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, আদিকাণ্ডে রামের বিবাহ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। প্রথম সর্গের প্রথম স্ূচীতে বিবাহ ঘটনা নেই। রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হচ্ছেন—এমন সময় থেকেই কাব্যের আরম্ভ। কিন্তু দ্বিতীয় স্চীতে রামের বাল্য, শিক্ষা, বিবাহ এসবই আছে। যে-কবি উত্তরকাণ্ড লিখেছিলেন, তিনি আদিকাণ্ড লিখে-ছিলেন বলে মনে হয়। অনুমান করা যায় মূল বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ পাঁচ কাণ্ডের। আদি বা রামকাণ্ড বাদ দিলে রামায়ণের অনেক সুপরিচিত রমণীয় ঘটনাকেই বাদ দিতে হয়। তার মধ্যে একটি দশরথের পুত্রদের বিবাহ, যাকে অবলম্বন করে কৃত্তিবাস বাঙালি সমাজে অনুষ্ঠানের স্নিগ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার বিবাহের সময়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার বিবাহ। কিন্তু বিবাহের পর রামায়ণের কাহিনীতে ঊর্মিলাকে আর দেখা যায় না বলে রবীন্দ্রনাথ তাকে বলে-ছিলেন 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। রামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করে নিলেন, তখন একবারও ঊর্মিলার কথা কবির মনে পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'ঊর্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহ নগরীর বিবাহসভায়। তার পরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহসভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল।'[১২]

রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যবিশ্লেষণ অতি চমৎকার সন্দেহ নাই কিন্তু বিষয়টি 'মূল' রামায়ণেই নেই। অরণ্যকাণ্ডের যেখানে শূর্পণখা রামচন্দ্রের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, সেখানে রামচন্দ্র পরিহাস করে বলেছেন, তুমি লক্ষ্মণকে গ্রহণ করো। লক্ষ্মণ অকৃতদার।

অনুজস্ত্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান প্রিয়দর্শনঃ।
শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্ ॥[১৩]

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রামায়ণের ঘটনাধারায় উর্মিলার উল্লেখ পর্যন্ত নেই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি রামায়ণ কাহিনীকে এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখেন নি। আদি কবির কল্পনায় উর্মিলা ছিলেনই না। পরে যিনি রামায়ণে উত্তরকাণ্ড যোজনা করেছিলেন, উর্মিলা ছিলেন তাঁর কল্পনাতেই। ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' রামচন্দ্র ও সীতাকে যখন লক্ষ্মণ বনবাসের আলেখ্য দেখাচ্ছিলেন তখন সীতার মুখে একটি স্নিগ্ধ কৌতুক উক্তি বসিয়েছেন উর্মিলা সম্বন্ধে। উর্মিলার আলেখ্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে সীতা যখন বললেন, লক্ষ্মণ এটি কে; তখন লক্ষ্মণ সলজ্জ মুখে মনে মনে বুঝলেন, আহা, ইনি উর্মিলার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। কিন্তু প্রচলিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এই ঘটনাটুকুও নেই। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে তিনি ভবভূতির দেওয়া এই ছবিটিরই উল্লেখ করে বলছেন— 'ভবভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল।'[১৪]

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে ক্রিটিক্যালি পড়েন নি। তিনি পড়েছেন কাব্যরসিকের মন নিয়ে। যদিও তিনি জানতেন উত্তরকাণ্ড মূল বাল্মীকি-রামায়ণে ছিল না, এর কবি আলাদা। তথাপি তিনি এমনভাবে সমালোচনা করেছেন যেন একই কবি উর্মিলা-লক্ষ্মণের বিবাহ বর্ণনা করেও পরবর্তী পর্যায়ে উর্মিলাকে সম্পূর্ণ মুছে দিলেন। তিনি রামায়ণকে সমগ্র-ভাবেই বিবেচনা করছেন, সে-কথা মনে হওয়ার আর একটি কারণ, তিনি যেন আশা করছিলেন উত্তরকাণ্ডেও উর্মিলার প্রসঙ্গ থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ কি মনে করতেন আদিকাণ্ডের কবিই লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত লিখেছেন? আদিকাণ্ড মূল রামায়ণে ছিল কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতরাও সন্দেহ করে থাকেন। কেউ কেউ মনে করেন আদিকাণ্ডের কিছু কিছু অংশ বাল্মীকির রচনা। কিন্তু অনেকটাই যে প্রক্ষিপ্ত তাতে সন্দেহ নেই।[১৫] সন্দেহের কারণও প্রচুর। প্রথমত, এখানে বাল্মীকিকেই বর্ণিত চরিত্র হিসাবে সূচনায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এতে

বহু বর্ণনা আছে যা উত্তরকাণ্ডের পুরাণ রচনার স্টাইলে লেখা, তাতে যথেষ্ট অলৌকিকতাপূর্ণ ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে। তৃতীয়ত, অনেক স্থলেই রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়েছে, সে দৃষ্টিভঙ্গি বাল্মীকির ছিল না। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ এ-সব নিয়ে কাব্যরস আস্বাদনে বিঘ্ন ঘটান নি। বরং এখান থেকেই তিনি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার বিষয় সংগ্রহ করেছেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'ভাষা ও ছন্দ', 'অহল্যার প্রতি', 'পতিতা'— এই কয়টি গীতিনাট্য এবং কবিতার বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে নেওয়া এবং এই সবগুলিই রামায়ণের আদিকাণ্ডের বিষয়। একমাত্র 'কালমৃগয়া' অযোধ্যাকাণ্ডের বিষয়। কাব্যবিষয় মূলত আদিকাণ্ড থেকে নেওয়ার মূলে কোনো বিশেষ চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল বলে মনে হয় না। উত্তরকাণ্ডের রচনাশৈলী এবং বিষয়-প্রকৃতি এমনই যে সেটাকে মূল রামায়ণের অংশ ভাবা না যেতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে পাঠ করে গেলে আদিকাণ্ডকে মূল রামায়ণের আরম্ভ বলে পাঠ করতে কোনো বাধাই হয় না। রবীন্দ্রনাথের মনে আদিকাণ্ড সম্বন্ধে কোনো সংশয় ছিল কিনা সন্দেহ।

তবে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে যে-কয়টি কবিতা লিখেছেন, তাঁর কুড়ি বছর বয়সের লেখা বাল্মীকি-প্রতিভা ছাড়া, সেই সব-কয়টি বিষয়কেই তিনি নতুন অর্থে মণ্ডিত করেছেন। বাল্মীকি-প্রতিভা বিহারীলালের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল, এ বিষয়ে কবির নিজেরই স্বীকৃতি আছে। বিহারীলালের সারদামঙ্গলের কোনো কোনো লাইন শুধু নয়, মূল ভাববস্তুটাই যথাযথভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে থেকে গেছে। 'কাল-মৃগয়া'তেও তাই। কিন্তু অন্য কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। 'পতিতা', 'অহল্যার প্রতি' বা 'ভাষা ও ছন্দ' নিছক উপস্থাপনা-বৈশিষ্ট্যে নয়, কল্পনারীতিতেও স্বতন্ত্র, বাল্মীকির সঙ্গে মেলে না। মহাভারত থেকে নেওয়া বিষয়ের কবিতার সঙ্গে রামায়ণ থেকে নেওয়া বিষয়ের কবিতার এখানে একটা বড়ো পার্থক্য। 'কর্ণকুন্তী সংবাদে'র কর্ণের সঙ্গে মহাভারতের কর্ণের খুব একটা পার্থক্য নেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সূক্ষ্মতা যাই থাক্। 'ভাষা ও ছন্দে' রামচন্দ্রের আদর্শ-মানবত্ব আদিকাণ্ডে নারদ-বর্ণিত চরিত্রাদর্শ থেকে পৃথক নয় অবশ্য, কিন্তু এই কবিতার প্রধান বক্তব্য—

> মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
> ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে, অবিরত রাত্রিদিন
> মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।

ভাষার শব্দার্থটাই কবিতার সার্থকতা নয়, ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতেই তার সার্থকতা। ছন্দ

অর্থবদ্ধ ভাষাতে সুর ও সংগীত এনে দেয়। অসীমের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, অনির্বচনীয়কে আভাসিত করে। সাহিত্যসৃষ্টির এই তত্ত্বটাই যে এই কবিতার কেন্দ্রীয় বক্তব্য কবিতার নামেই তা প্রমাণিত। আদিতে বাল্মীকি-কবির এই বক্তব্য ছিল না। এটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা।

'পতিতা' কবিতার উৎস ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান। ঋষ্যশৃঙ্গের এই কাহিনী আছে রামায়ণের আদিকাণ্ডে নবম ও দশম সর্গে।[১৬] সেখানে ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান ঘটনাধারায় সাজানো কাহিনীমাত্র, নারীরাও বারবনিতা ছাড়া কিছুই নয়। এই বারনারীর দলে কোনো ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিশেষ কারও কথা বলা হয় নি। বরং মহাভারতের গল্পে দেখা যায় বেশ্যার দল লোমপাদের আদেশ শুনে ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকের ভয়ে পিছিয়ে এল, এক বৃদ্ধ বেশ্যা সেই দায়িত্ব স্বীকার করে। বারযুবতীদের নিয়ে সেই বৃদ্ধ বেশ্যাই ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করতে এগিয়ে যায়। সে তার কন্যাকে পাঠিয়ে দেয় ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। তাতেই সেই বৃদ্ধ বেশ্যা তার অভিযানে কৃতকার্য হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত মহাভারতে কথিত কাহিনীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'পতিতা' কবিতাটির মধ্যে বারযুবতীরা নদীর জলে নেমে স্নানাবগাহন কালে ঋষ্যশৃঙ্গকে বেষ্টন করে ধরেছিল। রামায়ণের গল্পে সরোবর বা নদীর কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু মহাভারতে আছে। সেই বৃদ্ধ বেশ্যা একটি নৌকার মধ্যে রমণীয় আশ্রম (নাব্যাশ্রম) রচনা করে বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের কাছে গিয়ে বাঁধল। নদীতীর থেকে তারা আশ্রমে প্রবেশ করল।

অতীব রমণীয়ং তদতীব চ মনোহরম্।
চক্রে নাব্যাশ্রমং রম্যমদ্ভুতোপদর্শনম্॥

রামায়ণ বা মহাভারত কোনোটাতেই বেশ্যাদের মধ্যে নারীত্বের নির্বিশেষ মাহাত্ম্যের কথা নেই। তাদের চাপল্য, দেহসৌন্দর্য, কামোদ্রেক প্রয়াসেরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তাই রামায়ণ বা মহাভারতের থেকে গল্পের বীজ সংগ্রহ করলেও 'পতিতা' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনা, 'ভাষা ও ছন্দে'র বক্তব্য যেমন রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব।

এই বিশেষত্বটি দেখা যাবে 'অহল্যার প্রতি' (১৮৯০) কবিতাতেও। এই কবিতাটি বেশ বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে। কারণ একমাত্র কবিতার নামে ছাড়া কবিতার মধ্যে কোথাও রামায়ণ কাহিনীর কোনো সূত্র বা প্রসঙ্গ নেই। শিরোনামটি বাদ দিয়ে যদি কবিতা পড়া যায়, তবে এতে যে রামায়ণের কোনো উপাখ্যানের যোগ আছে তা বোঝবার উপায় নেই। কবিতাটির আরম্ভ—

কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি
অহল্যা, পাষাণরূপে ধরাতলে মিশি
নির্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপসবিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে ?

তার পর অতি চমৎকার ভাষা এবং কল্পনা দিয়ে জননী বসুন্ধরার দিনরাত্রি বসন্ত, বর্ষা, শীতে বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ, স্বপ্ন, জাগরণ, শিশিরের নিঃশব্দ পতন, শৈবালের আবরণ রচনা, চার পাশে সংসারের পরিচিত প্রবাহ বর্ণনা ক'রে উপসংহার করেছেন।

তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চির পরিচয় মাঝে নব পরিচয়।

রামায়ণে আদিকাণ্ডে অহল্যার উপাখ্যানে ঋষি গৌতমের পত্নী সুন্দরী অহল্যার সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের ব্যভিচারের বর্ণনার সামান্যতম আভাসও এই কবিতার মধ্যে নেই। এই কবিতা পড়ে বোঝবার উপায় নেই যে কবি রামায়ণের সেই কাহিনী থেকেই কবিতার বিষয় সংগ্রহ করেছেন। বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখা যাচ্ছে মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতিকালে ইন্দ্র অহল্যার সঙ্গে অবৈধভাবে মিলিত হন। এ কাজে অহল্যারও সম্মতি ছিল। গৌতম ফিরে এসে সব বুঝতে পেরে অহল্যাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, অহল্যা সকলের থেকে অদৃশ্য হয়ে (অদৃশ্যা সর্বভূতানাম্— আদিকাণ্ড ৪৮। ৩০) প্রায়শ্চিত্ত করবে। একদিন দশরথ-পুত্র রামচন্দ্র তাকে পাপমুক্ত করবেন। এই কাহিনীতে কোথাও অহল্যার পাষাণ হয়ে যাওয়ার কথা নেই। অহল্যা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে রামচন্দ্রের প্রতীক্ষা করে থাকবেন। এই কথাই শুধু বলা হয়েছে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অহল্যার এই কাহিনী আর একটু বিস্তৃত।[১৭] সেখানে অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়ার কথা নেই। অহল্যা যে স্বামীর অভিশাপে পাষাণে পরিণত হয়েছিলেন, এটা লোকপ্রচলিত কথা, এবং এই কাহিনীর উৎস কৃত্তিবাসের রামায়ণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদি-কাণ্ডে অহল্যার কাহিনী একটু অন্যরকম। অহল্যা ইন্দ্রের কপট বেশ বুঝতে পারেন নি বলেই স্বামীজ্ঞানেই তার বাসনা চরিতার্থতায় সহায়তা করেছেন। কিন্তু গৌতম পরে যখন জানলেন, তখন

অহল্যারে আগে শাপ দিলা মুনিবর।
পাষাণ হইয়া থাক বনের ভিতর॥[১৮]

মুনির শাপে অহল্যা তিনশত বৎসর পাষাণ হয়ে কাটালেন। পরে রামচন্দ্রের পদ-ধূলি পেয়ে তাঁর পাষাণত্ব ঘুচল।

রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতার যেটুকু সূত্র অনুমান করা যায়, তার বীজ বাল্মীকিতে নয়, কৃত্তিবাসে। কিন্তু পাষাণী অহল্যারও পূর্বাপর কিছুই কবিতায় নেই। 'নির্বাপিত হোমবহ্নি' বলতে গৌতমের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ইত্যাদিকেই বোঝাচ্ছে কিনা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। নীহারিকাপুঞ্জ থেকে পৃথিবী যখন রূপ পরিগ্রহ করছিল, তখনকার জলন্ত অগ্নিপিণ্ড ক্রমেই শীতল হয়ে কোমল মৃত্তিকার আবরণ রচনা করছিল এবং নবপল্লব পুষ্প উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটছিল— তাও বোঝাতে পারে। এই অর্থও কবিতার পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে। কবি কবিতাতে পৃথিবীর সদাচঞ্চল সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনাময় জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। অহল্যা পাষাণ-রূপে যেন নিত্য নব স্বপ্ন রচনা করে চলেছিল। পাষাণী অহল্যা কি সে-সব অনুভব করে? অহল্যা রূপ লাভ করেছে, পুরাতন পৃথিবী চির-নবীন হয়ে দেখা দিচ্ছে। কবিতার এক জায়গায় 'অনুর্বরা— অভিশাপ' কথাটি ব্যবহার করায় অহল্যা এবং উষর ফলশস্যহীন পৃথিবী এক হয়ে যাচ্ছে। এটাই কবিতার মূল বক্তব্য হওয়ায় এই কবিতা আর রামায়ণ কাহিনী থাকে নি, এ হয়েছে কবিরই নিজের কল্পনার সৃষ্টি। এর সঙ্গে রামায়ণের অহল্যার আর কোনো সম্পর্কই রইল না। কবির মতে অহল্যা অর্থ হলচালনার অযোগ্য অনুর্বরা ভূমি।

এখানে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ চর্চার একটা নতুন দিক্ পাওয়া গেল। অহল্যার কাহিনীকে তিনি রূপকার্থে গ্রহণ করেছেন। কবিতায় যেটুকু বলা হয়েছে, তার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার মুক্তির একটা নতুন অর্থ করা যায়— সেটি এই যে, প্রাণের স্পর্শেই অনুর্বরা ভূমি উর্বর হয়ে উঠল। রাম প্রাণের প্রতীক, প্রাণই সৌন্দর্য, প্রাণই রমণীয়। রাম এই শব্দটির মূলে আছে রম্ ধাতু, রম্যতা সৌন্দর্য শান্তি স্বস্তি। রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনাতেও রবীন্দ্রনাথ রাম শব্দটির এই ব্যাখ্যাই করেছিলেন। তার সমর্থন ছিল রামায়ণে প্রযুক্ত রামচন্দ্রের বিশেষণে। তিনি নবদুর্বাদলশ্যাম।[১৯] রামচন্দ্র যে কৃষিধর্মরক্ষক বীরত্বের প্রতীক রূপক তা তাঁর লোকবিখ্যাত নবদূর্বাদলের মতো শ্যামবর্ণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তৃণহীন শুষ্ক অহল্যা ভূমিকেই তিনি প্রাণরসধারায় সঞ্জীবিত করে দেন। অহল্যা শব্দটির এই অর্থ রামায়ণের আদিকাণ্ডে কোথাও দেওয়া নেই। এই অর্থ রবীন্দ্র-নাথই করে নিয়েছেন। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে অহল্যার যে বিস্তীর্ণতর কাহিনী আছে,

তাতে প্রসঙ্গত অহল্যার ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে—'যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।' এবং 'হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্য তৎ প্রভবং ভবেৎ।'[২০] বৈরূপ্যকে বলে হল। তার থেকে হল্য। যে-নারীতে হল্য বা বৈরূপ্য নাই। সে অহল্যা। হল এবং হল্য শব্দের এই অর্থ কতদূর ব্যাকরণ-সম্মত জানি না। এই অর্থ থেকে আমরা সহজেই চলে যেতে পারি রূপহীনতা ও রূপবিকৃতির অর্থে। অহল্যা অতি রূপবতী।

'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। তখনই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের রূপকার্থ সন্ধান করছেন। তার পর এই অর্থ সম্বন্ধে ক্রমেই নিঃসংশয় হয়েছেন। এই কবিতা রচনার কয়েক বছর পর দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা লেখা উপলক্ষ করে রামায়ণ সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছিলেন, তাতে কোনো রূপক ব্যাখ্যা করেন নি। ১৯১১তে রামায়ণ অবলম্বন করে তিনি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ এবং আর্যধর্মের সঙ্গে শৈবধর্মের সংঘাত ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাকেও ঠিক রূপকার্থ নির্ণয় বলা যায় না— ইতিহাস-পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে ভারতের সমাজ-বিপ্লবের রূপরেখা রচনার সংগত প্রয়াস বলা যেতে পারে। তবে রূপক যে ইতিহাস নির্ণয়ে সাহায্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-প্রয়াস কিন্তু রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন নি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বিদেশী পণ্ডিতরাও রামায়ণের আলোচনা করতে গিয়ে কখনও তাকে বলেছেন রূপক, কখনও বলেছেন ইতিহাসের আভাস। ১৮৭৮-এ জার্মান পণ্ডিত ওয়েবারের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের ইংরেজি অনুবাদ হয়। ওয়েবার লিখেছেন—

In the Ramayana we find ourselves from the very outset in the region of allegory; and we only move upon historical ground in so far as the allegory is applied to on historical fact, namely, to the spread of Aryan civilization towards the South, more especially to Cylon. The characters are not historic figures, but merely personifications of certain occurrences and situations. Sita, in the first place, whose abduction by a demon and subsequent recovery by her husband Rama, constitutes the plot of the entire poem, is but a field-furrow, to which we find divine honours paid in the songs of the 'Rick' and still more in Grihya ritual. She accordingly represents Aryan husbandry, which has to be protected by Rama— whom I regard as

originally identical with Balarām 'halabhrit' the plough bearer.[২১]

সীতা বৈদিক শব্দ, ঋগ্‌বেদে তিনি কৃষিলক্ষ্মী, রামায়ণে তিনি হলরেখা থেকেই উত্থিত। আবার অহল্যাও হলচালনার অযোগ্য অনুর্বর পাষাণী ভূমি। রামচন্দ্র কৃষিকন্যা সীতাকে যেমন গ্রহণ করেছেন, অহল্যা ভূমিকেও আশীর্বাদ করে সঞ্জীবিত করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি বা শস্যসৃষ্টির ব্যঞ্জনা আসে। রাম শব্দের যে ব্যাখ্যা ওয়েবার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা না করে তার নিহিতার্থ করেছেন শান্তি বা মাধুর্য। তেমনি রাবণের অর্থ তিনি করেছেন অশান্তি বা পীড়ন। এই অর্থ অবশ্য উত্তরকাণ্ডেই আছে—

যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্‌ রাবিতং ভয়মাগতম্‌।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন্‌ ভবিষ্যসি॥
দেবতা মানুষা যক্ষা যে চান্যে জগতীতলে।
এবং ত্বামভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্‌॥[২২]

রাবণ নামের এই তাৎপর্য প্রচলিত ছিল। মহাভারতের বনপর্বেও রাবণ নামের এই ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, 'রাবয়ামাস লোকান্‌ যৎ তস্মাদ্‌ রাবণ উচ্যতে' (২৭৪-৪০)। আবার রামায়ণের টীকাকার নীলকণ্ঠও এই অর্থ করেছেন।

রক্তকরবী নাটকের প্রস্তাবনাতে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের যে রূপকার্থ দিয়েছেন সেটি সকলেরই জানা। প্রাসঙ্গিক বলে তাঁর বক্তব্যটি সংকলন করে দিচ্ছি—

'কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে।··· কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষি-পল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। এ ছাড়া শোষণ-জীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা, না একালের ?···

'আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারি বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়া-শীতল কুটীর ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।'

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সূত্র অবলম্বনে রামায়ণের রূপকের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'রামায়ণ ও ভারত-সংস্কৃতি' গ্রন্থে। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই রামায়ণের রূপক রূপে দেখার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল জার্মান পণ্ডিতদের মধ্যে। তাঁরা মূলত বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থে রামায়ণ-মহাভারতের শব্দ এবং তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে এই ব্যাখ্যা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

'রামের নামের ভিতর 'রম্' ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর 'সি' ধাতু পাওয়া যায়, এইজন্য রামায়ণ কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্মন পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটা ধাতু আশ্রয় করিয়া ঋগ্বেদের সকল সূক্ত-গুলিকে সূর্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।'[২৩]

য়ুরোপে রামায়ণ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন লাসেন। তিনিই বলেছিলেন রামায়ণ দক্ষিণভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারের রূপক। তাঁর মতে রামায়ণের আদি রূপে রামসীতার নির্বাসন ছিল হিমালয়ে; দ্বিতীয় রূপে নির্বাসনস্থল পরিবর্তিত হয়ে এল গোদাবরী। রামচন্দ্র দ্বারা অরণ্যবাসী মুনিদের রাক্ষসের উপদ্রব থেকে রক্ষার কাহিনী এল, তৃতীয় রূপে এই কাহিনী বিস্তৃততর হল; চতুর্থ রূপে এল রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযান। পরবর্তী পণ্ডিত ওয়েবার ও রামায়ণের রূপকত্বে বিশ্বাস করতেন। লাসেনের মতো তাঁরও বিশ্বাস ছিল রামায়ণে রূপকের সঙ্গে মিশে আছে ইতিহাস। য়াকোবিও তাই মনে করেছেন। তিনি ভেবেছেন, রামের নির্বাসনের মূলে ছিল প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন ধাতু আশ্রয় করে জার্মান পণ্ডিতেরা তাঁদের কল্পিত তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন য়াকোবির মত। য়াকোবি সমগ্র রামায়ণকেই ঋগ্‌বেদের ইন্দ্র-বৃত্র এবং অন্যান্য কাহিনীর রূপক বলে মনে করেছেন। তা ছাড়া ওয়েবারের দুটি মত পরবর্তীকালে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক এবং প্রতিবাদের সৃষ্টি করেছে। একটি হচ্ছে রাম-কাহিনীর মূল দশরথ-জাতক, দ্বিতীয়টি সীতাহরণের কাহিনীর জন্য হোমারের কাছে বাল্মীকির ঋণ।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে রামায়ণ নিয়ে পণ্ডিতেরা যে আলোচনা করেছেন, তার কয়েকটি প্রতিপাদ্য রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের প্রধান বক্তব্য রামায়ণে রূপকের 'সাহায্যে' ইতিহাসের সত্যকে পাওয়া যায়— রবীন্দ্রনাথও তা স্বীকার করেন। তবে সে-ইতিহাস রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস ততখানি নয়, যতখানি সামাজিক

ইতিহাস। রামায়ণের কাহিনী যে-সময়কার তখনও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে নি। সমাজের শাসনই প্রচলিত, আর্যসভ্যতার বিস্তার হচ্ছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য পাওয়ার প্রতিযোগিতা, এ-সব নিয়েই রামায়ণের যুগ। রামায়ণে যে এ-সব ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ প্রচ্ছন্ন আছে, রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্বাস করতেন। দক্ষিণে আর্য-সভ্যতার ক্রম-প্রসার এবং দ্রাবিড় সভ্যতার পার্থিব ঐশ্বর্যের সঙ্গে তার সংঘাত রামায়ণ-কাহিনীর মূল বিষয়— 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৯১১) প্রবন্ধে তিনি এ-সবই আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর বিচ্ছিন্ন মন্তব্য ছাড়াও এ বিষয়ে তাঁর দুটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৯০৭) অন্যটি 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৯১১) দুটি প্রবন্ধ চার বৎসরের ব্যবধানে রচিত। প্রথমটির বীজ দ্বিতীয়টিতে অঙ্কুরিত। সাহিত্যসৃষ্টি প্রবন্ধে তিনি জাতি ও জীবনের সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির অচ্ছেদ্যতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রামায়ণকেই প্রধানত অবলম্বন করেছেন। এই কাব্য পুথিবদ্ধ হওয়ার আগেই রামচরিত সম্পর্কে নানা পুরাণকথা দেশে প্রচলিত ছিল। সে-সব পুরাণকথা খুঁজে পাওয়া না গেলেও তাদেরই মধ্যে রামায়ণের পূর্বসূচনা ছিল, এ বিষয়ে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। 'রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে সেইরূপ একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহই প্রচলিত ছিল।' রবীন্দ্রনাথ মনে করেন রাম নামক একজন সর্বজনস্মরণীয় বীর অবশ্যই ছিলেন। তিনি অসামান্য কাজ করেছিলেন বলেই তাঁকে নিয়ে গাথাও রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কোনো কবি সেই প্রচলিত মাহাত্ম্যকীর্তনকেই কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। রামায়ণ রচনার এই উদ্ভবতত্ত্বটি অবশ্য ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন। তবে রামচন্দ্রের সব কীর্তিই ঐতিহাসিক সত্য কিনা, এ নিয়ে নানা মত থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে ঐতিহাসিক সত্য বলেই মনে করেন, কেবল সেই ইতিহাসকে রূপকের কাহিনীতে বর্ণনা করা হয়েছে। রামচন্দ্রের দক্ষিণযাত্রার ফলে যে-আর্যসভ্যতার বিস্তার হয়েছিল এটা তো লাসেনই প্রথম বলেছিলেন। আর্যসভ্যতা তখন ছিল কৃষিকেন্দ্রিক। আর 'স্বর্ণলঙ্কাপুরীর যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার একটা-কিছু মূল ছিল। এই রাক্ষসেরা অসভ্য ছিল না। বরঞ্চ শিল্পবিলাসে তাহারা আর্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল'।[২৫]

সাহিত্যসৃষ্টি প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের একটা সম্ভাব্য ইতিহাস-সত্যের উল্লেখ করেন নি। সেটা করেছেন ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রাধান্যলাভের চেষ্টা যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদের রূপক,

কিংবা রামের হরধনুভঙ্গ যে শিবোপাসকের দর্পচূর্ণ করার রূপক— এ-সব কাহিনী ও চিত্রের মধ্যেই প্রাচীন ভারতীয় সমাজবিপ্লবের ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সাহিত্য-সৃষ্টি প্রবন্ধে সে-আভাস তিনি দেন নি। পরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুমিত এই তত্ত্বে যথার্থ ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা অবশ্য এ দিকটা বিবেচনা করেন নি। এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিবাদের সঙ্গে যে রামচন্দ্রকে নির্বাসনে পাঠানোর প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।—

'অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে-একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল— এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এইজন্য একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'[২৬]

এই ষড়যন্ত্রের অনুমান ইতিপূর্বেই করেছিলেন য়াকোবি।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যে কথাটা বলতে হয়, সেটা এই যে, রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের ঘটনাধারার যে-বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে যথার্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচীন ভারতবর্ষের যে-ইতিহাস আজ আমরা জানি, তা প্রধানত বেদ পুরাণ-শিলালেখ এবং মুদ্রা -নির্ভর। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য-গুলিকে যুক্তিসংগত অনুমান দিয়ে সম্বন্ধযুক্ত করে ইতিহাস রচনা করতে হয়েছে। অনেক সময়েই তথ্য সামান্যই পাওয়া গিয়েছে। ওই সামান্য-তথ্যকেই সাধারণ সত্য হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সকলেই জানেন, মহেনজো-দড়োয় প্রাপ্ত প্রমাণগুলি এইরকম। বেদ-পরবর্তী যুগে রামায়ণ-মহাভারত রচিত। তখনকার সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস নেই। সে সময়ের সুসম্বদ্ধ সামাজিক ইতিহাস রচনার চেষ্টায় সেকালের মহাকাব্য-উল্লিখিত গল্পকেই ঐতিহাসিকেরা যথাসম্ভব ব্যবহার করে থাকেন আর কিছু নেই বলে। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক ঘটনাকেই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা রূপক হিসাবে গ্রহণ করে ইতিহাস রচনা করতে গিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত বিপরীত তথ্য এই অনুমান-নির্ভর ইতিহাসকে খণ্ডন না করছে ততদিন পর্যন্ত একে ইতিহাস বলেই মানতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ যে কবি হয়ে রামায়ণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়েছেন, এটা তাঁর সুবিধা, আবার অসুবিধাও। তাঁর কল্পনাশক্তি তাঁকে যেমন সহায়তা

করেছে, তেমনি আশঙ্কা ছিল কল্পনার অতিকল্পনায় পরিণত হওয়ার। কিন্তু একটি আশ্চর্য সংযম তাঁর কল্পনাকে যুক্তিবদ্ধ করে ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা নির্দেশ করতে সহায়তা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের যেমন ভাবরসগত ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি করেছেন যুক্তিসিদ্ধ ইতিহাস ব্যাখ্যা। মনে হয় পূর্ববর্তীদের রামায়ণচর্চার দ্বারা তিনি লাভবান হয়েছিলেন।

উল্লেখসূত্র

১. 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', প্রাচীন সাহিত্য, র.-র. ৫ : ৫১০-৫১১ বিশ্বভারতী
২. 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, র.-র. ৫ : ৫০৪-৫০৫ বিশ্বভারতী
৩. 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, র.-র. ৫ : ৫০৪ বিশ্বভারতী
৪. রঘুবংশ, দশম সর্গ, শ্লোক ৩৩
৫. রঘুবংশ, ত্রয়োদশ সর্গ, শ্লোক ১
৬. মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৯। ৮৫

সন্ধ্যাংশে সমনুপ্রাপ্তে ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
অহং দাশরথী রামো ভবিষ্যামি জগৎপতিঃ॥

৭. Albrecht Weber, *The History of Indian Literature*, 2nd ed. 1875, Translated into English, 1878, p. 194.
৮. 'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য, র.-র. ৮ : ৪১১ বিশ্বভারতী
৯. 'কাদম্বরীচিত্র', প্রাচীন সাহিত্য, র.-র. ৫ : ৫৩৮ বিশ্বভারতী
১০. দীনেশচন্দ্র সেন, *The Bengali Ramayana*, 1920, pp. 56-58.
১১. 'সাহিত্যের মাত্রা', সাহিত্যের স্বরূপ, র.-র. ২৭ : ২৫৮-২৫৯ বিশ্বভারতী
১২. 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রাচীন সাহিত্য, র.-র. ৫ : ৫৪৯ বিশ্বভারতী
১৩. অরণ্যকাণ্ড, সর্গ ১৮, শ্লোক ৩। উইনটারনিৎস এই শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। দ্রষ্টব্য *History of Indian Literature*, Vol I. 1927, p. 487.
১৪. ভবভূতি আলেখ্যদর্শন বিষয়ের ভাবটি সম্ভবত পান কালিদাস থেকে। দ্রষ্টব্য রঘুবংশ : তয়োর্যথা প্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সচিন্ত্যমানানি সুখান্যভুবন॥
১৪। ২৫

১৫. উইনটারনিৎসের বক্তব্য : There can be no doubt that the whole of Book VII of the Ramayana was added later to the work; but it has also long been recognised that the whole of Book I cannot have belonged to the original work of Valmiki. Not only are there numerous internal contradictions in the book, but the language and style, too stand out as inferior to those of Book II to VI. Moreover, in the genuine parts of the poem there is never any reference to the events in Book I. In fact there are details in this book which directly contradict the statements of the later books. —Winternitz 1927 : pp. 495-496.

১৬. এই উপাখ্যান মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্বে আছে। রামায়ণে এই কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা যতখানি মহাভারতে ততখানি নয়। রামায়ণে দশরথের পুত্রার্থী হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাবার জন্যই এই পূর্বকাহিনীর অবতারণা। মহাভারতে দশরথের নাম নেই, কোনো উপস্থিত প্রয়োজনও ছিল না। পাণ্ডবদের ভ্রমণকালে স্থান সংসর্গে ঋষ্যশৃঙ্গকে এবং তার পূর্বকথা স্মরণ করা হয়েছে মাত্র। মহাভারতে যা প্রাচীন কথা মাত্র রামায়ণে তা দশরথ-সমকালীন। এতে মনে হতে পারে রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী রচনা।

১৭. বাল্মীকি-রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৩০

১৮. কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সুখময় মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত, ১৯৮১, পৃ. ১৯। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সুপরিচিত উপাখ্যান নেই।

১৯. 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', ১৩৩২, সমাজ

২০. আপ্তের অভিধানে এই অর্থ নেই। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকাণ্ডের এই বাক্যটি উদ্‌ধৃত করে এই অর্থ নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ রচনাকালে (১৯১১) অহল্যা শব্দটির তাৎপর্য 'হলচালনার অযোগ্য' অর্থাৎ 'পাষাণ' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

২১. Weber, *The History of Indian Literature* (Translation 1878), p. 192.

২২. বাল্মীকি-রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১৬। ৩৭-৩৮

২৩. কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২৪. দীর্ঘকাল পর এই বিতর্ক আবার দেখা দেয়। কামিল বুলকে তাঁর হিন্দি বই 'রামকথা'য় সন্দেহাতীত ভাবে দেখিয়েছেন দশরথ জাতক রামায়ণের পরবর্তী রচনা। হোমারের কাছে বাল্মীকির ঋণের মতবাদ বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা প্রত্যাখ্যান করলেও ইদানীং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর পুনরুক্তি করেছেন।

২৫. 'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য। দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল শিল্পাশ্রিত সভ্যতা। অপরপক্ষে আর্যসভ্যতা ছিল কৃষি-আশ্রিত। এ মত পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত।

২৬. 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', পরিচয়, র.-র. ১৮ : ৪৩৩

মহাভারত-পাঠ

মহাভারত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে' তিনি সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে যে-সব প্রবন্ধ লিখেছেন, তার মধ্যেও মহাভারত স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয় নি। অবশ্য 'আধুনিক সাহিত্য' বইতে বঙ্কিম-চন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' সমালোচনা সূত্রে মহাভারত সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে। এ-রকম প্রাসঙ্গিক আলোচনা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গদ্য-রচনাতে ছড়িয়ে আছে। মহাভারত নিয়ে সেভাবে কিছু না লিখলেও এর থেকে মূল কথাবস্তু সংগ্রহ করে রবীন্দ্র-নাথ অন্তত পাঁচটি কাব্যনাট্য রচনা করেছিলেন, চিত্রাঙ্গদা (১২৯৮), বিদায়-অভিশাপ (১৩০১), গান্ধারীর আবেদন (১৩০৪), নরকবাস (১৩০৪) এবং কর্ণকুন্তীসংবাদ (১৩০৬)। রামায়ণ থেকে তিনি নিয়েছিলেন তিনটি কবিতার কথাবস্তু, 'অহল্যার প্রতি', 'ভাষা ও ছন্দ' এবং 'পতিতা'। সর্বশেষ কবিতার মূল কাহিনী মহাভারতেও আছে। রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ আছে। সেটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকাস্বরূপ লিখিত এবং 'প্রাচীন সাহিত্য' সংকলিত।

রামায়ণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথা আমরা সকলেই জানি। এই শ্রদ্ধার মূলে ছিল রামায়ণের সুউচ্চ নৈতিক আদর্শ। অবশ্য শুধু নীতি আদর্শ ছিল বলেই যে রবীন্দ্রনাথ এই মহাকাব্যের অনুরাগী ছিলেন, এ কথা বলা সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। বাল্মীকিকে বলা হয় আদিকবি। তার কারণ রামায়ণেই প্রথম একজন শিল্পী-কবির আবির্ভাব। রামায়ণের মূল কাহিনীর মধ্যেই এমন একটি বিশেষত্ব আছে যার বর্ণনায় এই শিল্পী-কবির লেখনী অসামান্যতা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির পরবর্তীকালের যোজনা, কিন্তু বাকি ছয়টি কাণ্ডের মধ্যেই কাহিনীর বিন্যাস এবং ভাবগত ঐক্যের দ্বারাই একজন মহৎ কবির কীর্তিকে অনুভব করা যায়। সেই মহৎ কবির অন্তরের কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটকে অভিনব উপায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। আরও নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের মর্মকথা নানাভাবে বলেছেন। রামায়ণের সঙ্গে মহাভারতের একটি বড়ো পার্থক্য তিনি অনুভব করেছিলেন কাব্যসৃষ্টির অভিপ্রায়ের দিক দিয়ে। তাঁর ভাষায়—

'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই; সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষমাত্র।'

মহাভারতের রস ঠিক এ-রকম নয়। সেই কাব্যেও পিতা-পুত্র, মাতা, পত্নী, সখা, গুরু-শিষ্যের নানা পার্থিব সম্পর্ক কাহিনী-বন্ধন করেছে, কিন্তু সমগ্র মহা-কাব্যের মধ্যে এই পারিবারিক বা মানবিক সম্পর্কের মাধুর্যটাই কাব্যের মূল রস হিসাবে পাঠককে অভিভূত করে না। আরও বড়ো একটা অনুভূতি— ভাগ্য, নিয়তি, কর্মফল, কাল ও ধর্মপালন, 'মহাভারতের অসংখ্য কাহিনী, অসংখ্য চরিত্র, অসংখ্য ঘটনাকে অতিক্রম করে' সর্বোপরি পাঠক-মনে বিরাজ করতে থাকে। ভারতবর্ষের এই দুই মহাকাব্যের রস দুই রকম। কালান্তরের 'আরোগ্য' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'মহাভারতের আখ্যানভাগেরও অধিকাংশ যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা অধিকৃত— কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয়। নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্তসমুদ্র থেকে উদ্ধার ক'রে পাণ্ডবের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয় নি। এতে দেখা যায়, জিত সম্পদ্‌কে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ ক'রে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন— এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ।'

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই কাব্যের যে-কোনো একটি কাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবকে বুঝতে গেলেই অন্য কাব্যের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। তার কারণ কাব্যের রস আলাদা হলেও এই দুই কাব্যের উদ্ভবের প্রকৃতি এবং ভারতবর্ষের পাঠক-সাধারণের উপর তার প্রতিক্রিয়া একই রকমের। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই একটি বক্তব্য প্রসঙ্গেই দুই কাব্যেরই উল্লেখ করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন—

'বস্তুত ব্যাস-বাল্মীকি তো কাহারো নাম ছিল না। ও তো একটা উদ্দেশ্যে নামকরণ মাত্র। এতবড়ো বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ, আমাদের ভারতবর্ষ-জোড়া দুইটি কাব্য, তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে— কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে।'

ভারতবর্ষের এই দুই মহাকাব্যের উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতমহলে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। তাঁরা অবশ্য সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে, কাব্য দুইটি কোনো এক সময়ের রচনা নয়। এক সময়ের রচনা না হলে অবশ্যই কবিও একইজন থাকতে পারেন না। মহাভারতের মূল ঘটনা— কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে বিবাদ বহু প্রাচীন কালের। এই কাহিনীর সঙ্গে বহু বছর যাবৎ বহু ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে গিয়েছে। এ-সবই ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে নানা সময়ের লোককথা, উপকথা, গাথা ইত্যাদি বিচিত্র নীতি ধর্ম-অনুশাসন বিশ্বাসের সৃষ্টি। মহাভারতের কাহিনীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে কুরু-পাণ্ডবের গৃহবিবাদের মূল গল্পের সঙ্গে আরও নানা গল্প এসে পড়ে সমগ্র কাব্যখানাকেই এক জটিল বস্তু করে তুলেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কয়েকশত বৎসর লোকের মুখে সে-সব কাহিনী সমাজ-জীবনের আবর্তের মধ্যে থেকে তৈরি হয়ে উঠেছিল। মহাভারতের মূল গল্পের শাখা-প্রশাখারূপেই যে তারা সংলগ্ন হয়েছে তা নয়, মূল গল্পকেও কোনো কোনো সময় পরিবর্তিত করে থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞরাই বলেছেন—

The first impression a critical reader would get from the *Mahabharata* is that, it is not the composition of a single author, not even of those of one generation ; he soon notices that it is an assemblage of heterogeneous elements— a compilation involving many authors of varying abilities, who added a considerable amount of adventitious matter to the original epic nucleus from time to time. The great epic in the present from is the outcome of a long and continuous literary activity.[১]

মহাভারতের উদ্ভব সম্বন্ধে এই মতটিকে রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণই বিশ্বাস করতেন। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩২) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, সারা দেশে বিভিন্ন সময়ে যে মননধারা এবং ইতিহাস-কথা চলে আসছিল, মহাভারতে সে-সবই সংহত হয়ে এসেছিল। তাঁর ভাষায় 'মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাস-কথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে।··· দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ

করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজের স্থির-প্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল।... এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্র দৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে।'

রবীন্দ্রনাথ এখানে মহাভারতের যে-সামগ্রিক রূপটি কল্পনা করেছেন, তা সমগ্র ভারতীয় মানস থেকে তৈরি হয়ে ওঠা ছবি। ঐতিহাসিকেরা এমন করে তাকে প্রকাশ করতে পারেন না। কিন্তু তাঁরা তথ্য দিয়ে যে-কথাটি বলেন, রবীন্দ্রনাথ রসের দৃষ্টিতে সেই কথাই বলেন। মহাভারতের উদ্ভবের এই প্রক্রিয়ার কথা উনিশ শতকে ওয়েবার প্রভৃতি পণ্ডিতেরাই বলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র বইতে তাঁদের মতের আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (সাধনা, ১৩০১ ফাল্গুন)। সেই সূত্রে মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না, কারণ তিনি বঙ্কিমের মতের সমালোচনাই করেছেন কিন্তু নিজের মতটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে বলেন নি। তবে এখানেও তিনি বলেছেন 'মহাভারতে যে নানা কালের নানা লোকের রচনা আছে তাহা স্বীকার্য।' রবীন্দ্রনাথের কথা আর একটু উদ্ধৃত করি—

'বঙ্কিমবাবুর প্রমাণমতে দেখতে পাইতেছি, ব্যাসরচিত মূল মহাভারত বর্তমান নাই। এখন যে মহাভারত পাওয়া যায়, তাহা ব্যাসের মুখ হইতে বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়নের মুখ হইতে উগ্রশ্রবার পিতা, পিতার মুখ হইতে উগ্রশ্রবা, এবং উগ্রশ্রবার মুখ হইতে অন্য কোনো-একজন কবি সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, এ মহাভারতের মধ্যেও কালক্রমে নানা লোকের রচনা মিশ্রিত হইয়াছে; তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্লিষ্ট করিবার কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় আপাতত স্থির হয় নাই। তৃতীয়ত, অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তুলনা-দ্বারা মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবারও পথ নাই।'[২]

মনে হয় এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে মহাভারতের উদ্ভব সম্পর্কে ধারণার সূত্রপাত হয়। পরবর্তী জীবনেও সে ধারণার পরিবর্তনের কারণ ঘটে নি। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে একটি ধারণা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল, সেটি এই যে, মহাভারত ঠিক ইতিহাস নয়। কিন্তু এতে ইতিহাসের অনেক সংকেত লুকিয়ে

আছে। কিন্তু এর কাব্যত্ব সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। সেইজন্যই তিনি বলেন, 'বঙ্কিম মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি।' তাঁর মতে মহাভারতে ঐতিহাসিক তথ্য যা পাওয়া যায়, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর কাব্যত্ব। কাব্যত্বেই মহাভারত অসাধারণ, ইতিহাসে নয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ইতিহাসের তথ্য আমাদের দেয় বিশেষ একটা কালের বা সময়ের পরিমিত ঘটনাকে, কিন্তু কাব্য দেয় এমন একটা সত্যবোধকে যা শুধু ক্ষণকালের নয়, চিরকালের। এই প্রসঙ্গেই তিনি সূত্র নির্দেশ করেছেন এই বলে—

'তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে fact কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনা-বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।'

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতে ইতিহাসের সত্যকে উপেক্ষা করেন নি। বরং মহাভারতে যে-ঘটনার বিবরণ আছে, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বোঝাবারই চেষ্টা করেছেন যুক্তির সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে। আধুনিক ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত বলবেন, যুক্তির সঙ্গে কল্পনাকে মেশালে যুক্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তথ্যের উপরেও নির্ভর করা যাবে না। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিক পাথুরে প্রমাণ নিয়ে চলতে চান নি। এখনকার ঐতিহাসিকেরা কঠোরভাবে তথ্যপ্রমাণে বদ্ধ থাকতে চান, কিন্তু উনিশ শতকে ওয়েবার, লাসেন প্রভৃতি কিছু পণ্ডিত ছিলেন যাঁরা স্বল্প তথ্য এবং বিপুল পরিমাণ কল্পনার উপর তাঁদের মতবাদ তৈরি করেছেন। জার্মান পণ্ডিতই রামায়ণকে কৃষিকার্যের রূপকে পরিণত করেছেন। রামের নামে রম্ ধাতু এবং সীতার নামে সি ধাতু আছে বলেই এমন ব্যাখ্যা সম্ভব। রামায়ণের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি রাবণকে বলেছেন চীৎকার বা অশান্তি।[৩]

ঠিক রূপক ব্যাখ্যা না করলেও রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা স্বকীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন প্রবাসীতে (বৈশাখ ১৩১৯)। এই প্রবন্ধে রামায়ণ-কাহিনী এবং পুরাণের নানা কাহিনীগুলির ভাবগত বিশ্লেষণ করে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশেষত বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগের একটা সামাজিক ব্যাখ্যা তিনি দেন। প্রাচীন ভারতে নানা দেবতার মধ্যে সংঘাতের তাৎপর্য আবিষ্কার প্রসঙ্গে এ দেশের বিভিন্ন বর্ণ-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের আপন প্রকৃতি প্রতিষ্ঠা করবার

একটা ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই চেষ্টা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন— ইহা ভাবগত যুগ— অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করিতে পারি না।' তিনি আগে অন্যত্র বলেছেন, মহাভারত বহু শতাব্দীর বিক্ষিপ্ত জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর সংগ্রহ। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি নির্দিষ্ট করেই বলছেন যে, বৌদ্ধধর্ম যখন পুরোনো বৈদিক ধর্মের মধ্যে ভাঙন ধরিয়েছে, সেই সময়ে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে শক হুন প্রভৃতি বিদেশী অনার্যরা এসে সমাজে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করে। সেই সময়েই ভারতবর্ষীয় আর্যপ্রকৃতি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করে। আর্যজনশ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্য-সীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। তার পর চেষ্টা চলল সামাজিক প্রলয় ঝড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলি খুঁজে নিয়ে জোড়া দেওয়ার। 'তখনকার যিনি ব্যাস নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে, পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস এক ব্যক্তি না হইতে পারেন, কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি।'[৪] এখানে রবীন্দ্রনাথ ব্যাসকে ব্যক্তি হিসাবে দেখছেন না, দেখছেন সমাজের একটা বিশেষ প্রবণতার প্রতীক হিসাবে। রবীন্দ্রনাথকেই আবার উদ্ধৃত করি—

'আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এইসঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস।'[৫]

এই যে সংগ্রহ— মহাভারত, সে কেবলই উদ্দেশ্যহীন সংগ্রহমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, মহাভারতের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্যের তত্ত্ব আছে। এতে অনেক গল্প গাথা আছে। এই গল্পগুলি মানুষের অস্তিত্বের বিচিত্র এবং বহুমুখী সংকট দ্বন্দ্ব সংশয় জিজ্ঞাসার দ্যোতক। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি চরম লক্ষ্যের আলোকবর্তিকা মহাভারত জ্বালিয়ে রেখেছে। তার নাম ভগবদ্গীতা। রবীন্দ্রনাথ ভালোমতোই জানেন যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এর মধ্যে 'লজিক-গত' অসংগতি দেখতে পান।

এর মধ্যে জোড়াতাড়ার একটা চেষ্টা আছে। সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, সব-কিছুকে মিলিয়ে দেবার সুস্পষ্ট চেষ্টা গীতাতে দেখা যায়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে এটা লজিক্যাল হয় নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এর মধ্যেই 'বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্য আছে।' গীতাতে যজ্ঞের কথাও আছে, যজ্ঞের নিন্দাও আছে, ভক্তির কথাও আছে, যোগের কথাও আছে। এই বিরোধের মধ্যেই মানবজীবনের পরিপূর্ণ পরমা গতির আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত।

পরবর্তী কালের লেখা 'A Vision of India's History'-তে এই মূল কথাগুলি বললেও কিছু রূপক ব্যাখ্যাও আছে। যেমন অর্জুনের লক্ষ্যভেদকে তিনি প্রকারান্তরে বলেছেন যোগক্রিয়া।—

The trial is obviously of a spiritual nature. The fixed centre of Truth in the heart of the revolving wheel of the World *(Samsara)* is reflected in the depth of our own being, which can be reached by the one-pointed concentration of Yoga. Is not this the doctrine of the Gita in the language of a picture ?[৮]

স্বভাবতই মহাভারতের মতো বিপুল গ্রন্থে যেখানে অন্তত ভৌগোলিক উল্লেখগুলি বাস্তব, সেখানে অনেক ঘটনাই কোনো বিস্মৃত অতীতে ঘটেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের আধিপত্যের দ্বন্দ্বকে এবং মহাভারতে ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের উপদেশপুষ্ট পাণ্ডবের সঙ্গে দুর্যোধনের দ্বন্দ্বকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক গতির সংকেত বলে মনে করেছেন— তাতে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসকে না পেলেও সমাজমানসের গতিপ্রকৃতির সংকেতকে পাই। তাই তিনি মহাভারতকে কাব্যই বলেন। কিন্তু কবিত্বময় ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক কাব্য। ইতিহাসের দিকটি আপাতত স্থগিত রেখে কাব্যের দিক দিয়ে মহাভারতকে কী চোখে তিনি দেখেছেন সেটাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

'সাহিত্যের স্বরূপ' বইতে 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—

'মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে।'

এখানে রবীন্দ্রনাথ গড়ন বলতে শিল্পরূপকেই বোঝাতে চান। মহাভারতের শিল্পরূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন নি। সেরকম প্রথাসিদ্ধ আলোচনা তাঁর কাছে প্রত্যাশিত নয়। আমাদের অলংকারশাস্ত্রে মহাকাব্য কী রকম হয় তার

সংজ্ঞা এবং বর্ণনা দেওয়া আছে। অ্যারিস্টলও এ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সে-সব ভেবে 'গড়া' কথাটার ব্যবহার করেন নি। এই-সব বহিরঙ্গ লক্ষণ ছাড়াই সাহিত্যবস্তু মাত্রেরই একটা নিজস্ব প্রকাশরূপ থাকে, গভীরতর অর্থে ইংরেজিতে তাতে বলে ফর্ম। এই ফর্মের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণ দেওয়া কঠিন। কবির অন্তরের ভাব প্রকাশরূপটিকে উদ্ভাবন করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ একেই গড়ন বলেছেন বলে মনে হয়। অলংকারশাস্ত্রে মহাকাব্যের যে-লক্ষণ নির্দেশ করা আছে, মহাভারতের মতো কাব্যের পক্ষে তা নিতান্তই অপ্রতুল। পাশ্চাত্যে Epic of growth এবং Epic of art নামে যে দুই শ্রেণীর মহাকাব্যের কথা পাই, মহাভারত অবশ্যই তার প্রথম শ্রেণীতে পড়বে। কিন্তু মহাভারতের যে-ব্যাপকতা, এবং গভীরতা আছে, তার কোনো লক্ষণই সূচিত হয় না এই অভিধার দ্বারা। এই ব্যাপকতা এবং গভীরতার জন্য মূল কাহিনীর সঙ্গে আরও অনেক নীতিমূলক বা অন্যবিধ কাহিনী এর সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছে। মহাভারতের গড়ন যদি হত আধুনিক কালের কোনো একক প্লট-সমন্বিত নাটক উপন্যাস বা গল্পের মতো, তবে এতে আর কোনো ভার সইত না। বস্তুত মহাভারতের জটিল বিস্তার জগতের আর কোনো সাহিত্যবস্তুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়। মহাভারত মহাভারতেরই মতো।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে গল্পরচনার মধ্যে কোনো সুডৌল একাভিমুখিতা নেই। তিনি লক্ষ্য করেছেন 'বর্ণনা, তত্ত্বালোচনা ও অবান্তর প্রসঙ্গে তাহার গল্পপ্রবাহ পদে পদে খণ্ডিত হইলেও প্রশান্ত ভারতবর্ষের ধৈর্যচ্যুতি দেখা যায় না। এগুলি মূল কাব্যের অঙ্গ, না প্রক্ষিপ্ত সে আলোচনা নিষ্ফল; কারণ, প্রক্ষেপ সহ্য করিবার লোক না থাকিলে প্রক্ষিপ্ত টিকিতে পারে না।...ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না, কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই। ...গল্পের শেষ শুনিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। চিন্তা করিতে করিতে প্রশ্ন করিতে করিতে, আশপাশ পরিদর্শন করিতে করিতে ভারতবর্ষ সাতটি প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং আঠারোটি বিপুলায়তন পর্ব অকাতরচিত্তে মৃদুমন্দগতিতে পরিভ্রমণ করিতে কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না।'[৭] স্পষ্টতই এখানে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের একটা বিশেষ ধরনের প্রকরণের কথাই বলছেন। ইতিপূর্বে যে-'গড়নে'র কথা বলা হয়েছে, এ হচ্ছে তাই। মহাভারত-জাতীয়

কাহিনীর গড়ন এমনই মন্থর, বহুভারমণ্ডিত এবং শিথিল। পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে এই গড়ন ত্রুটিপূর্ণ, কেননা গ্রীক আলংকারিক অ্যারিস্টটল প্লটের যে আদিমধ্যঅন্ত-সমন্বিত গঠনের কথা বলেছিলেন, মহাভারতের প্লট তার থেকে আলাদা। য়ুরোপে নাটকে কাব্যে উপন্যাসে আদিমধ্যঅন্ত-সমন্বিত সুডৌল প্লটের ব্যবহারই সর্বস্বীকৃত। মহাভারতের প্লট সে-জাতীয় নয় এবং শুধু মহাভারত নয়— সংস্কৃত সাহিত্যে এ ধরনের শিথিলবদ্ধ কাহিনী রচনাই ছিল আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করেছেন, সেটা কাব্যের দোষ না গুণ, সে-বিচার নিরর্থক। কারণ এই বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই মহাভারত রামায়ণ এবং অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্য গড়ে উঠেছে— বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় পাঠক তার রস উপভোগ করে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মেঘদূত কাব্যে যেমন পূর্ব-মেঘ উত্তর-মেঘ আছে, প্রাচীন সব কাব্যেই তেমনি দুটি তাৎপর্য আছে। মেঘদূতের পূর্ব-মেঘ মানবলোকের বর্ণনা, উত্তর-মেঘ তেমনি আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যলোকের বর্ণনা। আজকালের ভাষায় আমরা পূর্ব-মেঘকে বলি বাস্তবজীবনের কথা। উত্তর-মেঘ স্বপ্নের জীবন না হলেও বাস্তব নয়। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কালিদাসের কুমারসম্ভবে ও শকুন্তলায় এরকম দুটি পর্ব আছে। এর যেটি প্রথম পর্ব অর্থাৎ মানবজীবনের বাস্তব কাহিনী, সেটাই য়ুরোপীয় কবির কল্পনার পরিধি। তার বাইরে তিনি আর যাবেন না, অবাস্তব হবে বলেই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন— 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্মন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা-নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দৈবক্রমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার যে মিলন হইয়াছে তাহা য়ুরোপের নাট্যরীতি অনুসারে অবশ্য ঘটনীয় নহে। কারণ, শকুন্তলা নাটকের আরম্ভে যে বীজবপন হইয়াছে এই বিচ্ছেদই তাহার চরম ফল।'[৮]

এই সূত্রটি অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের মানসিকতার সঙ্গে মহাভারতের অন্তর্নিহিত মানসিকতার মিল দেখিয়েছেন। দ্বন্দ্বের মধ্যেই মানব-জীবন-সম্ভোগ এবং মানবজীবন উত্তরণের দুটি পর্ব আছে। মহাভারতে জীবন-ভোগের তীব্রতা— সূচ্যগ্র মেদিনী নিয়ে সর্বনাশা সংগ্রাম, শেষ পর্যন্ত মহাপ্রস্থানেই অবসিত হল। জীবনের ভোগ-দুঃখের আবরণ পেছনে ফেলে রেখে সর্বরিক্ত হয়ে চরম সত্যটিকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষের যাত্রাকেই মহাভারতের কবি জীবনের

শেষ সার্থকতা বলে কাব্যকে সমাপ্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাই আবার উদ্ধৃত করি— 'মহাভারতে যে-একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতের কর্মেই কর্মের চরম প্রাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য, রাগদ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।

'সেইরূপ কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।'[৯]

মহাভারতে বিপুল কর্মান্দোলনের মধ্যেই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বাঁশি যে শোনা যায় তা নয়, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর শান্তি- ও অনুশাসন-পর্বেই কাহিনীর গতি বৈরাগ্যের অভিমুখী হয়েছে। আমরা যেন মহাভারতের পূর্ব-মেঘ ছেড়ে উত্তর-মেঘের দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছি। কাহিনীর এই পর্বান্তরণকেই তিনি বলেছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্বর্গপ্রাপ্তি।[১০] গল্পপ্রিয় পাঠকের কাছে গল্প যেখানে শেষ হওয়া উচিত ছিল, কবি সেখানে থামলেন না। অত বড়ো গল্পটিকে খেলাঘরের মতো ভেঙে দিলেন। অত বড়ো অর্জুন চরিত্র সৃষ্টি করে পরে তার পরিণাম হল এই যে সামান্য দস্যু কৃষ্ণের রমণীদের অর্জুনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেল! অর্জুন গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'অর্জুনের অভাবনীয় অবমাননা'। কাহিনীর এমন দিকপরিবর্তন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট মানসিকতারই ফল। একে আমরা যে অবমাননা বলে মনে করি, তাও আমাদের পাশ্চাত্য সাহিত্যশিক্ষার ফল।

সাহিত্যের দিক দিয়ে মহাভারতের অনন্যত্ব তার চরিত্রসৃষ্টিতে। কোনো-এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে বলেছিলেন 'চরিত্র চিত্রশালা'। মহাভারতে মূল কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলি ছাড়াও সংখ্যাতীত চরিত্র আছে। তাদের বিচিত্র কর্মক্রিয়া কোনো প্যাটার্নের মধ্যেই বদ্ধ করা যায় না। সুউচ্চ নৈতিক আদর্শ থেকে নীচ আচরণ পর্যন্ত নানা চরিত্র-বিকাশ কখনও দীর্ঘ কখনও ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রধান চরিত্রের সম্পর্কেই মন্তব্য করেছেন। তাদের মধ্যেও মানব-চরিত্রের আশ্চর্য জটিলতা লক্ষ্য করে তিনি অভিভূত। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে নানাভাবে তাঁর মনোগত আদর্শ অনুযায়ী প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। মানুষকে (বঙ্কিম কৃষ্ণের মানবত্বই

প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন) এভাবে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সম্ভবত মহাভারতকারের কৃষ্ণ দেবতা নহেন, অনুশীলনপ্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি নহেন, তিনি কৃষ্ণ।' বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের গবেষণা-প্রবণতাকে উপেক্ষা করে সাহিত্যরূপ সৃষ্টিতে তাঁর সার্থকতা-অসার্থকতার উপরেই বেশি জোর দিতে চেয়েছেন। কৃষ্ণকে দেবতা নয়, মানবরূপেই তিনি ভাবতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণ-চরিত্রের দোষগুণকে ঈশ্বরত্ব দিয়ে ঢেকে দিলে মহাকবির কাব্যসৃষ্টির মহিমাকেই ক্ষুণ্ণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণোক্তির মধ্যে মহাভারতকারের মানবচরিত্রজ্ঞতা এবং হৃদয়ের উচ্চতাকেই দেখেছেন— বঙ্কিম কৃষ্ণের যে বর্ণনাকে ঐতিহাসিকত্বের প্রমাণ বলতে চান, রবীন্দ্রনাথের মতে তার দ্বারা ঐতিহাসিকত্ব নয় বরং কবিকল্পিত একটি মানবিক আদর্শই প্রমাণিত হয়। কোনো একটি অজ্ঞাতনামা কবির মনে মহত্ত্বের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল এবং তার সেই উচ্চতম আদর্শ সৃষ্টিই মহাভারতের কৃষ্ণ। কর্ম-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্যই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবৃত্তান্ত মহাকাব্যে কবি রূপ দিয়েছেন। কৃষ্ণ অর্জুন ভীষ্ম ভীম কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি প্রধান নায়কমাত্রেই কর্মবীরের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল। এমন-কি, গান্ধারী এবং দ্রৌপদীও কর্তব্যনিষ্ঠার মহিমায় দীপ্তিমতী। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রসৃষ্টির একটি গূঢ় কল্পনা-কৌশলের কথা বলেছেন। তেমন কল্পনা-প্রতিভা সুলভ নয়, কিন্তু মহাভারতকারের সেই প্রতিভা ছিল। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, মহাভারতকার এমন একটি মানুষের সৃষ্টি করেন নি, যিনি মনুষ্যবৎ-আকারধারী তত্ত্বকথা বা নীতিসূত্র মাত্র। তিনি তাঁর বড়ো বড়ো বীরদের দিয়ে অনেক সময় এমন সব অযোগ্য কাজ করিয়েছেন, যা ছোটো কবিদের কল্পনা করতে সাহসে কুলোবে না। মহাকবি ছকে ফেলে চরিত্র-সৃষ্টি করেন নি। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে চালিত হই। কিন্তু মানুষের হৃদয়রহস্য অনেক গভীর। মহাকবি দেখেছেন সেই মানবচরিত্রকে। শান্তিপর্বে ভীষ্ম বলছেন—

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥[১১]

গুহ্য একটি তত্ত্ব তোমাকে বলছি— মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতে এই মানবমহিমাকে দেখেছেন, ঈশ্বরলীলাকে নয়। এই মানুষ দোষগুণের মানুষ, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, মহাভারতে কবি একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে মহৎ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই। জীবনের অনেক বিপরীত বস্তু, ঘটনা,

স্বভাব মিলে একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্য রচনা করেছেন। আমরা ব্যাখ্যা করে তার সংগতি নির্ণয় করতে পারি না। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, 'এ পর্যন্ত হ্যামলেট চরিত্রের সংগতি কেহ সন্তোষজনকরূপে আবিষ্কার করিতে পারে নাই, কিন্তু কাব্য-জগতে হ্যামলেট যে একটি পরম স্বাভাবিক সৃষ্টি, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য কাব্য-সমালোচনার দিক দিয়ে একটি অসাধারণ মন্তব্য। শেক্সপীয়রের চরিত্রসৃষ্টির এই অনন্য বিশেষত্ব সমালোচকদের চিরকালই মুগ্ধ করেছে। থিওডোর ওয়াট্‌স্‌-ডানটন নামক উনিশ শতকের একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক যাকে কবির absolute vision বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে সেই কবি-সৃষ্টিকেই বোঝানো হয়েছে। থিওডোর ওয়াট্‌স্‌-ডানটন সম্ভবত মহাভারত পড়েন নি, পড়লে হোমার চসার এবং শেক্সপীয়রের সঙ্গে ব্যাসেরও উল্লেখ করতেন। রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্থলে ভীষ্ম অপেক্ষা ভীম এবং কর্ণকে সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে অধিকতর প্রার্থনীয় মনে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা প্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষণীয়। মহাভারতের চরিত্রসৃষ্টির মহিমাকে যিনি এমন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে অনুধাবন করেন তিনি যে উচ্চতম বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দেন, তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ একান্ত আত্মনিষ্ঠ লিরিক কবি হয়েও মহাভারতের কবির এই বিশেষ শক্তিটি নিরূপণ করে দেখিয়েছেন। এটা পেরেছেন তাঁর নিজস্ব লিরিক প্রবণতা সত্ত্বেও। আবার প্রায় একই সময়ে তাঁর সৌন্দর্যসন্ধানী মন আকৃষ্ট হয়েছে 'ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা'র লিরিক মাধুর্যে। পঞ্চভূতের 'মনুষ্য' নামক প্রবন্ধে একটি অবহেলিত মানুষের প্রসঙ্গে বলছেন 'ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ, তথাপি এই লোকটির মূল্য অল্প নহে'।

তথাপি মহাকবির কল্পনার বিশালতা যে রবীন্দ্রনাথকে একসময়ে সৃষ্টিকর্মে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, কাহিনী-কাব্যের কয়েকটি কবিতাতে তার প্রমাণ আছে। 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'নরকবাস', 'বিদায়-অভিশাপ, এবং এদের সবার আগে লেখা চিত্রাঙ্গদার কাহিনী তিনি নিয়েছেন মহাভারত থেকে। 'পতিতা' কবিতাটিও এদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে এর মূল্য বিস্তৃত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যানে যা আছে রামায়ণের বালকাণ্ডে।[১২] মহাভারতের বনপর্বে এই কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ আছে। আমরা আলোচনা করছি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মহাভারত। এই কবিতাগুলিতে আমরা কবির যে দৃষ্টির আভাস পাই, তার সঙ্গে এতক্ষণ-আলোচিত বক্তব্যের মিল কতখানি? রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের সমগ্র রূপটি ধরেই নানা মন্তব্য করেছেন নানা সময়ে। কোনো বিশেষ চরিত্র, ঘটনা বা মুহূর্ত নিয়ে আলোচনা

করেন নি। এই কবিতাগুলির মধ্যে বিশাল মহাভারতের কয়েকটি মুহূর্ত বা খণ্ডাংশকে মূল কথাবস্তু হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে দিয়ে মহাভারতের কবির দৃষ্টির আভাস কিছু পাওয়া যায় কিনা, তাই আমাদের আলোচ্য। মহাভারতের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি অবিকৃতভাবে গ্রহণ করেছেন, অথবা পরিবর্তিত করেছেন, সেই তুলনাত্মক বিচার এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যটির 'সূচনা'তেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কাহিনী রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য জানিয়ে দিয়েছেন। কুরূপা চিত্রাঙ্গদা দৈহিক সৌন্দর্য লাভ করে অনুভব করল এ তার বাইরের জিনিস। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়'। এই ভাবটা কবির মনে জেগে উঠতেই মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী মনে পড়ে গেল। সেই কাহিনী অবলম্বনে তিনি তাঁর তত্ত্বটিকে রূপ দিলেন। তাঁর মনোগত তত্ত্বটিকে রূপ দেবার প্রয়োজনে মণিপুর রাজকন্যাকে তিনি কুরূপা কল্পনা করেছেন। মহাভারতে এই উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত, মাত্র পনেরোটি শ্লোকের।[১৩] সেখানে কোথাও এরকম কোনো তত্ত্বের আভাসমাত্র নেই। ওখানে চিত্রাঙ্গদা কুরূপাও নয় বরং সুন্দরী। ওই কাহিনী চিত্রাঙ্গদার চরিত্রের কোনো প্রয়োজনে নয়, অর্জুন চরিত্রের বীরত্ব এবং রমণীয়ত্বই ওই কাহিনীতে প্রকাশিত। সুতরাং কবি মনঃকল্পিত তত্ত্বের অনুরূপ করেই চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যটির পরিকল্পনা করেছেন। এটা মহাভারতকারের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এক প্রবণতা। এ-ধরনের কল্পনাপ্রবণতা মহাকবির নয়— এ কথাই রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার সূত্রে বলেছিলেন। মহাকবির প্রতিভা ছিল জগৎকে অবজেকটিভ ভাবে দেখারই প্রতিভা। এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি 'বিদায়-অভিশাপে'। বিদায়-অভিশাপের মূল কাহিনী আছে মহাভারতের আদিপর্বে, যযাতি-উপাখ্যানে। সেখানেও উপাখ্যানটি অতি সংক্ষিপ্ত, মাত্র তেইশটি শ্লোকে সমাপ্ত।[১৪] কচ গুরু শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করে দেবলোকে ফিরবার উপক্রম করলে দেবযানী তাকে প্রণয় নিবেদন করে। কচ দেবগণ-প্রেরিত, এবং কর্তব্যপরায়ণ। ব্যক্তিগত প্রণয় বাসনা চরিতার্থ করা তার স্বভাব নয় বলেই দেবযানীকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরে গেল। এই কাহিনী থেকে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে নানা উপলক্ষে তত্ত্ব নির্ণয় করে নিয়েছেন। যদি চরিত্রসৃষ্টি হিসাবে দেখা যায়, তবে কচ বা দেবযানী কোনো চরিত্রেই তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। এই কবিতার যেটি মর্ম বলে কবি অনুভব করেন, সেটি হচ্ছে পুরুষের নিষ্ঠা এবং

নারীর হৃদয়ানুতা। পঞ্চভূতের 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে তিনি তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলা আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যে উৎকৃষ্ট, সে কেবল তত্ত্ব আছে বলে নয়, অসাধারণ সূক্ষ্মতা এবং প্রকাশমাধুর্য এনেছেন বলে। মহাভারতের কবি যখন মানবজীবন ধ্যানে নিবিষ্ট থাকেন, তখন সূক্ষ্মচেতনার রসসৌন্দর্যসৃষ্টি তাতে থাকে না। এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যসৃষ্টিতেই গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য। আবার যে-আইডিয়াকে অবলম্বন করে গীতিকবি কোনো রূপের নির্মাণ করেন, সেই রূপটিও হয়ে পড়ে সেই আইডিয়ার ছাঁচে তৈরি। মহাকবির ধর্ম তা নয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যখন মহাভারতের কাহিনী থেকে সৃষ্টির প্রেরণা সংগ্রহ করেন, তখন তিনি নিজের কবিধর্ম অনুসারেই করেন। তাই রবীন্দ্রনাথের মহাভারত থেকে নেওয়া কাহিনীতে মহাভারতের গভীরতা বা বিশালতার স্পর্শ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের গীতিসুর যে পাঠককে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে রাখে তাতে সন্দেহ নেই। নারীত্বের যে আইডিয়া দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যানটিকে তিনি কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন, তার দ্বারা কল্পনার সূক্ষ্মতা অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু চরিত্র হিসাবে ওই নায়িকা হয়েছে ভাবময়ী।

তবে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা সম্পর্কে এই সমালোচনা খাটে না বলেই মনে হয়— একটি 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', অপরটি 'গান্ধারীর আবেদন'। তার কারণ কর্ণ চরিত্রের ট্র্যাজিক মহিমা এবং গান্ধারী চরিত্রের বিশ্বস্ত ধর্মনিষ্ঠা মহাভারতের কবি-কল্পনাকে যথাযথ প্রতিফলিত করেছে বলেই আমাদের ধারণা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী-সংবাদ কবিতাটি পড়া না থাকলেও কর্ণ চরিত্রের পরিণাম সব কালের পাঠককেই অভিভূত করে। ১৩০৬-এর ৭ জ্যৈষ্ঠ জগদীশচন্দ্র বসু বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

'একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেব-চরিত্রের আমরা অভিভূত হই কিন্তু কর্ণের দোষগুণ মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎ ভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক-এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।'[১৫]

রবীন্দ্রনাথ এই বৎসরেই 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' রচনা করেন। এটা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হয় যে কর্ণের সারাজীবনেই নিয়তির পরিহাস ছড়িয়ে আছে। পাঠকের মনে সেই পরিহাসই কর্ণের সম্বন্ধে একটি বেদনাবোধকে জাগিয়ে রাখে। রবীন্দ্রনাথ কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর, যুদ্ধের প্রাঙ্মুহূর্তের সাক্ষাৎটিকেই এই বেদনায় তীব্র করে তুলেছেন। এই মুহূর্তটি চরম ট্র্যাজিক মুহূর্ত সন্দেহ নাই। এই কবিতায় অতীত-

চারণের মধ্যে দিয়েই কর্ণ-চরিত্রের সমগ্র জীবনের হাহাকারকে কবি রূপ দিয়েছেন। মূল মহাভারতে কর্ণ ও কুন্তীর সাক্ষাৎকারের সময় এই স্মৃতিমন্থন নেই, কারণ সেটা মহাভারতকাহিনীরই ধারানুসরণ, অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় অতীতের বেদনাগুলিকে জাগিয়ে তুলতে হয়েছে। এ কবিতাতে কবির পূর্বকল্পিত কোনো আইডিয়া আছে বলে মনে হয় না। কর্ণের জীবনের ঘটনাগুলি একে একে উল্লিখিত হয়ে তার সমগ্র জীবনের ছবিটিকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কি মহাভারতের কর্ণ-চরিত্রটি ফুটেছে? মহাভারতের কর্ণ-চরিত্রে একটা প্রবল ruggedness বা কর্কশতা আছে। সেটাই তার স্বীয় ব্যক্তিত্ব। দুর্যোধনের চরিত্রেও এই বাক্‌কর্কশতা আছে। কিন্তু কর্ণের পোড়-খাওয়া জীবনের ruggedness ভিন্ন প্রকৃতির। এখানেই মহাকবির ব্যক্তিরূপ সৃষ্টি করবার রহস্যময় ক্ষমতার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ করুণ। তার মনটা ভাবার্দ্র, স্বপ্নপ্রবণ এবং কোমল। রবীন্দ্রনাথ কর্ণের মুখে অপরিতৃপ্ত মাতৃস্নেহকামনা, অকারণ ব্যাকুলতার ভাষা বসিয়েছেন, যার ফলে কর্ণ আর মহাকবির কর্ণ থাকে নি। কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কর্ণের মুখে এ-সব কিছুই উচ্চারিত হয় নি। তা ছাড়া আর-একটা অসংগতি চোখে পড়ে। কর্ণ রাধাকেই চেতনা হওয়া অবধি মা বলে জেনে এসেছে। সে কেন না-পাওয়া মায়ের স্বপ্ন দেখবে? এ-সব মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-চরিত্রের সমালোচনা বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে কর্ণ-চরিত্র পাঠ করলে মুগ্ধ হবে না এমন কে আছে?

বরং 'নরকবাস' কবিতাটির কাহিনী মহাভারতের মূল কাহিনীর খুব কাছাকাছি। এ কাহিনী আছে মহাভারতের বনপর্বে।[১৬] বর্ষীয়ান্ রাজা সোমক শত পুত্র কামনায় ঋত্বিকের প্ররোচনায় একমাত্র পুত্রকে যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন। সেই পুণ্যবলে তিনি স্বর্গলাভের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু স্বর্গ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর পুরোহিত তার পাপের জন্য নরক ভোগ করছিল। সোমক তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় নরক বরণ করলেন। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মহাভারতের কবি তাঁর বিশাল কল্পনাপ্রভাবে এমন সব ঘটনা ঘটিয়েছেন যা অন্য কোনো কবি ঘটাতে সাহস করতেন না। মহাভারতের বিশালতার মধ্যে ওই বীভৎস কাহিনী এবং তার পরিণাম অনায়াসে আরও নানা কাহিনীর সঙ্গে স্থান পেয়ে গিয়েছে। পাঠক পাপ পুণ্য দৈব নিয়তি কর্মফলের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ওই বীভৎসারও একটা মোহ অনুভব করে। সম্ভব-অসম্ভব বাস্তব-অবাস্তবের ভেদ হারিয়ে অন্য চিন্তায় মগ্ন হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কিন্তু মানুষের নীতিবোধের প্রশ্নটি বড়ো হয়ে ওঠে। কবিও সেই উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলবার জন্যই মহাভারত থেকে

এই কাহিনীটি বেছে নিয়েছেন বোঝা যায়। বিসর্জন নাটকেও কবি মানবনীতি এবং আচারনীতির গুরুত্বের প্রশ্নটিকেই বড়ো করে তুলেছেন। লোকব্যবহারের প্রশ্নটি নিয়ে নরকবাস রচিত। লোকব্যবহারের চেয়ে মানবনীতি অনেক বড়ো— এই কথাটি কবি যে তাঁর বহু রচনার মধ্যেই বলে এসেছেন, সবাই জানে। মহাভারতে আগাগোড়াই বহু প্রাজ্ঞোক্তি এবং নীতিবচন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু মহাভারতের কবি যখন সৃষ্টিকর্মে মন দেন তখন নীতিবোধ গৌণ হয়ে গিয়ে সমগ্র মানব-জীবনটাই তার গভীরতা দিয়ে পাঠককে আচ্ছন্ন করে দেয়। সত্য সত্যই নীতি-বাক্য দিয়ে জীবনের অর্থ করা যায় না।

ভগবদ্গীতাতে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, সমস্ত নীতির ঊর্ধ্বে চলে যেতে— সদসৎ তৎপরং যৎ। তিনি যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, তাতে জন্ম মৃত্যু নীতি দুর্নীতি বিলীন হয়ে গিয়েছে। গীতায় তত্ত্বের দ্বারা কবি যা বলতে চেয়েছেন, সমগ্র মহাভারতের ব্যাপ্ত বিশাল জীবনচিত্রের মধ্যে দিয়ে তাকেই রূপ দিয়েছেন। কিন্তু খণ্ডজীবনে আমাদের মানতেই হয় নীতিকে, কারণ আমরা খণ্ড চেতনার কালে বাস করি এবং দৈহিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমাজবিধান তৈরি করে নিই। কিন্তু এই নীতি সর্বকালিক নয় বা এই নীতি দিয়ে জীবনের সব-কিছুর অর্থ করা যায় না। আমরা এই নীতিকেই চিরকালীন নীতি বলে ভুল করি। চিরকালীন নীতি কী, কে বলবে? কে চিরকালকে দেখেছে? রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এ বিষয়টা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—

'যে নিয়তি সৌর জগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরাইতেছে, যে-নিয়তির বশে দিনরাত্রি হয়, ঋতুপরিবর্তন হয়, জল-ঝড় হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝাবায়ু বহে,...সেই নিয়তি; এবং যে-নিয়তি মানুষকে সৎকর্মে ও অসৎকর্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুসে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি— এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্তমান আছে। ...উভয়ই একটা বৃহত্তর ব্যাপারের অঙ্গ; সেই বৃহত্তর ব্যাপারের নাম ঋত।'[১৭]

মহাভারতে এই ঋতকেই বলা হয়েছে ধর্ম। ধর্মের প্রসঙ্গ মহাভারতের নানা জায়গাতেই আছে। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধেরাও নানা সমস্যার মীমাংসা খুঁজে পান নি। কোনো লৌকিক কর্তব্যনীতি তার উত্তর দেয় না। তাই ভীষ্ম বলেছেন, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। কে জানে কার কী গতি। রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের এই মর্মার্থটিকে অনুধাবন করেছিলেন একটি কবিতায়। সেই কবিতার নাম 'গান্ধারীর আবেদন'। এই কবিতাতে বার বার ধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু আর

কেউ নয়, ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জেনেছিলেন একমাত্র গান্ধারী। দুর্যোধন রাজধর্ম পালন করেছে, ধৃতরাষ্ট্র পিতৃধর্ম নিয়ে আত্মহারা, এমন-কি, বধূ ভানুমতীও কুলধর্ম পালন করে চলেছে। কিন্তু সকলের ধর্মই খণ্ডিত ; একমাত্র সত্যদর্শিনী গান্ধারীই চিরন্তন ধর্ম-চেতনায় স্থির হয়ে আছেন। তিনি তাকে বলেছেন কাল। সেই কালই খণ্ডকালের অপূর্ণতাকে সংশোধন করবে, তিনি তারই প্রতীক্ষায় আছেন। তিনি প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করলেন। সেখানে তিনি ব্যর্থ হলেন। তাঁর পুত্রকেও তিনি দেখলেন রাজধর্মে অটল, কিন্তু সে রাজধর্ম পালনে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই প্রশ্রয় পায়। এটা তাঁর ধর্মচিন্তার বিরোধী। তাই শেষ পর্যন্ত সেই কালের প্রতীক্ষাতেই তিনি রইলেন—

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যে দিন সুদীর্ঘ রাত্রি-পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।

সেইজন্যই দুর্যোধন যখন জননীর কাছে গিয়ে যুদ্ধের প্রাক্‌কালে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলল, 'জয়মম্বা ব্রবীতু মে'। গান্ধারী বলতে পারলেন না, 'পুত্র, তোমার জয় হোক'। বললেন, যতোধর্ম স্তুতঃ জয়ঃ।

উল্লেখসূত্র

১. P. L. Vaidya and A. D. Pusalkar : 'The Mahabharata : Its History and Culture', *The Cultural Heritage of India*, Vol II (1983), p. 56 Calcutta.

২. রবীন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণচরিত্র', সমালোচনা (১৩০১), আধুনিক সাহিত্য, র.-র. ৯, ১৩৫৩, পৃ. ৪৫১, বিশ্বভারতী

৩. এ-বিষয়ে পূর্ববর্তী প্রবন্ধ 'রামায়ণ চর্চা' দ্রষ্টব্য

৪. রবীন্দ্রনাথ : 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', ইতিহাস, ১৩৬২, পৃ. ৩৮, বিশ্বভারতী

৫. তদেব, পৃ. ৩৯, র.-র. ১৮, পৃ. ৪৪০-৪১

৬. Rabindranath : *A Vision of India's History*, 1965, p. 26

৭. রবীন্দ্রনাথ : 'কাদম্বরীচিত্র' (১৩০৬), প্রাচীন সাহিত্য, পৃ. ৫৩৭-৩৮, র.-র. ৫, বিশ্বভারতী

৮. রবীন্দ্রনাথ : 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (১৩০৮), প্রাচীন সাহিত্য, পৃ. ৫১১, র.-র. ৫, বিশ্বভারতী

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১০-৫১১

১০. রবীন্দ্রনাথ : 'কাদম্বরীচিত্র' (১৩০৬), প্রাচীন সাহিত্য। ১২৯৪তে প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' বইতে ৫-সংখ্যক চিঠিতে কবির এই সমালোচনা প্রথম পাওয়া যায়— 'য়ুরোপীয় মহাকবি হইলে পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়েই মহাভারত শেষ করিতেন।'

১১. শান্তিপর্ব : ২৯৯ অধ্যায়— মহাভারত

১২. বর্তমান গ্রন্থে 'রামায়ণ চর্চা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

১৩. মহাভারত, আদিপর্ব, অর্জুন বনবাস পর্বাধ্যায়

১৪. মহাভারত, আদিপর্ব, সম্ভব পর্ব

১৫. চিঠিপত্র ৬ (মে ১৯৫৭), পৃ. ১৫৭-৫৮

১৬. মহাভারত, বনপর্ব, ১২৮ পর্বাধ্যায়

১৭. 'ধর্মের জয়', কর্মকথা, রামেন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১-৫২
তুলনীয়— Rta literally means "the course of things". It stands for law in general and the immanence of justice. The conception must have been originally suggested by the regularity of the movements of sun, moon and stars, the alterations of day and of night, and of the seasons. Rta denotes the order of the world,... Soon this cosmic order becomes the settled will of a supreme god, the law of morality and righteousness as well. Even the gods cannot transgress it.

—Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, 1983, pp. 78-97.

চৈতন্যচরিত

বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে চৈতন্যদেবের উল্লেখ আমাদের প্রত্যাশার অনুরূপ নয়। রবীন্দ্রনাথ জগতের বিভিন্ন মহাপুরুষ ও মনীষীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রবন্ধ লিখেছেন অথবা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন। এই-সমস্ত প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয়েছে। উল্লেখগুলিও যথাসম্ভব সংকলিত হয়েছে। এরকম গ্রন্থ ভারতপথিক রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, খৃষ্ট, বুদ্ধদেব, বিদ্যাসাগরচরিত, বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে ১৯৩৭-এ বেরিয়েছিল চারিত্রপূজা। তাতে প্রবন্ধ ছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। পরে ওই প্রবন্ধ এবং প্রাসঙ্গিক আরও নানা প্রবন্ধ ও উল্লেখ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বই বের হয়। কিন্তু চৈতন্যদেবকে নিয়ে সংকলন করবার মতো যথেষ্ট রচনা নেই।

প্রসঙ্গত এ কথাও স্মরণ করি বিবেকানন্দ পরমহংসদেব প্রভৃতি আরও স্মরণীয় ব্যক্তি ও মহাপুরুষ আছেন যাঁদের সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও উল্লেখ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু সংকলিত হবার মতো যথেষ্টসংখ্যক নয়। চৈতন্য-দেবের উল্লেখ অবশ্য তাঁদের চেয়ে কম নয়। বিষয়টি চিন্তনীয়, সন্দেহ নেই। চৈতন্য একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন, এটাই কি কারণ? যিশু বা বুদ্ধদেবও ধর্মনেতা ছিলেন, তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অকৃপণ। তবে কেন চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তিনি নীরব? প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যেও তেমন কিছু উল্লেখ চোখে পড়ে না। বারোয়ারি মঙ্গল প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

'যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক; যাহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই— তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন?'

রবীন্দ্রনাথের এই মানদণ্ডে চৈতন্যদেবও যে স্মরণীয় মহাপুরুষ তাতে সন্দেহ

থাকতে পারে না। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকেই সমাজের কল্যাণে দান করেছিলেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল। এই ব্যাকুলতা শুধু তাঁর নিভৃত সাধনায় ছিল না, তাঁর ঈশ্বর-ব্যাকুলতা সমগ্র সমাজকেই নাড়া দিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি যে সচেতন ছিলেন, তা হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু চৈতন্যের জীবনাদর্শে সমগ্র দেশে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল আমাদের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস এবং পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নিজের দেওয়া মানেই চৈতন্যদেবের মূর্তি চিরউজ্জ্বল। এইজন্যে চৈতন্যের উল্লেখ তেমন না করলেও রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন তার কিছু প্রমাণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাওয়া যাবে। চৈতন্যজীবনী তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। হেমন্তবালা দেবীকে একটি পত্রে তিনি লিখছেন—

'প্রথম বয়সে বৈষ্ণবসাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবনচাঞ্চল্যের আন্দোলনবশত নয়, কিছু উত্তেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রসমাধুর্য্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্ত্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করচে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেচে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের —কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ অ্যাখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে এ'কে আমি সঙ্কীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারি নি।'[১]

এখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন, বৈষ্ণবধর্মের যেটা নির্বিশেষের দিক তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছিল তাতেই। বৈষ্ণব ধর্মের দেশকালপাত্রবদ্ধ আখ্যায়িকায় তিনি আকৃষ্ট হন নি। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীকে তাঁর মন স্বীকার করে নেয় নি। কিন্তু তিনি রস উপভোগ করেছেন; বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্যে তাঁর মন যে কতখানি মুগ্ধ ছিল সকলেই তা জানেন। কিন্তু তিনি রসের কথাই বলেছেন, চৈতন্যদেবের কথা বলেন নি, যদিও তাঁর জীবনী তাঁর ভালো করেই পড়া ছিল।

চৈতন্যজীবনী কেন রবীন্দ্রনাথকে তেমন করে প্রভাবিত করে নি? মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কোনো অলৌকিকত্বে আস্থা যেমন রাখতে পারতেন না, তেমনি সামাজিক সাংসারিক বাস্তব জীবনের ব্যতিক্রমও তিনি মেনে নিতে পারতেন না। চৈতন্যজীবনের যেটা অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক দিক সেটা রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ

করে নি। কিন্তু বালক নিমাইয়ের শৈশবচাপল্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বালক নিমাইয়ের কথা তিনি বলেছেন—

'সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।'[২]

চৈতন্যের ব্যক্তিগত ধর্মসাধনায় নয়, জাতীয় জীবনে তাঁর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব লক্ষ্য করতে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বাংলার সমাজে চৈতন্যের প্রভাবের দুটি দিক আছে— একটি সাহিত্যে অন্যটি সমাজে। চৈতন্যের ধর্মচর্চায় ততখানি নয়, যতখানি চৈতন্যের সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিশেষ নিবদ্ধ ছিল। নিমাই তাঁর জননীর বিশেষ আদরের সন্তান ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বড়ো ভাই সংসার ত্যাগ করে যাওয়াতে শচীমাতা নিমাইকে একান্ত কাছে রাখতেই চেয়েছিলেন। নিমাই তাই সাধারণ সংসারী মানুষের মতো বিবাহাদি করে জীবনযাপন করবে— এটাই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিমাই সেই আশা পূর্ণ করলেন না, তিনি সংসার ত্যাগ করলেন। চৈতন্যের সংসার ত্যাগ আমাদের দেশের অন্যান্য মানুষের সংসার ত্যাগের মতো নয়। সংসার ছেড়ে তিনি হারিয়ে গেলেন না বরং একটা নতুন সমাজ-বিপ্লবের সূচনা করলেন। তাঁকে ঘিরে একটা নতুন সমাজসম্প্রদায় গড়ে উঠল; বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তার দর্শনতত্ত্ব রচনা করলেন। নিত্যানন্দ ও বীরভদ্র নতুন সমাজনীতির প্রবর্তন করলেন। তার ফলে বাঙালি সমাজের জাতিভেদপ্রথা শিথিল হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ যে-সব মহাপুরুষের চরিত আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে একটি ঐক্য তাঁর চোখে পড়েছিল— তাঁরা মানুষের জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছেন। মূর্ছিত সমাজের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় রামমোহন, খৃস্ট বা বুদ্ধদেবের ধর্মমত ভিন্ন, তবু তাঁদের সাধনায় একটি ঐক্য ছিল। সেটি এই যে তাঁরা সকলেই সমাজকে আত্মচেতনায় জাগ্রত করে তুলেছেন। কেউ যদি নিজের মুক্তির কথা ভেবে থাকেন, তবে সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে তার কোনো অর্থ নেই। রামমোহনের সময় সমাজ নানা আচারে সংস্কারে ও খণ্ডতায় বিচ্ছিন্ন ছিল। অন্ধ বিশ্বাস ও দৈব সংস্কারে বিচারবোধ ছিল লুপ্ত। এই আচারভেদের জন্যই মানবতা-বোধও ছিল খণ্ডিত। রামমোহন তীক্ষ্ণ বিচারের দ্বারা ক্ষুদ্রতাবুদ্ধির অসারতা

প্রতিপন্ন করে মহত্তর আত্মচেতনার পথে নিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, ধর্মনেতা বলে প্রশস্তি নিবেদন করেন নি, করেছেন মুক্তবুদ্ধির সাধক বলে। অখণ্ড মানবতাবোধের উদ্‌বোধক বলে। রামমোহনের যুক্তি তর্ক এবং বিচারপ্রণালী বৈদান্তিক অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে বিশ্বাস রামমোহনকে অনুপ্রেরিত করেছিল মানবতার ঐক্যবোধে।

বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় শ্রদ্ধার কারণও তাই। তিনি তাঁকে মনে করতেন পূর্ণতার সাধক। ইতিহাস বলে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছিল এমন এক সময়ে যখন আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপ মানবকল্যাণকে ভুলিয়ে স্বর্গলাভের মোহে মানুষকে তাড়িত করেছিল। বুদ্ধ অলৌকিক সত্যের ধারে কাছেও যান নি, কোনো জটিল অনুষ্ঠানের কথাও বলেন নি। তাঁর নীতি অতি সরল— চারিত্রিক শুদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথ হীনযানদের জটিল দার্শনিক শূন্যবাদকে সহজ বুদ্ধিতে প্রত্যাখ্যান করে পূর্ণতার আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বুদ্ধের এই সহজ নীতি সমাজের অর্থহীন কর্মকাণ্ডেরই প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধ মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখেছেন, সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দেখেন নি। বুদ্ধের এই সহজ প্রেমই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

এই দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন খৃস্টকেও। একটা বিশেষ ধর্মের প্রবক্তারূপে খৃস্টের মহত্ব নয়। তিনি বলেন, 'খৃস্টকে তাঁহারা খৃস্টানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন।' খৃস্টানি বলতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ খৃস্টের মহত্ত্বকে দেখেছেন অন্যত্র, তাঁর অপরিমেয় মানবপ্রেমে। যারা রুগ্‌ণ, ক্লিষ্ট, দরিদ্র, তাদের প্রতিই তাঁর অসীম করুণা। 'ভারতবর্ষ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রে আপন চৈতন্যকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে, তেমনি ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষভাবে আপন অনুভূতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খৃস্টধর্মের লক্ষ্য।'[৩] রবীন্দ্রনাথ যিশুর আবির্ভাব সময়ে সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, সে সময়েও বিচ্ছেদজীর্ণ সমাজের প্রয়োজনেই যিশুর প্রেম ও মানবতার বাণীর প্রকাশ। বুদ্ধ ও যিশু ভেদের মধ্যে অভেদ-সত্যটিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁদের মহত্ব স্মরণীয় হয়ে আছে।

চৈতন্যের প্রসঙ্গ তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন নি কোথাও। তথাপি নানা প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থেকে মহত্ত্বের এই নিঃসংশয়িত অভিব্যক্তি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম জীবনে একবার তিনি বড়ো সহজভাবেই একটি কথা বলেছিলেন—

'যাহাদের বড়ো প্রাণ তাহারা বেশি দিন নিজের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ।'[৪]

চৈতন্যদেব বড়ো প্রাণ কী অর্থে? পরবর্তীকালে নানা প্রসঙ্গে তিনি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে (১৩১৫) তিনি বলছেন:

'অবশেষে দার্শনিক জ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী-অজ্ঞানী অধিকারী-অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল তখন চৈতন্য নানক দাদূ কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন।... তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন।'

রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন—

'একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই— আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মলোকে উদ্বোধিত করেচেন —সেই ব্রহ্মলোকেও জাত নেই দেশ নেই।'[৫]

দেখা যাচ্ছে বুদ্ধ খৃস্ট রামমোহনকে যে দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন, চৈতন্যকেও তিনি সেই দৃষ্টিতেই দেখতে চান, ধর্মসাধকরূপে নয়, মানব-ঐক্যসাধকরূপে। এঁদের শক্তি ছিল প্রেমে। মানুষের প্রতি প্রেমেই তাঁরা শক্তিমান। প্রেমেই তাঁদের অনুবর্তীরা এসেছেন, প্রেমের ধর্মেই সমস্ত সমাজে জাগরণের সূচনা। চৈতন্যের ধর্ম প্রেমেরই ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্মের কোনো দার্শনিক তত্ত্ববিচারে যান নি, রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অর্থেরও অবতারণা করেন নি। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল তাঁর পড়া ছিল বলে ভক্ত বৈষ্ণবেরা কী দৃষ্টিতে চৈতন্যকে দেখে থাকেন, তা নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। রবীন্দ্রনাথ অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। বুদ্ধকে হিন্দুরা অবতার করে নিলেও রবীন্দ্রনাথ তা মনে করতেন না। তেমনি চৈতন্যও তাঁর কাছে অবতার নন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলাকে মেলানো হয়েছে, এ সংবাদ তিনি অবশ্যই রাখতেন। গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের যে গভীর আলোচনা হয়েছিল তাও চৈতন্যমহত্ত্বকে বোঝার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে অনাবশ্যক। জীব এবং ঈশ্বরের সম্পর্ক চৈতন্যধর্মে যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তার তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ভিন্নরূপ। চৈতন্য ঈশ্বরপ্রেম দ্বারা সর্বমানবকে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে জাতিবিচার বা সম্প্রদায়-বিচার ছিল না। তাঁর প্রচারিত ধর্মে মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধাই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ঈশ্বরব্যাকুলতা চৈতন্যকে সংসারের ভেদ ও

বিচ্ছেদকে ভুলিয়ে দিয়েছে, জাতিসম্প্রদায়বোধ তাঁর কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই আদর্শ তাঁর অনুবর্তীদের অনুপ্রেরিত করেছে। তারাও বিশ্বাস করবার চেষ্টা করেছে, এ জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে পবিত্র, তাই মানুষের প্রতি প্রেম স্বতঃ উৎসারিত।

রবীন্দ্রনাথের কাছে চৈতন্যের এই মানবপ্রেমই বড়ো। মানুষকে তিনি যে হৃদয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন— তিনি যে শতধাবিচ্ছিন্ন দেশে এই আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সমাজ ও দেশের দিক দিয়ে এটাই একটি মহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরলাভ তিনি করেছিলেন কিনা সে দিকটা তাঁর কাছে বড়ো কথা নয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'আমি মানি রসস্বরূপকে যাঁর পরমানন্দের মাত্রা জীবে জীবে। আমি সেই আনন্দকে উপলব্ধি করতে চাই বিশ্বের সর্বত্র— বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশ্বমানবে।... মানুষের সেবাতেই ঈশ্বরের সেবা। শিলাইদহের বৈষ্ণবীর আচরণে এই সত্যের আভাস পেয়েছিলুম।'[৬]

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৫-তে শিলাইদহের এই বৈষ্ণবীকে নিয়ে গল্প লেখেন 'বোষ্টমী'। এই বৈষ্ণবী একজন খাঁটি চৈতন্যভক্ত। তিনি ঘর ছেড়ে এসেছেন সত্যের সন্ধানে। কিন্তু সত্যের সন্ধান তিনি করে ফিরছেন মানুষেরই মধ্যে, লোকালয়ের বাইরে নয়। তাঁর ঈশ্বরকে তিনি যেন পেলেন কবির মধ্যে। কবিকে বৈষ্ণবী ডাকতেন গৌর বলে। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার মধ্যে চৈতন্যধর্মের সূক্ষ্ম মর্মটিকে খুঁজে পেয়েছেন। বৈষ্ণব অত্যন্ত পৌত্তলিক। ঈশ্বরের মূর্তি রচনা করে তার পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে। সেই সূত্রে নানা নিয়ম রীতি বিধি পালন করে। শেষ পর্যন্ত মূর্তি পূজা এবং তাকে অবলম্বন করে আচারের জটিলতায় বৈষ্ণব, চৈতন্য যে মানবরূপে ঈশ্বরের প্রকাশের বাণী শুনিয়েছিলেন, তার কথা ভুলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের ধর্মচেতনার স্বরূপকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— 'তাহার কথাটা এই যে শুধু মত লইয়া কী হইবে, সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী, এটা একটা কথা— কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য।' কবির বক্তব্য, ঈশ্বরের মূর্তি গড়বার দরকার নেই। মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমা। বলা বাহুল্য, সর্বমানবের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ হলেও তাকে উপলব্ধি করা যদি কঠিন হয়, তবে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই তাঁর প্রতীককে উপলব্ধি করতে পারা চৈতন্যধর্মের কথা। এই উপলব্ধির দ্বারাই সব-কিছুকে সহজ প্রীতি ও অসীম ক্ষমায় গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ভক্ত খৃস্টান যেমন বলে **To know all is to pardon all.**

এই ব্যাখ্যাকে খাঁটি চৈতন্যভক্ত মেনে নেবেন কিনা সন্দেহ। এখানে ঈশ্বরকে মানবরূপ দেওয়া হয়েছে। এই মানবব্রহ্মবাদ বস্তুত রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব বিশ্বাস। তাঁর কাব্য ও অন্যান্য রচনায় এই বিশ্বাসের ছায়াপাত দেখেছি। পঞ্চভূতের 'মনুষ্য' প্রবন্ধের মধ্যে তিনি এই বৈষ্ণবীয় তত্ত্বটির একটি চমৎকার স্বকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সন্তানের প্রতি জননীর ভালোবাসা যখন সীমাহীন হয়ে যায় তখনই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। 'বৈষ্ণব কবিতা' নামে সুপরিচিত কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'হেরি কাহার নয়ান রাধিকার অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে'। মানুষই ঈশ্বরের প্রতীক। এই অর্থে বৈষ্ণবের প্রতীকোপাসনা সার্থক। রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতা ও নাটকে এই বিশ্বাস প্রকাশিত। গীতাঞ্জলির বৈষ্ণবীয় ভাব ঈশ্বরভক্তিতে রসার্দ্র। এই ঈশ্বর প্রকাশিত জীবনের সকল পর্যায়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং মানুষের মধ্যে। অসীমকে তিনি রূপজগতের সীমার মধ্যে অনুভব করেছেন। প্রেমে ভালোবাসায় তারই সঙ্গে কবির নিত্যসহযোগ। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের আদর্শকে নিজের মতো করেই গ্রহণ করেছিলেন. যেমন করে তিনি বুদ্ধ ও যিশুকে তাঁর জীবনে গ্রহণ করেছেন।

চৈতন্যের ধর্ম মূলত রসের ধর্ম। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই এই ধর্মের মূল কথা। চৈতন্য নিজের সমগ্র জীবন দিয়েই ঈশ্বরের প্রতি প্রীতিভাবকে প্রকাশ করে গিয়েছেন! প্রীতির নানা অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছে তাঁর জীবনে। প্রীতির এই অভিব্যক্তি দিয়ে গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ আবাল্য। বস্তুত এ কথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না বৈষ্ণব পদাবলীর রসে মগ্ন না থাকলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়তো ভিন্ন রূপ নিত। তাঁর স্মৃতিকথায় জানা যায় বৈষ্ণব কাব্যের ছন্দ ও ধ্বনিতে তিনি ছিলেন আবাল্য অনুরাগী। এ কথাটা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। এই কারণেই যে চৈতন্য-প্রবর্তিত মানবহৃদয়ভাবাশ্রিত পদাবলীই রবীন্দ্র-কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছে। মানবভাবাশ্রিত না হয়ে কেবল ভক্তির কবিতা রবীন্দ্রনাথকে এতখানি উদ্‌বুদ্ধ করত না। এই প্রসঙ্গে আবার বলা দরকার বৈষ্ণব কবিতাকেও রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করেই উপভোগ করতেন। বৈষ্ণবের শাস্ত্র-নির্দিষ্ট প্রণালীতে নয়। গৌরচন্দ্রিকার চৈতন্যস্মরণ কিংবা রসপর্যায়ের বিন্যাসও তাঁর স্বীকার্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেছিলেন বিদ্যাপতির আদর্শে। বিদ্যাপতি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি। তিনি মুক্তভাবেই পদরচনা করেছিলেন, রসের পর্যায় অনুসরণ করে নয়। কিন্তু চৈতন্যের পর বৈষ্ণব

পদসাহিত্য তাদের নির্দিষ্ট রসশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করেছে, রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। বস্তুত বিপুল বৈষ্ণব পদসাহিত্য বলতে গেলে ওই একজন ব্যক্তির ভাব-প্রেরণাতেই গড়ে উঠেছিল যা বাংলা সাহিত্যের পরম গর্বের বিষয়। চৈতন্যকে কেন্দ্র করেই জীবনী ও পদ লেখা তো হলই, বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বগুলিও নিবদ্ধ হল। এই তত্ত্ব এবং এই পদসাহিত্য আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল উৎস এবং আশ্রয়। চৈতন্যের আবির্ভাব না ঘটলে এ-সব সম্ভবই হত না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাবের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলা গেলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে তিনি পরবর্তী বৈষ্ণব আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যকে সাম্প্রদায়িক চিন্তার থেকে মুক্ত করে দেখেছেন। ইতিহাসের এই সত্যটিকে সবাই স্বীকার করেন যে মহাপুরুষরা নিজেরা তাঁদের আদর্শ লিপি-বদ্ধ করে যান না, বুদ্ধ বা যিশু করেন নি, চৈতন্যও করেন নি। পরবর্তীকালে তাঁদের বাণী লিপিবদ্ধ হয় এবং তার ব্যাখ্যা ও ভাষা রচিত হতে থাকে। মহাপুরুষ কী অর্থে তাঁর জীবন দান করে গিয়েছেন, উত্তরকালের মহাপুরুষই হয়তো তার তাৎপর্য বুঝতে পারেন। রবীন্দ্রনাথও তাই চৈতন্যধর্মকে মানবধর্মরূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর প্রেরণায় রচিত সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডি-বর্জিত বিশুদ্ধ সাহিত্য হিসাবেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় তিনি বৈষ্ণব পদের এক সংকলন করেছিলেন ১২৯২ সালে পদরত্নাবলী নাম দিয়ে। সে সংকলনে তিনি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিধি মানেন নি। এই চৈতন্য-অনুপ্রেরিত বৈষ্ণব কবিতায় তিনি যে কতখানি মুগ্ধ ছিলেন তার প্রমাণ আছে প্রথম জীবনকাল থেকে লেখা বহু প্রবন্ধে: চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি, বৈষ্ণব কবির গান, বসন্ত রায়, বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া ছন্দের আলোচনায় বৈষ্ণব কবির পদ যে কতবার ফিরে ফিরে এসেছে, তাও স্মরণীয়।

কীর্তনের সুর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

'চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্রহৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ রাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল. একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল।'[৭]

সমবেত কণ্ঠে পথ-কীর্তন চৈতন্যদেবই প্রবর্তন করেছেন— রবীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট

বক্তব্য তাই। ধর্মসাধনাকে সম্মিলিত সাধনায় পরিণত করার নবতর কীর্তি চৈতন্যদেবের। কীর্তনের দুটি রূপ, নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন। কীর্তন সম্বন্ধে কবির বিশেষ গৌরববোধ লীলাকীর্তনের জন্য। কবির আর-একটি উক্তি—

'কীর্তন সংগীত আমি অনেককাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজ ভাবে আছে বলে আমি জানিনে। কীর্তন সংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব বোধ করি।'[৮]

নামকীর্তনে কৃষ্ণ অথবা মহাপ্রভুর নামই বার বার উচ্চারিত পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। তার একটি নাট্যরূপ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটকে দর্ভকদের গানে—

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।

মন্ত্রতন্ত্র আচার-সংস্কারে ক্লান্ত পঞ্চক এই গানের সরলতায় মুগ্ধ। সে বলল, 'দে ভাই আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসধ্যি, সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ওই গান শিখিয়ে দে।'

দর্ভকরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে পঞ্চক বলল—

'হাঁ রে হাঁ ওই অধমের গান, অক্ষমের কান্না। তোদের এই মূর্খের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই তো আমার পড়াশোনা কিছু হল না।'

সরল মানুষগুলির সরল গান কবিকে ভাবার্দ্র করলেও তিনি একে বলেছেন 'অক্ষমের কান্না'। কীর্তনের এই রূপটিতে কবি কোনো গৌরববোধ করতে পারেন না। আসলে চৈতন্য-ধর্মান্দোলনে এই অসংহত আবেগ ও উচ্ছ্বাস যতই স্বতঃস্ফূর্ত হোক, কবি তাকে বরণীয় বা স্বাস্থ্যকর বলে ভাবতে পারেন না। 'নৈবেদ্য' কাব্যের একটি কবিতায় কবির আকাঙ্ক্ষা স্মরণীয়—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদধারা
নাহি চাহি নাথ।

এর থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় চৈতন্যজীবনের অসংকুচিত ভাববন্যা কবিকে প্লাবিত করতে পারে নি। চৈতন্যচরিত গ্রন্থ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মনে স্থায়ী দাগ কাটতে পারে নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের মতো অসাধারণ গ্রন্থ রবীন্দ্রচিত্তে কোনো প্রভাব ফেলেছে বলে জানি না।

এখানে বলা দরকার চৈতন্যধর্মের ভাবাবেগপ্রবণতাকে তিনি যে জাতীয় ভ্রষ্টতা বলে মনে করেন, তা নয়। মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত চরিত্রের অতি উন্নত আদর্শ কবিকে বিস্ময়স্তব্ধ করেছে, তাকে তিনি অনুকরণীয় বলে মনে করতেন। যেমন তিনি বলেছেন—

'চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে, এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেম-ধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক।··· নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই— ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।'[৯]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন বৈষ্ণব আন্দোলনে বাঙালির নিজস্ব চারিত্রের বিকাশ ঘটেছে। বাঙালির সমাজে শক্তির লীলায় যে পীড়ন ও পেষণ চলেছিল মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার ছবি পাওয়া যায়। এই শক্তির প্রভাবে ধনীর নিঃস্ব হতে যেমন সময় লাগে না, নিঃস্বের ধনবান হয়ে উঠতে তেমনি যুক্তির দরকার হয় না। এই দুর্যোগের দিনে রসের বার্তা এনেছিল চৈতন্যের ধর্ম। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে ও ধর্মে ঈশ্বরকে আনন্দময় পুরুষ হিসাবে দেখা হয়েছে; রসের লীলায় তিনি জীব-প্রকৃতির সঙ্গে বদ্ধ। চৈতন্যধর্ম এই অভিনব দৃষ্টির আলোয় জীবনকেই উজ্জ্বল এবং আনন্দময় করে তুলল। বাঙালি যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে।' এ কথার আরও একটি তাৎপর্য আছে। বাঙালির ধর্মসাধনা মানব-কেন্দ্রিক। বাউল সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনা মানবদেহকে নিয়ে। তার চিন্তা রূপের জগতেই বিচরণ করে ফেরে। চৈতন্যের ধর্মও মানবকেন্দ্রিক। বাঙালির যা-কিছু আনন্দ পরলোককে নিয়ে নয়; তার পুত্রপরিবার সখাসখী স্বজন-প্রতিবেশীর নানা বন্ধনের মধ্যে তার স্বর্গসুখ। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন—

'সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ

করিয়া আনিয়াছিল— এমন-কি, প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া, যে-ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ, সে-ও গৌরব লাভ করিল; যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে, সে-ও সম্মান পাইল, যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল। …প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে কাহারও কোনো বাধা রহিল না।'[১০]

স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ এখানে ঈশ্বরকল্পনার বিশিষ্টতার ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে বিশিষ্টতা মহাপ্রভুর সাধনাতেই সম্ভব হয়েছিল। মহাপ্রভুর ঈশ্বর রসসর্বস্ব। তিনি ঐশ্বর্যভাবের ঈশ্বর নন। শরীর লীলায় যে-ঐশ্বর্যের প্রকাশ মহাপ্রভুর রসসর্বস্ব ঈশ্বর-কল্পনা তার প্রতিবাদ। ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক আনন্দের, রাধিকা ঈশ্বরেরই হ্লাদিনী শক্তির প্রতিমা।

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হ্লাদিনী' কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥[১১]

বৈষ্ণব ধর্মের এই মূল ভাবটি আমাদের সমাজে যেন নবচেতনার জাগরণ ঘটাল। এই জাগরণে বাইরের কোনো প্রভাব নেই, যেমন ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এ সম্পূর্ণই স্বতঃস্ফূর্ত। একে জাগরণ বলা সার্থক এইজন্য যে এই ভাবান্দোলনে বাঙালি তার মানবতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভগবানকে স্বর্গলোক থেকে নামিয়ে এনে আমাদের সংসারের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঈশ্বর এলেন আমাদের প্রিয়রূপে, সখারূপে। মহাপ্রভুর ধর্মান্দোলন বিশিষ্টতার গুণে স্বভাবতই পদ রচনায় কীর্তন গানে অভিব্যক্তি লাভ করল। কিন্তু এতে সাহিত্য যতখানি সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, সমাজ তা পারে কি? রবীন্দ্রনাথ সেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথাই উদ্‌ধৃত করি—

'ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।

'আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি; কিন্তু পৌরুষলাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণব সাধনায় নিজেকে

নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে এবং এইজন্যই চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই।'[১২]

এই শেষ কথাটা কেন বললেন, সেটা ভাবা দরকার। চরিতকাব্যের নায়ক বীর্যবান পুরুষ নন— এটাই কি কবির বক্তব্য ? কথাটা কি সত্য ?

উল্লেখসূত্র

১. চিঠিপত্র ৯, পত্র ১২৯, পৃ. ৩১৮-১৯
২. বিদ্যাসাগরচরিত, ১৩০২ ; র.-র. ৪, পৃ. ৪৮৮
৩. খৃষ্ট, পৃ. ২ ; র.-র. ২৭, পৃ. ৪৮৭, ৪৯৮, বিশ্বভারতী
৪. র-র. অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ১৩৬
৫. চিঠিপত্র ২, অক্টোবর ২৭, ১৯১৬
৬. চিঠিপত্র ৯, পৃ. ৩১৯
৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), খণ্ড ২, পৃ. ৫২৯
৮. সংগীতচিন্তা, দিলীপকুমার রায়কে লিখিত পত্র
৯. দেশহিত, সমূহ, পরিশিষ্ট (১৩১৫), র.-র. ১০, পৃ. ৬৪০
১০. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১৩০৯, সাহিত্য, র.-র. ৮, পৃ. ৪৪৪, বিশ্বভারতী
১১. চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ, ১৫৭-১৫৯
১২. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১৩০৯, সাহিত্য, র.-র. ৮, পৃ. ৪৪৫, বিশ্বভারতী

ইতিহাস ও সংহতি

আমাদের দেশের ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয় উনিশ শতকে ইংরেজ ঐতিহাসিক-দের হাতে। তাঁরা ভারতবর্ষের যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, মূলত তা রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু রাজা ও রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাদের বিবরণ রচনা করাই ছিল আধুনিক ইতিহাস-লেখকের লক্ষ্য। এ-সব বিবরণ থেকে একটাই ইঙ্গিত প্রকাশ পায়, সেটি এই যে ভারতবাসী কোনোদিন সমগ্র জাতিরূপে গড়ে ওঠে নি। অশোক হর্ষবর্ধন বা আকবর ঔরঙ্গজীবের মতো রাজা যতদুর পর্যন্ত সম্ভব রাজ্যবিস্তার করেছেন এবং এই রাজ্যবিস্তার দ্বারা দেশের বৃহৎ অংশ একটি রাষ্ট্রশাসনে এসেছে বটে, কিন্তু সত্যকার ঐক্য কখনোই দেখা দেয় নি। যে সংহতি-শক্তির দ্বারা একটা নেশন একপ্রাণ একমন হয়ে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে সেরকম কোনো দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের এই প্রকৃতিকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা। তিনিও লিখেছেন—

'আর্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক হইতে পৌণ্ড্র পর্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা এবং পাণ্ড্য পর্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম; আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে?'[১]

এই প্রভেদ-প্রবণতার ইঙ্গিত সেকালের ইতিহাস-লেখকের রচনায় ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রও সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। কিন্তু এটাই বঙ্কিমের চূড়ান্ত বক্তব্য নয়। এই প্রভেদপ্রবণতার উপরেও তিনি একজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন। তিনি বলছেন—

'স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক আর মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী

হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহার প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।'

'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতির প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাকুলতা সহজগোচর। সমগ্র ভারত-ইতিহাসে এত অজস্র ভেদবৈচিত্র্য সত্বেও যে-ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কামনা করেছেন, সে-ঐক্য কোন্ সূত্রে সম্ভব হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে সে কথা বলেন নি। তাঁর সমগ্র আলোচনাভঙ্গি থেকে এটাই বরং মনে হয়, ইটালিতে গ্যারিবলডি ও ম্যাৎসিনি যেভাবে বিক্ষিপ্ত রাজ্যখণ্ডগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশেও সেই প্রণালীতে ঐক্য আনা সম্ভব বলে মনে করেছেন অর্থাৎ রাষ্ট্রবন্ধন দ্বারা। তাঁর এই মনোভাবের সমর্থন তিনি সম্ভবত সেকালের ইংরেজ শাসন থেকে পেয়ে থাকবেন। ইংরেজ শাসনেই বহুধাবিভক্ত ভারত একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, সেকালের অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল মনীষী ভূদেবও সেই কথা ভাবতেন।—

'ইউরোপীয় অপর কোন জাতীয় লোকের হস্তগত না হইয়া ভারতবর্ষ ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের একতাপ্রাপ্তির পূর্বপূর্ব বেগ বর্ধিত হইয়াছে বই নূতন হয় নাই।'[২]

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এবং উনিশ শতকের শেষে নেশন বা জাতি নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক হয়ে গিয়েছে। বস্তুত সমগ্র ভারতবর্ষ মিলে এক জাতি কিনা, এটাই ছিল তখনকার দিনের বিশেষ আলোচনার বস্তু। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সকলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, ভারতবর্ষে বহু জাতিগত বৈচিত্র্য ছিল, কিন্তু একজাতি ছিল না। ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডে একটি জাতি গড়ে ওঠার কল্পনা আসে এক রাষ্ট্রবন্ধনের ফলে। ভারতবাসীকে এত বৈচিত্র্য নিয়েই একটি নেশন বা জাতি হয়ে উঠতে হবে এবং আগে তা ছিল না। এ সমস্যা ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার পরেই সকলের মনে হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন য়ুরোপে বহু ভাষা এবং বহু জাতি থাকলেও য়ুরোপ কখনও একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয় নি বরং ফ্রান্স জার্মানি বা ইটালি তাদের নিজের নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আলাদা আলাদা জাতিরূপে গড়ে উঠতে পেরেছে নিজ নিজ রাজশক্তির সহায়তায়। রাজশক্তির ও প্রজাশক্তির পরস্পর-নির্ভর দরকার।

ভারতবর্ষে অশোক বা আকবরের সময় একটি কেন্দ্রীয় রাজশক্তি ছিল বটে, কিন্তু প্রজাশক্তির সঙ্গে তার সহযোগিতা ছিল না। এইজন্য ভারতবর্ষ বার বার বিদেশী-দের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাভূত হয়েছে। রাজা আক্রান্ত হলেও প্রজার তাতে কোনো উদ্‌বেগ দেখা যায় নি। পরন্তু শিবাজী বা রণজিৎ সিংহের সময় প্রজাশক্তির সঙ্গে রাজশক্তির সহযোগিতা ঘটেছিল বলে মারাঠা এবং শিখ নেশন গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলছেন,

'ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে খণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু সেই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সমবেদনার আত্মীয়বন্ধন ছিল না। ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্র স্থাপনের অনেকবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র তো ছিল না; আবার নেশনও ছিল না; কেননা, রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। রাজশক্তির অভ্যুদয়ে বা পরাভবে প্রজাশক্তি চিরদিনই উদাসীন ছিল। কাজেই ভারতবর্ষব্যাপী মহারাষ্ট্রও ছিল না, ভারতব্যাপী নেশনও ছিল না।'[৩]

সুতরাং জাতীয় সংহতি বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি রাষ্ট্রীয় অর্থে অন্তত তার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সংহতি হিন্দু সমাজে তেমন কঠোর ছিল না, যেমন মুসলমান সমাজে ছিল। হিন্দু সমাজে নানা স্তরে নীতি-নিয়ম আচার-অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কঠোরতা ছিল, তাই সমগ্রভাবে হিন্দু নামে চিহ্নিত হলেও সংহতি ছিল না। মুসলমান সমাজের মধ্যে ভেদপ্রবণতা কম বলে সংহতি রক্ষা করতে পেরেছে। হিন্দু সমাজের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত সংহতি ছিল এক-এক অঞ্চলে। ছিল না সবাইকে নিয়ে বৃহত্তর সংহতি যেটা রাষ্ট্রশাসনের ফলে সম্ভব হতে পারত। য়ুরোপে এই দেশগত আঞ্চলিক ভাষাসংস্কৃতি নিয়ে বহু নেশন তৈরি হতে পেরেছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সেভাবেও কোনো বহু নেশন তৈরি হয় নি প্রজাশক্তির সঙ্গে রাজশক্তির একাত্মতার অভাবে।

আমরা আজ কি শুধু রাষ্ট্রীয় সংহতির কথাই ভাবছি? আমাদের দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রকে মেলাতে না পারলে সংহতির দৃঢ়তা সাধিত হবে না। কেননা ভারতীয় প্রকৃতিতে সমাজের বৈচিত্র্য বাস্তব-সত্য। বিচিত্র সমাজ-বৈষম্যকে কী করে একটি কেন্দ্রীয় সংহতিতে নিয়ে আসা যায়— সেটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি সাধনের সমস্যা।

মিল, এলফিনস্টোন, কানিংহাম প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিক ভারতীয়দের মধ্যে প্রভেদের এত দৃষ্টান্ত পেলেও ভারতবর্ষের মধ্যে যে-একটা অদৃশ্য ঐক্যবন্ধন

চিরকালই আছে, সেটাও তাঁরা অনুভব করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কানিংহামের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যায়—

Hindusthan moreover from Cabul to the valley of Assam and the island of Ceylon, is regarded as one country and dominion in it is associated in the minds of the people with the predominance of one monarch or one race.[8]

অর্থাৎ এ দেশে বহু ভেদ এবং বৈচিত্র্য থাকলেও এর অন্তর্নিহিত ঐক্য সম্বন্ধেও তাঁদের সংশয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এমন-কি রামমোহনও সে-বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন। এই ঐক্য রাষ্ট্রশাসনের ঐক্য নয়, গূঢ়তর অন্তঃসঞ্চারী এক বন্ধনসূত্র। তার প্রমাণ প্রাচীন ভারতভূমির সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেই পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের ভারতবর্ষ-বর্ণনম অধ্যায়ে ভারতের একটি সামগ্রিক ভৌগোলিক চিত্র আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

মহাভারতের কাহিনীতে, কালিদাসের রঘুবংশে, মেঘদূতে, রামায়ণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যোগাযোগের আদানপ্রদানে যেমন এর দৃষ্টান্ত আছে তেমনি ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে তীর্থ ও মঠে, সংস্কৃত ভাষার ভারতব্যাপী প্রচলনে একটি সম্পূর্ণ ভারতভূমির কল্পনা পাওয়া যায়। সেকালের দিনে এর নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। সমগ্র ভারতবর্ষের একটা সম্পূর্ণ আত্মিক সত্তার অনুভব ঘটে এই-সব সাহিত্যের মধ্যে। এ দেশের অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই আত্মিক সংহতির অনুভূতিটি কখনও হারিয়ে যায় নি। শুধু ছিল না রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধন।

এই অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সংহতির তত্ত্বটি সেকালে সেভাবে কেউ বুঝিয়ে বলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র আর্যজাতির সভ্যতা বিস্তারের দ্বারা ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন হওয়ার কথা বলেছেন; বিভিন্ন বহিরাগত জাতির এ দেশে প্রবেশের ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় জাতির ঐক্য ঠিক কিসে সে কথাটি বলেন নি। অর্থাৎ এই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও এ জাতির মধ্যে ভেদপ্রবণতাকেই এর দুর্বলতা বলে মনে করেছেন। ভূদেবও ভারতীয়দের মধ্যে সম্মিলনপ্রবণতা এবং ভেদপ্রবণতা— দুটি প্রবৃত্তিই লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে 'সম্মিলনপ্রবণতাই বর্ধিতবল'। তিনি এর কারণ নির্দেশ করেছেন ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতিতে। চিরকালই এ দেশে নানা জাতি এসেছে এবং পাশাপাশি বাস করেছে। বিরোধ বিবাদ ঘটেছে, কিন্তু এই দেশেই সবাইকে নিয়ে গড়ে উঠেছে

ভারতবর্ষীয় সমাজ। মুসলমানদের ভারতে আসার পরেও এই প্রক্রিয়ার বিরাম ঘটে নি। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে মুসলমানরা ভারতে আসার পর তাদের ভারতীয় প্রকৃতি লাভের কথা ভূদেব বিস্তৃত ভাবেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও 'পরিচয়' গ্রন্থের 'আত্মপরিচয়' (১৩১৯) নামক প্রবন্ধে এ বিষয়টির ইঙ্গিত দিয়েছেন। মুসলমানরাই ভারতবর্ষকে 'হিন্দুস্থান' নাম দেয়। এই নামটিতে একটি ব্যাপক তাৎপর্য নিহিত। শুধু আর্যধর্মের বা পৌরাণিক ধর্মের পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ এটি নয়। হিন্দুস্থানে শুধু প্রাচীন আর্যসম্প্রদায় বাস করে না— আরও বহুতর জাতির বাস হিন্দুস্থানে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'মুসলমান বিজেতার প্রভাবে সমস্ত দেশে এক মুসলমান ধর্মই স্থাপিত হইয়াছে তথাপি পারস্যে মুসলমান ধর্ম সেখানকার পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে…। ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এখানেও আমার জাতিপ্রকৃতি আমার মতবিশেষের চেয়ে অনেক ব্যাপক। হিন্দুসমাজের মধ্যেই তাহার হাজার দৃষ্টান্ত আছে।'

এইভাবে সম্প্রদায়ের চেয়ে জাতিগত ঐক্য অনেক বড়ো— যদিও সেই ঐক্যটিকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো যায় না— সেই প্রসঙ্গে বলছেন—

'মানুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোনো সংজ্ঞা পৌঁছিতে পারে না— কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও আছে। কেবলমাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে— কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না…।

'এইজন্যই জীবনের দ্বারা আমরা জীবনকে জানিতে পারি কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে পারি না।'[৫]

মুসলমান-পূর্ব যুগে তো বটেই, মুসলমান এ দেশে বাস করতে আরম্ভ করলেও 'হিন্দুস্থান' নামে একটি ঐক্যবোধ চলে এসেছে। 'হিন্দু' নামটিই সেই সংহতির ইঙ্গিত দেয়। মুসলমানদের দেওয়া ভারতীয় ঐক্যবোধক এই শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ ভোলেন নি—

মোরে হিন্দুস্থান
বার বার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিমদিগন্ত পানে
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে ;

এই সংহতির ব্যাখ্যাটা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সেকালের মনীষীরা কিন্তু তেমন গভীরভাবে দেন নি। আর একবার স্পষ্ট করে বলা দরকার সংহতি আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ছিল না, কিন্তু মনের জগতে ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সংহতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি প্রথমেই রাষ্ট্রপ্রসঙ্গ বর্জন করেছেন। তিনি বলছেন—

'ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া।...তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব।'[৬]

রাষ্ট্রবন্ধনের দ্বারা এক করার চেষ্টা ভারতবর্ষ করে নি। সে বন্ধনটা হত নেহাতই বাইরের। কিন্তু যে-স্বাভাবিক প্রবণতা ভারতের জীবনে আছে— বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রবণতা, তাকে তিনি বলেছেন প্রতিভা।

'পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই।'[৬]

মূলত এই ভাবটির সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোদ্ধৃত ভাবটির অমিল নেই। ভূদেবেরও মূল কথাটা এই যে বাইরের থেকে বহু জাতি এ দেশে এসে ভারতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ সংহতির একটি তত্ত্ব নির্দেশ করেছেন যা তাঁর পূর্ববর্তী কেউ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রকৃতিতে দেখেছেন বিচিত্র এবং একের দ্বৈতলীলাকে। তিনি বলতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের বিশেষত্ব এই যে, এই বৃহৎ প্রসারিত দেশে অজস্র অসংখ্য বৈচিত্র্য কিন্তু কোনোটাই মূল্যহীন নয়। প্রত্যেকেই স্বমর্যাদায় এখানে স্থান পায়। এই বৈচিত্র্যই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, তার প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ কখনোই বলেন নি যে ভারতীয় সভ্যতা একরঙা, তার একটি রীতি, একটি নীতি, একটি ধর্ম। বরং তিনি বার বারই বলছেন, বহু যে আছে এটাই ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য— এদিক দিয়ে ভারতবর্ষ সত্যই অনন্য। এই বৈচিত্র্যকে নষ্ট করে একটি রূপ দেবার চেষ্টা বাতুলতা। অন্য দেশের সংহতি-সাধন এবং আমাদের দেশের সংহতিসাধনের এই চরিত্রগত পার্থক্যকে উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের দেশের সংহতি বহুকে স্বীকার ক'রে একত্ববোধের লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টাতে সার্থক হতে পারে। বহু যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য।

তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী চিন্তা। বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদে ব্রহ্ম সেই অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু যিনি বহুকে ইচ্ছা করলেন এবং চেতন ও অচেতন

সত্তায় ভেদকে সৃষ্টি করলেন। এতে বৈচিত্র্য অস্বীকৃত হল না, কেবল বৈচিত্র্যের অনুভূতিটা অস্বীকৃত হল।

Brahman is the Sat without a second which wills the many and differentiates Itself into the manyfold of sentient and non-sentient beings. This view does not deny the plurality of existent. What it denies is only the sense of plurality. The Sat is the all-inclusive unity or the Absolute that imparts substantiality to all beings and thus sustains their existence and value.[৭]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্য ও ঐক্যকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন, এতটা গুরুত্ব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও দেন নি। 'বৈচিত্র্যের অনুভূতি অস্বীকৃত হল'— অনুভূতির এই অস্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের নেই। বৈচিত্র্য এবং ঐক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে জটিল দার্শনিক তর্ক এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপলক্ষেই বহু এবং এককে সমঞ্জসীভূত করে বর্ণনা করেছেন। 'আত্মপ্রত্যয়' প্রবন্ধে বলেছেন—

'সে যা-কিছু চায় তা কোনো-না-কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারি দিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

'আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই-যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে আমরা জগতের আর-সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি।'[৮]

বিচিত্র ও একের এই নিত্যলীলাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় গানে যৌবনকাল থেকে সারা জীবনই নানা উপলক্ষে আভাসিত করে এসেছেন। তাঁর 'চিত্রা' কাব্যের নাম-কবিতাটিতে কিংবা নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' সেই আভাস দেখা দিয়েছিল। কাব্যের ক্ষেত্রে যেটা রসগত উপলব্ধি, মননের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাকেই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতের ইতিহাসের মতো তার এত চমৎকার দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যাবে না। ভারতের অজস্র বৈচিত্র্য এবং ভারতীয় চরিত্রের ঐক্য প্রসঙ্গে ১৯১৯-এ লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি বলছেন—

'প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই, যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে। এই মিলনচেষ্টাই মানুষের ধর্ম, এই মিলনেই মানুষের সকল দিকে কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।

'আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের। এই-সকল নানা উপজাতির বর্ণ ভাষা আচার ধর্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অথচ ইহারা সকলেই প্রতিবেশী। ইহাতে একদিকে যেমন পরস্পরের লড়াই চলিতেছিল তেমনি আর-এক দিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্য-সাধন-চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল না। কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য-সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।'[৯]

এই বিরোধ এবং বৈচিত্র্যসহ একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যের কল্পনাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে একটি গভীর দার্শনিক ভূমিতে উন্নীত করেছে। আমাদের দেশের দার্শনিক চিন্তা বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই 'এক'-এর ইঙ্গিত করে এসেছে। একের মধ্যেই বিরোধ এবং বৈচিত্র্য সামঞ্জস্য লাভ করে। কোনো সম্প্রদায় বিরোধকে বলেছে মায়া, কোনো সম্প্রদায় বিরোধ-বৈচিত্র্যকে একেরই লীলারূপে অনুভব করেছে। কেউ এককেই সত্য বলে জেনে বৈচিত্র্যকে বলেছে মিথ্যা, কেউ বৈচিত্র্যকে মিথ্যা না বলে তাকে সত্যেরই প্রকাশ রূপে জানে। শঙ্করপন্থী রামমোহন, ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ এবং অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ আধুনিক কালে ভারতের চিরাগত চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে একটি ভাষণে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

There is then but one all-comprehending existence, and that one appears as manifold. The Self or Soul or Substance is all that exists in the universe. That Self or Substance or Soul is, in the language of non-dualism, the Brahman appearing to be manifold by the interposition of name and form. Look at the waves in the sea. Not one wave is really different from the sea, but what makes the wave apparently different ? Name and form ; the form of the wave and the name which we give to it 'wave'.[১০]

যে সমুদ্র এবং ঢেউয়ের উপমা দিয়ে বিবেকানন্দ এক এবং বহুকে বুঝিয়েছেন, আমাদের দেশে সেই উপমা বহুপ্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতাতেও ভারতবর্ষের সেই এক এবং বহুকে বোঝাতে বলেছিলেন 'মহামানবের সাগর'। বিবেকানন্দ কখনও বলেছেন unity in diversity কখনও বলেছেন play of

differentiation and oneness.[১১] তিনি বলেছেন দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক সত্যের কথা। সেই আধ্যাত্মিক সত্যটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকৃতির ব্যাখ্যাসূত্রে।

অধ্যাত্ম-সত্যকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া একালেরই প্রবৃত্তি। একসময়ে রামমোহন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্যরূপে অধিষ্ঠিত দেখেছেন সনাতন এক ঈশ্বরকে। এই বিভিন্নতাকে তিনি সম্মান করেছেন। আবার বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যতত্ত্বকে তিনি পরম মর্যাদা দান করেছেন। এই আদর্শ দিয়েই আমরা মূল্যমান নির্ধারণ করে থাকি। একালে ধর্মের যত বৈচিত্র্য ও পার্থক্য থাকুক সকল উপাসকের উপাস্য সেই এক। রামকৃষ্ণ পরমহংস এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে আধুনিক সমাজের সম্মুখে দৃষ্টান্ত দিয়ে স্থাপন করলেন। বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদী দৃষ্টি দিয়ে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় ভাষণমালার বাইরে ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় সেই সহিষ্ণু উদার ভাবনাটিকে প্রতিফলিত করে দেখালেন— ভারতীয় সংস্কৃতির বহু বৈচিত্র্যই এর গৌরব, কারণ বৈচিত্র্য সেই এক ভারতচিত্তকেই প্রকাশ করে।

এই প্রকাশকে আমরা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখি না। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রতন্ত্রকে ভারতীয় প্রকৃতি বলে মনে করতেন না। তিনি দেখেছেন এ দেশে সমাজই হচ্ছে প্রাণকেন্দ্র। সমাজই মানুষের চিন্তাভাবনা জীবনাচরণ লোকব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভেদের এবং বিরোধের প্রশ্ন গুরুতর নয় সমাজেরই ক্ষেত্রে, যে-ভূমিতে আমাদের দেশের মানুষ বাঁচে। সমাজে আচারধর্মটা বড়ো। বৃহত্তর দৃষ্টিতে মানবিক ঐক্যকে অনুভব করতে পারে কয়জন? সাধারণ মানুষ আচারধর্ম দ্বারাই চালিত। রবীন্দ্রনাথ ধর্ম এবং আচার সম্বন্ধে বলেছেন—

'পরজাতীয়কে যখন আমরা আচারধর্ম দিয়ে বিচার করি, তখন স্বভাবতই অত্যুক্তি করে থাকি, বিশেষত যেখানে তাদের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ যা দুঃখ দেয় এবং অপমান করে। কিন্তু তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মহত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও সামাজিক শত বাধা ভেদ করে মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের আবিলতায় আমরা তাদের ক্ষুদ্র করেছি, তাদের সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারি নি।'[১২]

এই সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করা সহজ হয় আচারের কঠোরতা যখন শিথিল হয়। আচার মানুষকে চিহ্নিত করে, আলাদা করে। বিশ্বজগতে প্রত্যেকের একটি স্বাভাবিক পরিচয় আছে। মানুষ তার উপর আবার কতকগুলি কৃত্রিম আচারের

পরিচয়চিহ্ন রচনা করে। তাতেই বিভেদের সৃষ্টি হয়। হিন্দুর আচার মুসলমানের আচার বৌদ্ধের আচার পৃথক। এই আচার মনুষ্যরচিত। একে যে যত আঁকড়ে থাকবে, সে ততই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আচার যেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে তাই নিয়ে মানুষের পরস্পর অনৈক্য ঘটে না। আমাদের দেশে শক্তিক্ষয়ের প্রধান একটা হেতু ধর্মের নাম নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে বহু নিরর্থক সংস্কারের আধিপত্য। এতে ধর্মের ভ্রষ্টতা এবং আচারের অত্যাচারপরায়ণ অন্যায় রূপ প্রকাশ পায়।

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বহু ও একের তত্ত্ব দিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তিনি আমাদের সমাজের এই বাস্তব ভেদরেখার কঠোরতার দিকটি তেমন করে দেখেন নি। তাঁর কল্পনা ছিল ভারতবর্ষের প্রতিভা প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রতিভা। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজের একটি বিপরীত গতির কথা তিনি উহ্য রেখেছিলেন— সেটি হচ্ছে ঐক্যের মধ্যে প্রভেদের প্রবণতা। ভারতবর্ষে বহু জাতির মিশ্রণ হয়েছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য ধর্মভেদ জাতিভেদকে বজায় রেখে চলবার চেষ্টা। এই দুই প্রবণতাকে কেবল তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে না দেখে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা কর্তব্য। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সর্বভূতে ব্রহ্ম।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

কিংবা

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনং॥

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা ভেদাভেদ বিচার দ্বারা আমরা সমাজকে বিভক্ত করে চলি। হিন্দু মুসলমান খৃস্টান প্রভৃতি ধর্মভেদ দ্বারা সর্বমানবিকবোধ খণ্ডিত তো হয়ই, উপরন্তু একই ধর্মসমাজের মধ্যে নানা জাতি ও বর্ণভেদ অধিকতর বিভেদের সৃষ্টি করে। শাস্ত্রাচার থেকেই বর্ণভেদ জাতিভেদ সম্প্রদায়ভেদের আরম্ভ। কিন্তু যেখানে শাস্ত্রাচার নেই, সেখানে উদারতর মানবতার বাণী শুনতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রের গণ্ডির বাইরে ভিন্নতর জীবনাচরণের একটা ধারা আমাদের দেশে চলে এসেছে, মধ্যযুগের সাধুসন্তদের মধ্যে বাউল সহজিয়াদের মধ্যে যেখানে তারা দেখেছে মানুষকে আর তার অন্তর্নিহিত পরম সত্যকে, তার যে-নামই দেওয়া যাক। ভারতবর্ষের সমাজ শাস্ত্রাচার লোকাচারের বাইরে দেশের এক বৃহৎ অংশকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে। এই সমাজ সম্বন্ধে আমরা প্রথম অবহিত হই মধ্যযুগে কবীর

নানক দাদূ রজ্জব বাউল বৈষ্ণবদের সাধনায়। ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শন সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে এই সাধনার ধারাকে লোকলোচনের সম্মুখে নিয়ে এলেন। আধুনিক কালে এদের কথা প্রথম বলেন রামমোহন রায়। তিনি দেখেছেন সম্প্রদায়ভেদ যাই থাক্, এক পরম ব্রহ্মের চিন্তাতেই সকলে মিলিত হতে পারে—

'এই হিন্দোস্তান ভিন্ন অর্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দুস্তানের শাস্ত্রোক্ত নির্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদূ সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন।'

রামমোহন এই কথাগুলি লিখেছিলেন বেদান্ত গ্রন্থের (১৮১৫) ভূমিকায়। তিনি নিজে যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন, তা উচ্চতর বিদগ্ধ সমাজের জন্য। এই সমাজেই শংকরাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের চিন্তাতে ধ্বনিত হয়েছে ঐক্যসূচক পরব্রহ্মের বাণী। আবার রামমোহন স্মরণ করেছেন উচ্চ সমাজের বাইরে লোকসমাজেও সেই ঐক্যসাধনার ধারা প্রবহমান। এই সাধনার ধারাটিকে উচ্চতর চিন্তাধারার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করেছেন ক্ষিতিমোহন সেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহন প্রসঙ্গে অনেক-বারই এই সাধকদের স্মরণ করেছেন—

'আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে, সাম্প্রদায়িক প্রথার মধ্যে নেই। সেইজন্য ভারতবর্ষের ঐক্যসাধক ঋষিরা সকল ধর্মের মূলে যে চিরন্তন ধর্ম আছে তাকে ভেদবোধপীড়িত মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। শাস্ত্র সাময়িক ইতিহাসের; আত্মপ্রত্যয় চিরকালের। শাস্ত্র ভেদ ঘটায়, আত্মপ্রত্যয় মিলন আনে। দাদূ কবীর নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা ধর্মের শাস্ত্রীয় বাহ্যরূপের বাধা ভেদ করে এক পরম সত্যের আধ্যাত্মিক রূপকে প্রচার করে-ছিলেন। সেইখানেই সকল বিরোধের সমন্বয়।'[১৩]

একসময়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সভ্যতার নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে ঐক্য-সাধনের প্রবণতাকে দেখিয়েছিলেন, উত্তরকালে এ-মত থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি, তবে ভেদপ্রবণতার কুফল সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে অবহিত করতে চেয়েছেন। সেইজন্য সমগ্রভাবে ঐতিহাসিক প্রকৃতির দিকে চেয়ে সামাজিক আচারভেদের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন কিন্তু বার বার স্মরণ করিয়েও দিয়েছেন ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে আধ্যাত্মিক ঐক্যের সাধনা। এই সাধনা দিয়েই আমরা আচারভেদের

তুচ্ছতাকে উপলব্ধি করতে পারি। ক্ষিতিমোহন সেনের দাদূ বইটির বিস্তারিত ভূমিকায় খুব চমৎকার করে রবীন্দ্রনাথ এটি বুঝিয়ে দেন—

'যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেইজন্তেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী। সেইজন্তেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা করে রেখেছে এইজন্তেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম করে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা।...

আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদূ ভারতের যে-সত্যসাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি। ভারত-চিত্তের প্রকাশের পথ উদ্‌ঘাটিত হবেই।'[১৪]

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা ভেদাভেদ বিচার দ্বারা আমরা সমাজকে বিভক্ত করে চলি। হিন্দু মুসলমান খৃস্টান প্রভৃতি ধর্মভেদ দ্বারা সর্বমানবিকবোধ খণ্ডিত তো হয়ই, উপরন্তু একই ধর্মসমাজের মধ্যে নানা জাতি ও বর্ণভেদ অধিকতর বিভেদের সৃষ্টি করে আসছে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্রের বিরোধ ছিল, তার মধ্যে ছিল এক-এক অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের উৎকর্ষ-অপকর্ষ, পরে অজস্র জাতিভেদ, কুলভেদ, গোত্রভেদ তার সঙ্গে আঞ্চলিক ভেদ মিলে হিন্দু সমাজকে শতধা বিদীর্ণ করেছে। এই ভেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভবই ছিল। অবশ্য এই জাতিভেদকে মেনে নিয়েও বহুশত বৎসর সমাজ টিকে এসেছে এটাই সত্য। সমাজের যারা অন্ত্যজ তারা এতকাল এ নিয়ে প্রশ্ন করে নি, উচ্চতর শ্রেণীর সেবাকার্যে নিযুক্ত ছিল। এইভাবেই চলে এসেছে। যোগী বা ভাবুক মনে মনে বিশ্বাস করেছেন :

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি শৈচব স্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ ॥

কিন্তু সমাজের ব্যবহারে ঐক্যের অধিকার সবাইকে দেওয়া হয় নি, তাতে নানা কুফল ফলেছে, তার বিবরণ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। একজন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেন :

'বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজের যুগের শেষ পর্যন্ত দেখিতে পাই যে সমাজে ও ধর্মে ঐক্যের মধ্যে প্রভেদ স্থাপন করাই হিন্দু সমাজের মূল নীতি।

অবিভক্ত আর্য জাতি প্রথমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার মধ্যেও স্পষ্ট বিরোধের ভাবই দেখিতে পাই— ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইয়ের মধ্যে নিজেকে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায়। তার পর এই তিন বর্ণ ও শূদ্র অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অখণ্ড হিন্দু সমাজে শত সহস্র জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার মধ্যে ঐক্য ও মিলনের পরিবর্তে বিরোধেরই আভাস পাওয়া যায়।··· প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই যদি আর্যদের একমাত্র চেষ্টা ছিল, তবে বুদ্ধের পূর্বেই তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হইল কেন?'

গীতাতে কৃষ্ণ বলেছেন গুণকর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হয়েছে এবং এর দ্বারাই সমাজের সংহতি রক্ষা হয়। এখানে আপন আপন কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ম করবেন— এতে সকলের মিলিত উদ্যমে সমাজ দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ হবে— এই রকমই আদর্শ মূলত ছিল। কিন্তু সে আদর্শ অক্ষুন্ন থাকে নি। ছোটো কাজ বা উঁচু কাজ বলে পারস্পরিক ঘৃণা জন্মে ওঠায় সমাজের সংহতি বরং দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে।[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যখন সমগ্রভাবে দেখেছেন তখন ঐক্য-রূপটিকে কিংবা ঐক্যস্থাপনের প্রয়াসটিকে দেখেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা এখানেই বদ্ধ থাকে নি। হিন্দু সমাজের নিজের মধ্যেই প্রভেদের প্রয়াস সর্বব্যাপী এটা তিনিও বেদনার সঙ্গেই মেনেছেন। বিশেষ করে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের ভেদপ্রবণতাকে নানা উপলক্ষে কঠোর আঘাত করেছেন।

'এই প্রকার মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের অভিঘাতে সমাজ শত খণ্ডে ভেঙে পড়ল— তার নাম নিয়ে বেশির ভাগ দেশবাসীকে অবজ্ঞাভাজন করা হল, বলা হল অশুচি ও অপাঙ্‌ক্তেয়। আচারের বেড়া গেঁথে যে বহুসংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মূঢ়তা, তাদের আত্মাবমাননা সমগ্র দেশের ওপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে সুদীর্ঘকাল। অথচ আমাদের যা বিশুদ্ধ, যা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূরি পরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি— এত বড়ো কথা বোধহয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধ স্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি। আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঘরে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সত্তা শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দুরবস্থা উপস্থিত।'[১৬]

আনুষ্ঠানিকতা এবং আচারের প্রভুত্ব খর্ব না হলে এই ভেদ দূর হবে না।

আচার মানুষকে চিনিয়ে দেয় এ কথা সত্য এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা ভালো করেই জানেন কিন্তু মানুষের পরিচয় শুধু আচারে বদ্ধ থাকলে ভেদরেখা বাড়ে বৈ কমে না। আচারের গণ্ডির মধ্যে মানুষ বিচরণ করত যখন, সেই সময়কে বলে মধ্যযুগ, ইংরেজিতে বলে ডার্ক এজ। একালের মানুষের বিচরণক্ষেত্র অনেক ছড়িয়ে গেছে, বহু মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগীয় আচার-মনস্কতা আমাদের এখনও যায় নি। এখনও হিসাব করে উঠতে পারি নি আচারের কতটুকু আমার স্বভাবগত, কতটুকুই বা বিরোধমূলক। শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যে নয়, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধেও এই প্রশ্ন জেগে থাকে।

মধ্যযুগে য়ুরোপে চলত ধর্মযুদ্ধ। এক ধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিজিত করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে মনে করেছে। আজ কিন্তু তা আর হয় না। এই মনোভাব যে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাও নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো বিচিত্র ধর্মসংস্কৃতির দেশে এই মনোভাবের বিপজ্জনকতা স্বতঃপ্রমাণিত। এখন আমরা এক রাষ্ট্রবন্ধনে আসতে চাই, নেশন গড়ে উঠছে, তাই সমাজের ক্ষেত্রেও সংহতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমরা এই কথা দিয়েই আরম্ভ করেছিলাম যে প্রজা-শক্তি-নির্ভর রাজশক্তি দিয়েই নেশন তৈরি হয়। প্রজাদের মধ্যে সংহতির অভাবে নেশন দুর্বল হয়ে পড়ে। এ তো আমরা আজ দেখতেই পাচ্ছি। এই সমস্যাটিকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বাস্তব দৃষ্টি দিয়েই দেখেছেন। কোনো তত্ত্বের আশ্রয় না নিয়ে ইতিহাসের রূঢ় সত্যকে তিনি এইভাবে বলেছেন :

'ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে— 'ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল ; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। একপক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে ? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ— এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।…বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল— এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান।'[১৭]

রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন সমস্যা :

'সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারো সঙ্গে কারো মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।'[১৭]

রবীন্দ্রনাথের কল্পিত সংহতি-সাধনের মূল কথাটা এই যে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়ে অর্থহীন আচারবন্ধনকে শিথিল করলে অন্তর্নিহিত ঐক্যটি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। শিক্ষার দ্বারাই ঐক্যবোধ লভ্য। মানুষের পরিচয় তার আচারে হওয়া উচিত নয়, পরিচয় হওয়া উচিত তার সৃষ্টিতে— সংস্কৃতিতে যার অভিপ্রকাশ। সৃষ্টির বৈচিত্র্য মানবস্বভাবকেই উদ্‌ঘাটিত করে।

উল্লেখসূত্র

১. ভারত-কলঙ্ক, ১৮৭৩
২. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, জাতীয় ভাব— উহা সম্বর্ধনের পথ।
৩. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'রাষ্ট্র ও নেশন্', বঙ্গদর্শন ১৩০৮, ভাদ্র। দ্রষ্টব্য 'নানা কথা'।
৪. শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। দ্র. পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' দ্বিতীয় খণ্ড।
৫. পরিচয় গ্রন্থে সংকলিত 'আত্মপরিচয়' (১৩১৯), দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮ (বিশ্বভারতী)। তত্ত্বকৌমুদীতে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে 'ব্রাহ্ম-হিন্দু' বিতর্ক শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু-ব্রাহ্ম' প্রবন্ধ রচনা করে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে হিন্দু শব্দটা ব্যাপকার্থে প্রযোজ্য এবং ভারতীয় ঐক্যজ্ঞাপক। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় প্রকৃতিকেই 'হিন্দু' বলতে চেয়েছেন— এতে মুসলমান খৃস্টানও অন্তর্ভুক্ত ধরতে বাধা নেই।

৬. 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৩০৯), র.-র. ৪, পৃ. ৩৮১, ৩৮৩

৭. P. N. Srinivasachari, The Visistadvaitavada of Ramanuja. দ্রষ্টব্য, *The Cultural Heritage of India*, vol. III (1961), p. 303.

৮. 'আত্মপ্রত্যয়', শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, পৃ. ৪১৪ বিশ্বভারতী

৯. ভারত-ইতিহাস চর্চা, শান্তিনিকেতন, চৈত্র, ১৩২৬। দ্রষ্টব্য 'ইতিহাস', ১৩৬২, পৃ. ৭৫

১০. *The Real and the Apparent Man*, Complete Works of Swami Vivekananda, vol. II, Advaita Ashram, 1963, p. 274.

১১. ১৮৯৬-তে লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণ।

১২. 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', ১৩৬৬, পৃ. ৩৩

১৩. প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৫। দ্রষ্টব্য 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', ১৩৬৬, পৃ. ৫৯

১৪. দাদূ (১৩৪২) ভূমিকা। ভূমিকাটি ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৫. দ্রষ্টব্য শিবনাথ শাস্ত্রী, 'জাতিভেদ', নূতন সংস্করণ, ১৩৭০

১৬. প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭। 'ভারতপথিক রামমোহন রায়', ১৩৬৬ পৃ. ৩৫-৩৬

১৭. 'হিন্দুমুসলমান', ১৩২৯। দ্রষ্টব্য 'কালান্তর'।

জাতীয় সংগীতে জাতীয় সংহতি

স্বাধীনতা লাভের আটচল্লিশ বছর পরে আজও ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত নিয়ে বিতর্ক শেষ হয় নি। এই সেদিনও দক্ষিণ ভারতে জনগণমন নিয়ে আপত্তি শোনা গেল। সে-বিতর্ক ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় পর্যন্ত গড়িয়েছে। কেউ আপত্তি করেছেন, এ গান ঠিক দেশভক্তির গান নয়, ভগবদ্ভক্তির গান। সুতরাং নতুন গান তৈরি হওয়া দরকার যে-গান সত্যি জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারবে। এই বিতর্কের সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ হিন্দি বা উর্দু ভাষায় লেখা জাতীয় সংগীতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। আমাদের জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে সব সংশয়ের নিরসন যে এখনও ঘটে নি, ভারতীয় হিসাবে সেটা আমাদের নিয়তি। যে-দেশে এত অজস্র বৈচিত্র্য সে দেশের চিন্তার ধারাকে একটি খাতে বইয়ে দেওয়া শক্ত। অবশ্য দেশ বা জাতি সম্পর্কে তো কোনো সংশয় থাকবার কথা নয়। এ দেশ আমার বা আমি ভারতীয়— এই বোধ ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের যে-কোনো প্রান্তের মানুষেরই হওয়া উচিত। কিন্তু আজ চারি দিকে তাকালে অবস্থা যেন অত সহজ মনে হয় না। শক হুন পাঠান মোগল হিন্দু মুসলমান দ্রাবিড় আর্য কিরাত শবর— সবাইকে নিয়ে যে জাতি, তার ইতিহাস অন্য দেশের মতো নয়। সে-কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন এবং তাঁর গান 'জনগণমন'-এ তার স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।

জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে বলতে গেলে স্বভাবতই জাতির ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। কারণ জাতীয় সংগীত কোনো সম্প্রদায় অর্থে জাতির গান নয়, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ, হিন্দু বা মুসলমানের গান নয়। জাতি সম্বন্ধে আমাদের এই পূর্বতন ধারণা থেকে উত্তীর্ণ হতে বহু সময় লেগেছে। এখনও আমরা উত্তীর্ণ হতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। একরাষ্ট্র-পরিচালিত সমমনোভাবাপন্ন একটি বৃহৎ মানব-সমাজকে আমরা আজকাল বলি জাতি। এর দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যে সর্বত্র। প্রায় সব দেশেই এক জাতির ভাষা একটা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা থাকলেও ভাষার পার্থক্যটা বড়ো না হয়ে সমমনোভাবটাই বড়ো হয়েছে। তাই তারাও জাতি। ভারতবর্ষে ভাষা অজস্র, ধর্মও বহু, আচার-বিধিও অঞ্চলভেদে

বহু। আমরা যখন বলি, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত একটি অখণ্ড ঐক্য বিরাজমান, তখন কথাটা হয়তো এক অর্থে ঠিকই বলি, তবু মনে রাখা দরকার এর মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মের মধ্যেও আচার-বিধিতে পার্থক্য আছে। এমনি করে আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের পার্থক্যকেও দেখানো যেতে পারে। তবু ইতিহাসের নিয়তি আমাদের সবাইকে একসূত্রে গেঁথেছে। আজ বহু বৈচিত্র্য ও বর্ণভেদ সত্ত্বেও আমরা একজাতি। এই বৈচিত্র্যকে নিয়ে যে জাতীয় সংগীত সেটাই আমাদের সংগীত। এ কথাটা মনে রাখার দরকার এইজন্যই যে, সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো দেশের জাতীয় সংগীতে বৈচিত্র্যকে স্বীকার করবার দরকার হয় না।

এই বৈচিত্র্যকে নিয়ে আত্মচেতনার অভিব্যক্তির একটি ইতিহাস আছে। আমাদের জাতীয় সংগীত তারই প্রবণতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের পূর্বতন সাহিত্যে বা শাস্ত্রে আজকের মতো রাষ্ট্রনির্ভর জাতিচেতনার কথা পাওয়া যায় না। এই জাতিচেতনার সূচনা হল উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রথমে দেশচেতনা তার পরে জাতিচেতনা। যে-মাটিতে বা যে-কুলে জন্মেছি, তার প্রতি আকর্ষণ মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। বাল্মীকি-রামায়ণের বঙ্গীয় সংস্করণে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

ন মে স্বর্ণময়ী লঙ্কা রোচতে তাত লক্ষ্মণ।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

এই মমতা রাজনৈতিক অর্থে দেশপ্রীতি নয়, জন্মভূমির প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসা। এর কোনো কারণ খোঁজবার দরকার হয় না। উনিশ শতকে এই দেশপ্রীতিই সাহিত্যে ও সংগীতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার রূপ একটু অন্যরকমের হল। দেশ বলতে একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় সীমাবদ্ধ ভূমিকে বোঝানোর দরকার। ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশ তখন আমাদের সাহিত্যে ও কবিতায় স্থান নিয়েছে। সাহিত্যে দেশচেতনার স্থান পাওয়ার তাৎপর্য গভীর। কারণ শাস্ত্রে বা পুরোনো সাহিত্যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ কোনো অখণ্ড দেশের কথা প্রচলিত ছিল না। বিষ্ণুপুরাণে জম্বুদ্বীপের প্রশস্তি আছে। কিন্তু আমার দেশ বলে কবি কখনো নির্দিষ্ট সীমাকে নির্দেশ করেন নি। ভারত বা বঙ্গভূমিকে স্বদেশ বলে নির্দেশ করে গৌরব বোধ করার দৃষ্টান্ত নেই। আমাদের পুরোনো বাংলা সাহিত্যে সে-রকম কিছু পাওয়া যায় না। উনিশ শতকে ডিরোজিওর ইংরেজি কবিতায় প্রথম পাওয়া গেল To India my native land। বাংলা ভাষাতে ভারতবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। তিনিই প্রথম ভারতভূমিকে 'জননী' বলে সম্বোধন করেছিলেন—

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে ?

—এটা ১৮৪৭ সালে লেখা কবিতা। তখন থেকেই ধরা যেতে পারে ভারতবর্ষ কবিদের চেতনায় জননীরূপে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। বাংলাদেশ এবং বাঙালির কথা স্বাভাবিকভাবেই নানা উপলক্ষে পূর্ববর্তী লেখকদের লেখা থেকেই পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাই ছিল এই বাংলাদেশচেতনার কারণ। সেটা বোঝা যায়, কিন্তু ভারতভূমিকে মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করে নেবার কল্পনা কী ভাবে এসেছিল বলা যায় না। কয়েক বৎসর পর মধুসূদন লিখেছেন 'বঙ্গভূমির প্রতি' সেখানে বঙ্গভূমিকেই তিনি জননীস্বরূপা জ্ঞান করেছেন। আর তাঁর অন্তিম প্রার্থনা ছিল 'জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারতরতনে' (১৮৬৫)। এখানে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ মিশে গেছে।

দেশচেতনার সঙ্গে ক্রমে অনুভূত হল জাতিচেতনা। জাতিচেতনার সৃষ্টি বিশেষ তাৎপর্যবহ ঐতিহাসিক ঘটনা। যে-বঙ্গ এবং ভারতকে কবিরা দেশ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তার অধিবাসীরা সবাই একটি সমাজে বদ্ধ। সেই সমাজ সম্বন্ধে একটা সমগ্রতা ও অখণ্ডতা বোধেই জাতি ধারণার উদ্ভব। আগে আমরা ছোটো ছোটো গণ্ডিতে বাস করেছি। দেশচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ বা জাতির অনুভব দেখা দিতে লাগল। নানা ধর্ম আছে তাতে, নানা মত এবং নানা রূপ নিয়ে এই বৃহত্তর জাতিকে আমার 'ক্ষুদ্রতর জাতির উর্ধ্বে স্থান দেবার কর্তব্যবোধ আমাদের কাছে নতুন আদর্শ স্থাপন করেছে। এই জাতি-ভাবনাটিও নতুন। তখনও পর্যন্ত ভারতীয়রা একজাতি কিনা— এ বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ আরম্ভ হয় নি কিন্তু আগোচরেই যেন একজাতীয়তাবোধ জেগে উঠেছে। কয়েকবছর পর বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে জাতিচেতনার বিশ্লেষণ করে লিখেছিলেন 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধ (১৮৭৩)। তাতে ভারতীয়দের মধ্যে একজাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠবার বাধা কোথায়, তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিভিন্ন যুগে বহু জাতির মিশ্রণে ভারতীয় জাতির বর্তমান রূপ। তাই ভারতীয়দের মধ্যে এত বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথ বলবার আগেই উনিশ শতকের মনীষীদের দৃষ্টিতে ভারতীয় ইতিহাসে এই দিকটি চোখে পড়েছিল। তবু ভারতীয়রা সবাই যে এত বৈচিত্র্য নিয়েই এক জাতি এ কথাটিও তাঁরা অনুভব করেছেন।

বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জাতীয়তার সংগীত প্রথম শোনা গিয়েছিল ১৮৬৭ সালের হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে। হিন্দুমেলার পরিকল্পনা এসেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

থেকে। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র। তাঁরা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা। রাজনারায়ণ জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভাস্থাপনের প্রস্তাব' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তার ভাব সঞ্চারিত করা। এই ভাবটি নিয়ে নবগোপাল মিত্র আরম্ভ করেন হিন্দুমেলা ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল। দেশানুরাগ জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী, দেশীয় খেলাধুলা, ব্যায়াম, কবিতাপাঠ ইত্যাদির আয়োজন হয়। এই মেলায় উদ্‌বোধন হত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'গাও ভারতের জয়' গানটি দিয়ে—

মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী;
শতখনি রত্নের নিধান॥
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

অতঃপর এই গানে ভারতের অতীত গৌরবগাথা ও আদর্শ চরিত্রের উল্লেখের দ্বারা উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রয়াসে জাতীয় সংগীতের পূর্বাভাস রচিত হয়েছে। ১৮৭৫-এ হিন্দুমেলায় বালক রবীন্দ্রনাথ যে 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি পড়েছিলেন এই গানে ছিল তারই পূর্বসূত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯-এর চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বইটির সমালোচনায় এই গানটি সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃত করে বললেন—

'রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।'

তখনও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম গানটি কল্পনায় আসে নি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গানটির মধ্যে দেশমূর্তি দেখা দিয়েছে, সেইসঙ্গে দেখা দিয়েছে, জাতীয় উদ্দীপনা—

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম স্ততো জয় ॥
ছিন্নভিন্নে হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?

এর প্রায় দশ বৎসর আগে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব কল্পনা করে কবি লিখেছিলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম গানে এই দুই গানের ভাবনির্যাস ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের এই গানটিতে আর-একটি বিশেষত্ব ছিল যার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর রচিত রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানটিতে। জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে গিয়ে কবি ভোলেন নি ধর্মের জয়ের কথা। মনে রাখা ভালো 'যতোধর্ম স্ততো জয়' এই মহাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন মহাভারতের যুদ্ধের প্রাক্‌কালে গান্ধারী। দুর্যোধন যখন জননীর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গেলেন, তখন গান্ধারী বলতে পারেন নি— তোমাদের জয় হোক। তিনি বললেন যেখানে ধর্ম সেখানে জয়। আমাদের জাতীয় উদ্দীপনাতেও আমরা ধর্মকেই স্মরণ রেখেছি —যে-ধর্ম সর্বজনীন মানবধর্ম। আমাদের জাতীয় সংগীতের মধ্যে এই তিনটে বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাই— দেশের ভৌগোলিক প্রতিমা, ঐক্য ও সংহতি চেতনা এবং ধর্মবোধ। এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি একান্তই আমাদের। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সংগীতে দেশের জন্য গৌরববোধ আছে, দেশমূর্তিকেও উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়াস আছে সেইসঙ্গে আছে একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণাদায়ক রৌদ্রভাব। রৌদ্রভাব আমাদের সেকালের প্রায় সব দেশাত্মবোধক গানেই থাকত। আজ মনে হয় তার দরকারও ছিল। একটি বিখ্যাত গান সরলা দেবীর 'হিন্দুস্থান'। এই গান প্রথম গাওয়া হয়েছিল কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে ১৯০১ সালে—

অতীত গৌরববাহিনি মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান।
মহাসভাউন্মাদিনি মম বাণি, গাহ আজি হিন্দুস্থান।
কর বিক্রম-বিভব-যশ-সৌরভ-পূরিত সেই নাম গান ;
বঙ্গবিহারউৎকল মান্দ্রাজ মারাঠা গুর্জর-পঞ্জাবরাজপুতান।
হিন্দু পার্সি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান,

গাও সকল কণ্ঠে সকলভাবে— নমো হিন্দুস্থান,
জয় জয় জয় হিন্দুস্থান, নমো হিন্দুস্থান।
ভেদরিপু-বিনাশিনি মম বাণি, গাহ আজি ঐক্যগান।
মহাবলবিধায়িনি মম বাণি, গাহ আজি ঐক্য গান।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের অতীত গৌরববোধ, ভারতীয় জাতিসংহতি এবং প্রবল অনুপ্রেরণা এই গানটিতে সার্থকতর শিল্পরূপ লাভ করেছে। সংহতি ও বৈচিত্র্য একই সঙ্গে এতে আছে, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন-তে সেই কল্পনারই নবরূপ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওই গানটি যেমন সরলা দেবী ও রবীন্দ্রনাথের গানের পূর্বরূপ, তেমনি বঙ্কিমের বন্দে মাতরমেরও অঙ্কুর সেখানেই। এই গান বঙ্কিমকে কতখানি অভিভূত করেছিল, বঙ্কিমের শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্যই তার প্রমাণ। ১৮৭৫ সালে বঙ্কিম যখন বন্দেমাতরম গান রচনা করেন, তখন এই গানটি তাঁর মনে ছিল না তা হতে পারে না। বঙ্কিম তখন দেশভাবনায় মগ্ন। কিছুকাল আগে সুহৃদ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস' বেরিয়েছে যাকে তিনি বলেছিলেন একমুঠো সোনা। বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস নিয়ে বঙ্কিম বেশ কিছুদিন থেকেই জিজ্ঞাসু ছিলেন। বাংলার ইতিহাস নেই বলে তাঁর দুঃখও কম ছিল না। রাজকৃষ্ণের বইতে তিনি বাঙালির গৌরবের প্রমাণ পেলেন। তা ছাড়া বন্দেমাতরম রচনার অন্য উপলক্ষ ছিল। আনন্দমঠ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সত্যেন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে বন্দেমাতরম গানের মিল প্রধানত দু'দিক দিয়ে। দেশের একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরূপ দুজনের গানেই পাওয়া যায়, দুজনের গানেই আছে বীর্যের প্রণোদনা। 'ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী'র ছবিটি বঙ্কিমের গানে সুজলা সুফলা মাতৃভূমির রূপ নিয়েছে।

যে রূপান্তর বঙ্কিম করলেন সেটির তাৎপর্য হল সুদূরপ্রসারী। সত্যেন্দ্রনাথের গানটি মূলত বিবৃতিধর্মী, তাতে ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা কম। বন্দেমাতরমে গড়ে উঠল এক মাতৃমূর্তি, সংগীতের ঝংকারে, ছন্দস্পন্দনে চিত্ররূপময়তায় বন্দেমাতরম হল একটি পরিপূর্ণ সার্থক কবিতা। এই গানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর নারীরূপ। দেশকে জননী বলে সম্বোধন করেছেন আগের কবি, কিন্তু মায়ের মূর্তিতে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন নি। বন্দেমাতরমের চোখে পড়বার মতো বৈশিষ্ট্য হল দুটি— একটি ওই দেবী বা মাতৃরূপ, অন্যটি এর বিষয়, বাংলাদেশ। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গণেন্দ্রনাথ যে-গান লিখেছিলেন, ভারতচেতনা তার অবলম্বন। কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ও লিখেছিলেন 'কতকাল পরে বল ভারত

রে ! দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'। হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' 'ভারতসংগীত' প্রভৃতি কবিতাও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের যুগের রচনা। এই পরিপূর্ণ ভারতীয় দেশচেতনার মধ্যে বঙ্কিম যে-সংগীত রচনা করলেন সেটি বঙ্গভূমিকে নিয়ে। আজকালকার সমালোচকেরা হয়তো বলবেন, বঙ্কিমের দেশচেতনা সংকোচনধর্মী। কথাটা নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। যে-সময় তিনি বন্দেমাতরম লেখেন, তার কিছু আগেই ভারত সম্বন্ধে প্রবন্ধও তিনি লিখছেন। তবু যে তিনি বাংলাদেশকেই তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন, তার কারণ বঙ্গ-ভূমি স্বভাবতই অধিকতর প্রত্যক্ষের বস্তু, বিশেষ করে ভাষার মাধ্যম থাকায়। এটা বলার দরকার নেই যে সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদিত বঙ্গভূমির প্রশস্তি রচনার উদ্দেশ্য অবশ্যই বাঙালিকে জাতি হিসাবে আলাদা করে নেওয়ার জন্য নয়, সেটা তখন কল্পনাতেও ছিল না। বাংলার ইতিহাস এবং বাঙালি জাতি সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখলেও ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতি হিসাবে ভাববার কোনো প্রমাণ কোথাও নেই।

এই বাংলাদেশকেই বঙ্কিম নারী-প্রতিমায় রূপ দিলেন। তবে এই প্রতিমা ঠিক যে দুর্গা তা বলা চলবে না। তাঁকে বলেছেন ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী আবার তাঁকেই বলেছেন কমলা কমলদলবিহারিণী। অর্থাৎ তিনি দুর্গা এবং কমলা —কোনো একটা বিশেষ প্রচলিত রূপ তাঁকে দেন নি। দুর্গার বরাভয় শক্তি এবং কমলার ঋদ্ধি সব-কিছুরই তিনি সম্মিলিত প্রতিমা। আবার তিনি বাণীও। বঙ্কিমের দেশমাতৃকা শক্তি, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, ধর্ম, মানুষের পরমার্থ বলতে যা বোঝায় সব-কিছুরই প্রতীক। এবং তাঁর প্রত্যক্ষ রূপ হচ্ছে শস্য-শ্যামলা শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিত বঙ্গভূমির নিসর্গ প্রকৃতি। এই বর্ণনার ফলে এই গানটির মধ্যে এসেছে ভাবরূপ, শুধু ঐতিহাসিক তথ্য নয়, কিংবা প্রত্যক্ষ উন্মাদনা সৃষ্টিও নয়। অবশ্য হিন্দুর দুর্গামূর্তি, লক্ষ্মী সরস্বতীকে নিয়ে অসুরবিনাশিনী শক্তির ভাবমূর্তি। আমরা এমন একটা শক্তির আরাধনা করি যে শক্তি অশুভকে বিনাশ করবে এবং সেইসঙ্গে বিদ্যা, ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি দেবে। সেই মূল শক্তির রূপ কল্পনা করা হয় লক্ষ্মী সরস্বতী -বেষ্টিত দশভুজা মূর্তিতে। বঙ্কিমের মাতৃমূর্তিতেও সব শক্তির সমাহার। কিন্তু প্রচলিত কল্পনাতে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের আলাদা আলাদা মূর্তি। বন্দেমাতরমের দেবীমূর্তি একজন, তিনি একাই সব বৃত্তি এবং কাঙ্ক্ষিত ধর্ম অর্থ মোক্ষের প্রতীক। সুতরাং মানুষের হৃদয় যে বিদ্যা ও ধর্ম কামনা

করে বঙ্কিমের দেশজননী সেই সব-কিছুরই সংহত রূপ। এই কল্পনাতে দুর্গার প্রচলিত রূপ নেই, তবে মানুষের সকল কাম্যবস্তুর একটি রূপ কল্পিত, যার সঙ্গে মিশেছে স্বদেশের নিসর্গ রূপের চেতনা। সব মিলিয়ে বঙ্কিমের জননী হচ্ছেন প্রত্যক্ষ দেশচেতনা। কাব্য হিসাবে এর সার্থকতা হচ্ছে ভাবময়তার উত্তরণে। দেশের নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে দেশের মানুষের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাকে মিলিয়ে এর রচনা। বঙ্কিমের কমলাকান্তের একটি রচনায় কালসমুদ্রে নিমজ্জিতা দুর্গাকে আবার উদ্ধার করে নিয়ে আসবার স্বপ্ন আছে। সেখানে দুর্গাকেই বলেছেন 'চিনিলাম এই আমার দেশ'। ব্যক্তিগত বর্ণনাতেও দেখা যায়, বঙ্কিমগৃহে কোনো এক দুর্গাপূজার রাত্রিতে তাঁর মনে ভাবের প্রেরণা এসেছিল। বন্দেমাতরমের দেশ-মূর্তির উৎস হিসাবে অষ্টমী পূজার দিনের দুর্গাধ্যান হয়তো কাজ করেছিল। অর্থাৎ বঙ্কিমের একটা প্রবর্তনা এসেছিল ধর্মানুষ্ঠান থেকে, কিন্তু তাঁর উদ্দিষ্ট বস্তু ধর্মীয় প্রতিমা নয়। মাতৃমূর্তি কল্পনাতে ধর্মের রূপকল্প তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

বোধ হয় দেশবোধকে সত্য এবং ভাবাবেগপূর্ণ করতে অভ্যস্ত ধর্মের সংস্কার বলাধান করে। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' গানটিতেও যাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেশ নন, দেশের এবং মানবমাত্রেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা— ব্রহ্ম। ব্রহ্মোপাসনায় তাঁকে স্মরণ করা হয় 'পিতা নোঽসি' ব'লে। তিনি পিতা, মাতা নন। অর্থাৎ নারীরূপে তাঁকে ভাবা হয় নি। জনগণমন গানটি সেদিন ব্রহ্ম-সংগীতরূপেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৯১১ সালে। বন্দে-মাতরম গানটি মনে ভাবাবেগের সৃষ্টি করে, শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে অকল্যাণকে দূর করবার উৎসাহমূর্তি রচনা করে, জনগণমন গানে অনেকটা চিরন্তন ভাগ্য-বিধাতার কল্পনায় মনকে শান্ত করে, নির্বেদ-জাতীয় ভাবমণ্ডল রচনা করে। এই-জন্যই বন্দেমাতরম হিন্দুর ধর্মচেতনা থেকে সৃষ্টি হলেও সে-গান কর্মে ও অনুষ্ঠানে প্রবর্তিত করে— আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য আছে। এ কথা তো সকলেরই জানা যে জনগণমনের ভাগ্যবিধাতা কোনো সম্প্রদায়ের সংস্কার থেকে কল্পিত নয়, তিনি হিন্দু-মুসলমান যে-কোনো সম্প্রদায়েরই ধ্যান-যোগ্য কল্পনা। বন্দেমাতরমের দেশজননী বিশেষ কোনো অনুষ্ঠেয় ধর্মের কল্পিত প্রতিমা না হলেও হিন্দুর প্রচলিত চিত্রকল্প দিয়ে তৈরি। মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমা গড়বার কল্পনাতে সেই সংস্কার অলক্ষ্যে কাজ করেছে। সেইজন্যই পরে এক-শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ে আপত্তিও হয়েছে।

'আনন্দমঠে' বন্দেমাতরম সন্নিবিষ্ট হবার পরেও দীর্ঘকাল এই আপত্তি শোনা

যায় নি। আপত্তি হওয়ার রাজনৈতিক যোগাযোগ আমরা আলোচনা করছি না। জাতীয় সংগীত হিসাবে বন্দেমাতরমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি। আমাদের জাতীয় জাগরণে মুসলমান সম্প্রদায় দীর্ঘকাল নানা ঐতিহাসিক কারণে কিছু উদাসীন ছিল। তখনকার বাংলা সাহিত্য ও সমাজে হিন্দুধর্মভুক্ত চিন্তা ও কর্ম-নায়কদেরই দেখতে পাই। বঙ্কিমও সে রকমই একজন ভাবুক। তাই তাঁর রচিত গানেও তার ছায়া পড়েছে। বিশেষ করে আনন্দমঠে প্রযুক্ত হওয়াতে এই গানের সাম্প্রদায়িক চেতনা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ সেই বইতে আঠারো শতকের মুসলমান রাজশক্তি সম্পর্কে মন্তব্য অকরুণ।

কিন্তু ইতিহাসের এ তথ্য অস্বীকার করব কী করে যে এই গান জাতীয় জীবনে কী অসাধারণ প্রেরণা দিয়েছে। এই প্রেরণার কারণ বন্দেমাতরমের প্রত্যক্ষ দেশবর্ণনা ও মানবিকভাবের রূপায়ণ। সত্য সত্যই মানুষের মন যে ভাবের আলোড়নে আলোড়িত হয়, এই গানে তারই প্রতিফলন। তাই সহজেই এই গান মনকে উদ্‌বেলিত করে। রচনার পরেও কয়েক বছর বঙ্কিম গানটি প্রকাশ করেন নি। তার পর ১৮৮২ সালে আনন্দমঠে এটি যথাযোগ্যভাবে সন্নিবিষ্ট হলে, বাঙালি এই গানের কথা জানতে পারে এবং আলাদা করে এটি খ্যাতিলাভ করে। ১৮৮৫ সালে ঠাকুরবাড়ির 'বালক' পত্রিকায় গান অভ্যাস বিভাগে এই গানটিকে উদ্‌ধৃত করে বিশেষিত করা হয় 'বিখ্যাত' বলে। সেইসঙ্গে একটি ছবিও ছাপা হয়েছিল হরিশচন্দ্র হালদারের আঁকা। ছবির বিষয় বহু-সন্তান-বেষ্টিত এক জননী। সেই জননী একজন সাধারণ বাঙালি মূর্তি, তাতে কোনো পৌরাণিক গরিমা আরোপিত হয় নি। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'বন্দেমাতরম' এটি যে বঙ্কিমের গান থেকেই অনুপ্রেরিত তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু গানের দেবীর দৈবী ঐশ্বর্য এতে দেখানো হয় নি। আনন্দমঠে সন্নিবিষ্ট হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে পড়ার আরো নিদর্শন আছে। কবি হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

গাহিল সকলে মধুর কাকলি, গাহিল বন্দেমাতরম্‌
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং সুখদাং বরদাং মাতরম্‌।

১৮৮৬ সালে কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে হেমচন্দ্রের এই কবিতা লেখা। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি। বন্দেমাতরম এই সভায় সত্য সত্যই গাওয়া হয়েছিল কিনা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের পরিবার সমাজে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ তখন সকলেরই পরিচিত। সেইজন্যই অনুমান

করা যায় কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তখন নবীন হলেও গান গাইবার জন্য আহূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই গানটি রামপ্রসাদী সুরে, গানের বর্ণনাও খুবই সাধারণ আকুল ভাবের সরল অভিব্যক্তি—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে?
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে 'আয়' ব'লে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে— আর কে কারে ধরে রাখে॥

এই গানে বন্দেমাতরমের ধ্রুপদী গাম্ভীর্য নেই, পৌরাণিক কল্পনা নেই, বন্দে মাতরমের মা যেন আমাদের ঘরের মা হয়ে এসেছেন, পুরাণের চণ্ডী যেমন রামপ্রসাদের আগমনী গানে ঘরের মেয়ে হয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমের মাতৃআহ্বান নানারূপে নানাভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় সরল সুরের মধ্য দিয়ে দেশমাতাই নানাভাবে দেখা দিয়ে বাঙালি চিত্তকে ভরে দিয়েছেন।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—

কিংবা

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!

কিংবা

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥

ইত্যাদি বহু গানে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকেই জননীরূপে আহ্বান করেছেন। দেশকে মা বলে ডাকাটা আমাদের রক্তের সংস্কারই বলতে পারি। এর কারণ খুবই সহজ—মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের মতো এত সহজ স্বাভাবিক এবং নিকটতম সম্পর্ক আর নেই। শিশু মাকে সর্বদা ঘরে পায়, পিতা থাকেন তাঁর গাম্ভীর্য নিয়ে বাইরের কাজে।

বঙ্কিমের মাতৃভাবনার পৌরাণিক কল্পনা থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে এসেছেন মায়ের লৌকিক রূপে। শুধু মাতৃভাবনায় নয়, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে

আরো বহু স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন। তার সবগুলি যে মাতৃরূপের প্রশস্তি তা নয়, আশা উৎসাহ উদ্দীপনা ভরসা -জাগানোর জন্য সেগুলি রচিত। কিন্তু সেগুলি বাঙালিসমাজ ছাড়িয়ে প্রচারিত হয় নি। সেগুলি বাঙালিরই গান, বাঙালিরই সুর, বাঙালি হৃদয়কেই বিশেষভাবে স্পর্শ করে। বঙ্কিমের জাগানো বঙ্গচেতনারই তারা পরবর্তী বিকাশ, তাই বোধহয় বাঙালির মধ্যেই প্রচলিত। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ নামক ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে। একে বলতে পারি বাঙালি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ তখন আমাদের মধ্যে ফলপ্রসূ হয় নি, হয়েছে অনেক পরে ১৯৭২-এ বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্মের ফলে।

আবার বন্দেমাতরম সংগীতের মধ্যে সপ্তকোটি বাঙালির কথা থাকলেও এ গানটিকে সর্বভারতই গ্রহণ করে নিয়েছিল জাতীয় সংগীত বলে। ১৮৯৬ সালে কলকাতা-কংগ্রেসের প্রথম দিনের উদ্‌বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ এই গানটি গেয়ে। তার পরেও জাতীয় কংগ্রেসে বিভিন্ন বৎসরে অধিবেশনের উদ্‌বোধন করা হয়েছে বন্দেমাতরম গান দিয়ে। এখানে অবশ্য একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬-র অধিবেশনে বন্দেমাতরম গাইলেন, প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেন, 'তিনি সম্ভবত এই গানের প্রথম অনুচ্ছেদ সুখদাং বরদাং মাতরম পর্যন্তই গেয়েছিলেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত সরলাদেবীর 'শতগান' পুস্তকেও শুধু এই অংশটুকুরই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর পাওয়া যায়।' পরে যখন জাতীয় সংগীত নির্বাচনের প্রয়োজন হয়, তখনও রবীন্দ্রনাথের মত ছিল এই যে বন্দেমাতরমকে যদি জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করতেই হয়, তবে ওই প্রথমাংশটুকুকেই করা যেতে পারে।

বন্দেমাতরম গানটি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই অনায়াসে প্রচারিত হয়ে গেল। দেশের মুক্তিকামী তরুণ সন্ত্রাসবাদীরা এই গানটিকে কণ্ঠে ধারণ করলেন। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি গঠিত হয় বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্মের নাম নিয়ে, তাঁরা আনন্দমঠ বন্দেমাতরম আর গীতা এই নিয়ে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গে ব্রতী হলেন। ফলে এঁদের মুখে মুখে বন্দেমাতরম বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। অরবিন্দ-তিলক বন্দেমাতরমকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করে নিলেন। সখারাম গণেশ দেউসকর বাংলার ভাবধারাকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করবার অন্যতম বাহক হলেন। সরলা দেবী কাশীর কংগ্রেস-অধিবেশনে সপ্তকোটিকে ত্রিংশকোটিতে পরিবর্তিত করে সর্বভারতের ক্ষেত্রে এর প্রযোজ্যতা প্রতিপন্ন করেছিলেন। শাসক ইংরেজও পরোক্ষে বন্দে মাতরমকে জাতীয় সংগীতের

মর্যাদা দিতে বাধ্য হলেন যখন এই গান গাওয়া নিষিদ্ধ হল এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি উচ্চারণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হল। এই গানের গুরুত্ব স্বীকৃত হল এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে আলোচনাযোগ্য হওয়ায়, বিদেশে ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হওয়ায়। আনন্দমঠ প্রধান উপলক্ষ হলেও গানের তাৎপর্য প্রাসঙ্গিক ভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বন্দেমাতরম আর বঙ্গভূমির প্রশস্তি রইল না, সে হল সমগ্র ভারতের জাতীয় সংগীত। এ রকম প্রশ্ন কেউ তুলেছিলেন কিনা জানি না যে, এতে তো সমগ্র ভারতের অন্তরের কথা নেই, এ কেবল বাংলা অঞ্চলের কথা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'জাতিধর্ম' যা nation এবং nationality নিয়ে নানা আলোচনার সূত্রপাত হল। সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তার সভ্যতার প্রকৃতির আলোচনা চলতে লাগল। সেই আলোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি মনীষী। রবীন্দ্রনাথের এ সময়ের বিভিন্ন লেখায় ভারতের ইতিহাসের নিজস্ব প্রকৃতি এবং তার বৈচিত্র্যধর্ম, ভারতচিত্তের মানবতাবোধ— এই-সব বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যাত হতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি যেমন বঙ্গভূমিকে নিয়ে প্রচুর গান রচনা করেছিলেন, কথা ও কাহিনীর 'দুই বিঘা জমি'তে তেমনই প্রণাম করে বলেছিলেন—

নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।

তেমনি আবার সেই সময়েই লিখছেন

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।

কিংবা ভারতবর্ষের অতি অপূর্ব ভৌগোলিক মাতৃমহিমা—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী॥
নীল-সিন্ধুজল-ধৌতচরণতল অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্রতুষারকিরীটিনী॥

ধ্যানী ভারতবর্ষের রূপ—

ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে।

এই তৃতীয় গানটি সেই ভারতবর্ষেরই স্তুতি যে-ভারতকে কবি তাঁর নিজের দৃষ্টিতে দেখেছেন— শুধু কবির দৃষ্টিতে নয়, ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে। ভারতবর্ষের যে-অধ্যাত্মসাধনা হোমরত তপস্বীর প্রতীকে কবির নানা রচনায় প্রকাশিত, এখানে ভারতের হিমালয়-নদী প্রান্তরের প্রাকৃতিক চিত্রে তাই কাব্যরূপ লাভ করেছে। আবার 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-বহুসংস্কৃতির দ্বন্দ্বমিলনের ইতিহাস রচনা করেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি যে বহুজাতির মিলনমূলক সভ্যতার কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেছেন তার ছবি এঁকেছেন এই কবিতাতেই—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন॥

এই ছবিটিই কবি আবার দিয়েছেন জনগণমন গানটিতেও। শেষ পর্যন্ত জনগণমনই ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত হল। আকস্মিকভাবে নয়, এ গানেরও ইতিহাস আছে।

এ গান রচিত হয় ১৯১১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। রচনার একটি উপলক্ষ ছিল। এই উপলক্ষ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আজ অবশ্য সংশয়াতীত-ভাবে তার অবসান হয়েছে। ১৯১১-র ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় পঞ্চম জর্জের আগমনের তিনদিন আগে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইতিপূর্বে দিল্লিতে ভারত-সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। এজন্য বাঙালি নেতারা স্থির করেন কলকাতার কংগ্রেস-অধিবেশনে সম্রাটকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। সেজন্য উপযুক্ত গানও চাই, গানটি রাজপ্রশস্তিমূলক হওয়া দরকার। সে-সময় রবীন্দ্রনাথের কথাই সবার মনে পড়ল। নেতৃস্থানীয় রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান জনৈক ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে এ-রকম একটি গান রচনা করে দিতে অনুরোধ করেন। তখন, রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতে—

'রাজসরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, এই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমনঅধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতনঅভ্যুদয়বন্ধুরপন্থায় যুগযুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক।'

গানটি সম্রাটের রাজপ্রশস্তি নয় অবশ্যই, তবে রচনার উপলক্ষ ছিল সম্রাটের কলকাতা আগমন। কলকাতা-কংগ্রেসের প্রথম দিনে গাওয়া হল বন্দেমাতরম, দ্বিতীয় দিনে গাওয়া হল জনগণমন এবং একটি হিন্দি রাজপ্রশস্তিমূলক গান 'যুগজীব, মেরা বাদশা চহুঁ দিশ রাজ সবায়া'। এই গানটির রচয়িতা সরলা দেবীর স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী। তৃতীয় দিনে গাওয়া হল সরলা দেবীর 'অতীত গৌরববাহিনি'। রাজস্তুতিমূলক হিন্দি গানটি গাওয়ার দিনে জনগণমন গান গীত হওয়ায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটির সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না বলেই এবং সেই গান অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করবে বলেই গাওয়া হয়েছিল। প্রশস্তির উদ্দেশ্যে ফরমায়েশ দিয়ে রচিত হয়েছিল হিন্দি গানটি। কিন্তু এই জনগণমন গানটিই কয়েকদিন পর মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তাতে পরিচয় হিসাবে লেখা হল 'ব্রহ্মসংগীত'। এর দ্বারা আর কোনো সংশয়ই থাকে না যে জনগণমনের ভারতভাগ্যবিধাতা পরব্রহ্ম ছাড়া কেউ নন, সম্রাট তো ননই, দেশও নয়। এতে জাতীয় সংগীত বলতে আমাদের যা ধারণা, দেশ এর উদ্দিষ্ট নয়, বলাতে এতে সেই ধারণার সমর্থন হয় না।

পরন্তু এই ব্রহ্মসংগীতটিই জাতীয় সংগীতরূপে বন্দেমাতরমের সঙ্গে গণ্য হয়েছিল অন্তত ১৯১৭ সাল থেকে। সেবারকার কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস-অধিবেশনেও এই গান গাওয়া হয় তৃতীয় দিনে। অবশ্য প্রথম দিনের উদ্‌বোধন হয়েছিল বন্দেমাতরম দিয়েই। রবীন্দ্রনাথের জনগণমন গানটি সমকালীন সাময়িক পত্রের বিবরণে 'Magnificent', 'Patriotic song' বলে বর্ণিত হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বক্তৃতায় বললেন— It is a song of the victory of India। তার পর থেকেই এই গান জাতীয় সংগীত বলেই গণ্য হয়ে আসছে। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে এর হিন্দি অনুবাদ জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এর দুটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।

ব্রহ্মসংগীতকে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করায় বাধা হল না কেন? তার কারণ ওই গান বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। ভারতভাগ্যবিধাতা ব্রহ্ম বটে, কিন্তু তিনি যে ভারতের বিধাতা সেই ভারতেরই অধিবাসী আমরা। সেই ভারতের রূপ ফুটেছে এতে। সেই রূপ রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট, যার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা দিয়েছেন নানা জায়গায়। এখানে আছে পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল এবং বঙ্গ অর্থাৎ ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ এই ভারতভূমি যার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদ বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা প্রভৃতি পর্বত এবং নদী। সরলা দেবীর 'অতীত গৌরববাহিনি' গানে এই বিস্তৃত অঞ্চলগুলির উল্লেখ আছে। কবি এই-সব অঞ্চলে ব্যাপ্ত জনসমাজের দিকে তাকিয়ে তাদেরই অন্তরের প্রার্থনাকে ভাষা দিয়েছেন। এই সমাজে আছে হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান এবং খৃস্টান। এই বিস্তৃত ভারতসমাজ যাকে অন্য কবিতায় বলেছেন মহামানবসাগর। তারা পেরিয়ে এসেছে অনেক দুঃখের রাত্রি, অনেক সংকটের মুহূর্ত। তাকে তিনি বলেছেন—

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।

আমাদের এত বৈচিত্র্য, এত স্ববিরোধিতা, এত বিপ্লব থেকে উত্তীর্ণ করিয়ে দিতে যিনি পারেন, তিনি ভারতভাগ্যবিধাতা এবং তিনি ঐক্যবিধায়ক।

সুতরাং জনগণমন গানের মূল মর্মটি হচ্ছে বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য। বিচিত্রকে নিয়েই এক ভারতীয় জাতি। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে একতে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরের যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।'

এই গানটি নিছক গান নয়, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভারতইতিহাস পাঠও আছে। প্রায় ১৯০১ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট ছিল নানা প্রবন্ধে কবিতায় এবং গোরা উপন্যাসে— এই গানটিতে তারই সংহত অভি-ব্যক্তি। সেই অর্থেই জনগণমন ভারতীয় জাতির গান। ভারতীয় জাতির বৈশিষ্ট্য এক ধরনের ধর্মপ্রাণতায়। সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নয়, উদার অর্থে সেই নৈর্ব্যক্তিক দেশানুভবকে কবি এই কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে

আছে 'যতো ধর্মস্ততো জয়'। সেই ধর্মবোধ থেকে রবীন্দ্রনাথও এক পরম নৈর্ব্যক্তিক বিধাতার অনুভব লাভ করেছেন। তিনিই ভারতভাগ্যবিধাতা। দেশানুভবের সঙ্গে ঈশ্বরানুভবকে মেলানো অন্য দেশের জাতীয় সংগীতের তুলনায় অভিনব অবশ্যই। কিন্তু এই অনুভব থাকাতে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কলুষমুক্ত হয়েছে। য়ুরোপে ধর্মহীন দেশচেতনার পরিণাম তো আমরা জানি। 'প্রতিনিধি' কবিতাতে শিবাজীর রাজধর্মের নির্দেশ গুরু রামদাস দিয়েছিলেন—

পালিবে যে রাজধর্ম
জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।

এই আত্মবিমুখ ত্যাগধর্মের উৎস এক ধর্মবোধ। সেই ধর্মকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় সংগীতে নিত্যস্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছেন।

এই ভাবটি মনে রাখলে বঙ্কিমের বন্দেমাতরমের সঙ্গে এর একটা ভিন্নতর দৃষ্টি বোঝা যায়। বঙ্কিম দেশজননীর অভয়মূর্তি রচনা করেছেন 'দ্বিসপ্তকোটিভুজৈ-র্ধৃতখরকরবালে' এবং 'বহুবলধারিণী'র উল্লেখ ক'রে। বন্দেমাতরমে মায়ের শাসক এবং পালকরূপ দুইই আছে। এই প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় লিখেছেন—

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাটনেত্র আগুনবরন।

এই মূর্তি তিনি জনগণমন গানে দেন নি। তাতে এনেছেন শান্তি সহিষ্ণুতা মৈত্রী ও ঐক্য। বঙ্কিমের গানে উদ্দীপনা, অধীরতা, চাঞ্চল্য, এককথায় রজোগুণ। রবীন্দ্রনাথের গানে ভারতভাগ্যবিধাতার ধ্যান ও তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন।

বঙ্কিমোত্তরণ

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেত্রিশ। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চৌত্রিশ। এর মধ্যে কয়েকটি বই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে গণ্য। তাদের কয়েকটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতও জানা যায়। যেমন ১৮৮১-তে প্রকাশিত বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে বঙ্গদর্শন (১২৮৮ আশ্বিন) লিখেছিলেন— 'যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।'[১]

পরের বৎসর প্রকাশিত হল 'সন্ধ্যাসংগীত'। এই বই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কী ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তা উদ্‌ধৃত করি— 'রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য— রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?" তিনি বলিলেন, "না"। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।'[২]

স্মরণীয় এই যে সন্ধ্যাসংগীতের এই প্রশস্তির চার বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক'-এর নিন্দাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় (১২৮৫ ভাদ্র)—

'আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিমবাবুর কবিতাপুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না— জ্ঞানের কথা এ স্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ— সাধারণ, সামান্য অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থান পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না— বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন— কিছুই না— হইবে তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।'[৩]

ভারতীতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাপুস্তকের এই সমালোচনার পর রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসংগীতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বঙ্কিম-চরিত্রের ঔদার্যব্যঞ্জক। সন্ধ্যাসংগীতের পর প্রকাশিত আর-একখানি বই সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত আমাদের জানা আছে। সেটি ১৮৮৩-তে প্রকাশিত 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস। উপন্যাসটি ভারতীতে এক বৎসর যাবৎ ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমপ্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বিবরণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই উপন্যাস সম্পর্কে অভিমত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—

'স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের কথা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে-কথা আমি বলেছি।'

শুধু মুখে বলা নয়, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন। দীর্ঘকাল পর বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে বউ-ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ তার উল্লেখ করেছেন—

'এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি।'

এ-সব মতামতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক সাহিত্যসমালোচনা পাওয়া যায় না। বউ-ঠাকুরানীর হাটের পর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশিষ্ট বই প্রভাতসংগীত (১৮৮৩), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), রাজর্ষি (১৮৮৭), রাজা ও রানী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), মানসী (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (১৮৯৩)— এগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কী ভেবেছেন আমরা জানি না। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠক ছিলেন, এ কথা রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে অনেকবারই বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে এবং 'বাউলের গান' নামে প্রবন্ধে। দুটিই ভারতীতে বেরিয়েছিল। বাউলের গান প্রকাশিত হয় ১২৯০ বৈশাখে অর্থাৎ ১৮৮৩-তে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স বাইশ বছর। এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

'বঙ্কিমবাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার

করিতে পারেন নাই। লেখা ভালো হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্বত্র তিনি তাঁহার নিজের স্বর ভালো করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে, যে, কোনো একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর বা বঙ্কিমবাবুর শেষ বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ তবে সে কথা আমরা কানেই আনি না।'[৪]

এই প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা যেতে পারে। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (প্রথম সংস্করণ ১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) পর্যন্ত উপন্যাস বেরিয়ে গেছে। দেবী চৌধুরানী, সীতারাম তখনও প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের যে বিখ্যাত বিতর্ক ঘটে সত্যের ধারণা নিয়ে তার সূত্রপাত হয় পরের বছর থেকে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন ও তাঁর উপন্যাসের উল্লেখ করেছেন।[৫] বঙ্গদর্শনের প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই বাংলা সাহিত্যের একটি মহৎ ঘটনা বলে মনে করেছেন। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স এগারো বছর।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে চৈতন্য লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত সভায় পঠিত প্রবন্ধে (১৩০১) রবীন্দ্রনাথ তাঁর কিশোরকালে বঙ্গদর্শন প্রকাশের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন—

'আমার কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম। সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।'

এটা তাঁর কৈশোরের স্মৃতি। সেই স্মৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতা। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর থেকেই বাংলা সাহিত্য কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধে ভরে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ চোখের সামনেই দেখেছিলেন। সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি বলছেন—

'বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলাদেশের মেয়ে-পুরুষের মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে; এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পূর্বকালবর্তী ভাবের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। যা আমাদের ভালো লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় আমাদের সেই ভালোলাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর।'[৬]

এরকম প্রশস্তি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে নানা উপলক্ষে করেছেন। তিনি যখন নবপর্যায় বঙ্গদর্শন (১৯০১) সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন, তখনও বঙ্গদর্শনের মতো পত্রিকা সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই সচেতন ছিলেন। অবশ্য সেইসঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, বঙ্কিমের কাল আর রবীন্দ্রনাথের কাল এক নয়। লেখার রীতি-প্রকৃতি যেমন বদলেছে, লেখকদলেরও পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্কিমের সময়ে ক্ষমতাবান লেখকের সংখ্যা কম ছিল, বঙ্কিমকেই লেখক তৈরি করতে হয়েছে। সেজন্য তখনকার বঙ্গদর্শনের বিভিন্ন লেখার মধ্যে সম্পাদকের ছাপ থাকত, দৃষ্টিভঙ্গিতেও ঐক্য ছিল। সে-ঐক্য রবীন্দ্রনাথের সময়ে আশা করা যায় না। এখন বহু লেখকের আবির্ভাব হয়েছে, চিন্তাক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, জাতির ও দেশের সামনে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে যা নিয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করছেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই বলতেন যে বঙ্গদর্শনের সাহায্যেই আধুনিক চিন্তাধারা বাঙালি জীবনে এসেছে। পশ্চিমী বহু চিন্তা তত্ত্ব এবং মূল্যবোধকে বঙ্গদর্শনই ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বাঙালি সমাজকে নতুনভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে লেখা 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমের ভাবগত মিলনের উপর জোর দিয়ে দেখিয়েছিলেন এ মিলনের যজ্ঞে সমিধ আহরণ করে এনেছিলেন রামমোহন, রানাডে, বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র। সেই সূত্রে তিনি বলছেন—

'একদিন— বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন— সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আহ্বান হইল, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধি লাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই-সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলন-তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।'

প্রসঙ্গত আর-একটি কথা মনে পড়ে। বঙ্গদর্শন প্রকাশের কিছুদিন পরেই

প্রকাশিত হয়েছিল ভারতী (১৮৭৭)। ভারতীর সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকাটি মূলত ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে সেই বাড়ি থেকেই বেরিয়েছিল, লেখকরাও ছিলেন ঠাকুরবাড়ির অথবা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখকরা এর লেখক ছিলেন।[৭] রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের বহু লেখা ভারতীতে প্রকাশিত হয়।[৮] বস্তুত বয়সে তরুণ হলেও রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। বঙ্গদর্শন বঙ্কিমের সম্পাদনায় মাত্র চার বছর চলেছিল, কিন্তু ভারতী চলেছিল প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল। পরবর্তী সমালোচকেরা কেউ কেউ ভারতীকে বঙ্গদর্শনের প্রতিযোগী কল্পনা করেছেন। একটি পত্রিকা বঙ্গকেন্দ্রিক, আর একটি ভারতকেন্দ্রিক যদিও বাগ্‌দেবী অর্থেই ভারতী পত্রিকার নাম তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীর প্রচ্ছদেও বীণাপাণিই অঙ্কিত ছিলেন। তথাপি দু ধরনের নামে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাহিত্যাদর্শ প্রতিফলিত বলে কেউ ধরে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এমন নিবিড়ভাবে ভারতীর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তুলনাত্মক ভঙ্গিতে কখনো ভারতীর কথা বলেন নি— বাঙালি জীবনে বঙ্গদর্শনের গুরুত্বই অকুণ্ঠচিত্তে বর্ণনা করেছেন। এ-সব প্রসঙ্গে বরং তিনি ভারতীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। ভারতী খুব উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গদর্শনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের যোগ ছিল আরও প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী।

বঙ্গদর্শনের মধ্যে দিয়েই বঙ্কিমের উপন্যাসশিল্পের বিবর্তন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গদর্শনের আগে ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমের উপন্যাসে একটা বড়ো চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। আগের উপন্যাস ছিল রোমান্স-জাতীয়, পরের উপন্যাস অভিজ্ঞতাজাত 'আখ্যান'। এ বিষয়ে তাঁর মত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক রকমই ছিল। ১৮৮৩-তে লেখা 'বাউলের গান' প্রবন্ধে পাওয়া তাঁর মন্তব্য উদ্‌ধৃত করেছি। ১৯৩১-এ লেখা প্রবন্ধেও তিনি একই কথা বলেছেন—

'বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ।

'বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অবলম্বন পায় নি— তাদের সাজসজ্জা আছে, কিন্তু পরিচয়পত্র নেই। তারা ইতিহাসের ভাঙা ভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেছে। তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা তারা

বর্তমানের সামগ্রী নয়, তারা যে-অতীতে বিরাজ করে সে-অতীতকে ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল-জবাব করা চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শেও নয়। সেখানে বিমলা আয়েষা জগৎসিংহ কপালকুণ্ডলা নবকুমার প্রমুখেরা যা-খুশি তাই করতে পারে, কেবল তাদের এইটুকু বাঁচায়ে চলতে হয় যে পাঠকদের মনোরঞ্জনের ক্রটি না ঘটে।'

বঙ্গদর্শনে যুগের উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—

'বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আাখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এলো তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দা উঠে গেল— ক্ল্যাসিকাল অস্পষ্টতা বা রোম্যান্টিক অস্পষ্টতা অর্থাৎ ধ্রুপদী বা খেয়ালী দূরত্ব, সীতার বনবাসের ছাঁদ বা রাজপুত কাহিনীর ছাঁদ। মনে পড়ে আমার অল্প বয়সের কথা। তখন চোখে কম দেখতুম অথচ জানতুম না যে কম দেখি। ঐ কম দেখাটাকেই স্বাভাবিক বলে জানতুম, কোনো নালিশ ছিল না। এমন সময়ে হঠাৎ চশমা পরে জগৎটা যখন স্পষ্টতর হল তখন ভারি আনন্দ পেলুম। বিজয়বসন্তে-ও একদিন বাঙালি পাঠক সন্তুষ্ট ছিল, তখন সে জানত না গল্পে এর চেয়ে স্পষ্টতর জগৎ আছে। তার পরে দুর্গেশনন্দিনীতে চমক লাগল এটা তার কাছে অভূতপূর্ব দান। কিন্তু তখনও ঠিক চশমাটি সে পায় নি, তবু দুঃখ ছিল না, কেননা জানত না যে সে পায় নি। এমন সময়েই বিষবৃক্ষ দেখা দিল, কৃষ্ণকান্তের সেই জাতেরই, সে যেন আরো স্পষ্ট।'[৯]

এর পরের যুগকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রচারক বঙ্কিমের যুগ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আবার এল 'অস্পষ্টতা'। অর্থাৎ তিনি বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, ইন্দিরা প্রভৃতি সমকালীন বাস্তবতা নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিকে সাহিত্যের স্পষ্ট অভিজ্ঞতাজাত অকৃত্রিম সৃষ্টি বলতে চান। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি তাঁর মতে অভিজ্ঞতালব্ধ নয় বলে সত্য বস্তু নয়। এ রকম অভিমত তিনি দিয়েছেন তাঁর নিজের ছোটোগল্প লেখার ইতিহাস বলতে গিয়ে। তিনি মনে করতেন, তিনিই প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে গল্প লিখেছেন। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি ছিল রোমান্স যা নতুন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির নতুন পিপাসা মিটিয়েছিল। তখনকার সমাজ ছিল dull। এই ধরনের রোমান্সেই তারা সন্তুষ্ট থাকত। 'বিদেশ থেকে আমদানি এসব রাজার লড়াই ইত্যাদি আমাদের গরিবের মনে একটা উন্মাদনা এনে দিয়েছিল।'[১০]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিরুৎসাহ ছিল সেটা

বঙ্কিমের জীবিতকালেই তিনি প্রকারান্তরে জানিয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠিতে ১৮৮৮ সালে—

'আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না— সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে— এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন।··· কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না।'[১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি করেন নি কিন্তু ইতিহাস এবং উপদেশ দুই-ই বঙ্কিমের উপন্যাসে সুলভ। বঙ্কিমের শেষের দিকের উপন্যাস প্রচারধর্মী বলে রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'অস্পষ্ট'। আনন্দমঠ উপন্যাস সম্বন্ধে বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন 'তাঁহার নগেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকান্ত, ভ্রমর, গোবিন্দলাল— সজীব, স্বতন্ত্র মানুষ; কিন্তু আনন্দমঠে সমস্ত 'আনন্দ'গুলিই যেন একরকমেরই।'[১২] শুধু প্রচারধর্মিতা নয়. সীতারাম দেবীচৌধুরাণী আনন্দমঠ রাজসিংহ— সবই ইতিহাসসম্পৃক্ত। এ-সব উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনা আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের বহির্ভূত অভিজ্ঞতা। 'অসাধারণ হৃদয়াবেগ' দেখাবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। জীবনস্মৃতির 'ভগ্নহৃদয়'-অধ্যায় থেকে বোঝা যায় তিনি সেকালের সাহিত্যের 'হৃদয়াবেগের প্রবণতা'টা পছন্দ করতেন না। ইংরাজি সাহিত্যের মাদকতা সেকালের বাঙালি লেখকদের প্রমত্ত করে তুলেছিল। একে আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন নি।

দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথমাবধি একটা দ্বিধা ছিল। বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল সম্পর্কে আপত্তি ছিল না মনে হয়, তথাপি হৃদয়াবেগের প্রবলতা থেকে তারাই কি একেবারে মুক্ত ছিল? এদের মধ্যেও রোমান্স ছিল। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, দেবেন্দ্রের স্ত্রীবেশে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ, সূর্যমুখীকে হারিয়ে নগেন্দ্রের প্রবল অন্তর্দাহ, বারুণী থেকে রোহিণীকে উদ্ধার, কৃষ্ণকান্তের ঘরে গিয়ে রোহিণীর উইলচুরি, রোহিণীর অপমৃত্যু— এগুলি বাঙালির সংসারে স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকলার বিশেষত্ব প্রবল আবেগের অসাধারণ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দেখানো। এই-সব অসাধারণ ঘটনা বস্তুত হৃদয়াবেগেরই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর ঘটনা যেমন পছন্দ করতেন না, তেমনি প্রবল হৃদয়াবেগ যা মেলোড্রামার সৃষ্টি করে তাও পছন্দ করতেন না।[১৩] সেই জন্য আনা কারেনিনার মতো বই তাঁর ভালো লাগেনি।[১৪] বঙ্কিমের সামাজিক

উপন্যাসের মেলোড্রামার অংশটুকু তাঁর ভালো লাগত কিনা সন্দেহ। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ওই চিঠির ইঙ্গিত অনুসরণ করে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির সঙ্গে বঙ্কিমী উপন্যাসের তুলনা করলে তাই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসেও এ ধরনের চমকপ্রদ ঘটনা কমে এসেছে।

গল্পগুচ্ছের গল্পরচনা শুরু করার আগে[১৫] রবীন্দ্রনাথ যে-দুখানি উপন্যাস লিখেছিলেন, বউ-ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩) এবং রাজর্ষি (১৮৮৭)—সে দুটি বঙ্কিমী যুগের মধ্যাহ্নকালের রচনা। তখন বঙ্কিমের প্রভাবকে এড়িয়ে যাওয়া শক্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীও বঙ্কিমের আদর্শে উপন্যাস লিখতেন। রমেশচন্দ্র দত্ত দুখানি সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু তাঁর মহৎ উপন্যাসগুলি বঙ্কিমের আদর্শে রচিত। এ সময় রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত রচনা উপলক্ষে বঙ্কিমের সংবর্ধনা লাভ করেছেন। তিনি তখন যে উপন্যাস লিখলেন, তাতে যে বঙ্কিমী রীতির অনুসরণ থাকবে তাতে সন্দেহ কী? ভারতীতে বউঠাকুরানীর হাট বের হতে থাকে সন্ধ্যাসংগীতের সমকালে। এবং এ-সময়ে বঙ্কিমের দুটি উপন্যাস রাজসিংহ এবং আনন্দমঠ।

বউ-ঠাকুরানীর হাটের সঙ্গে রাজসিংহ বা আনন্দমঠের মিল নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকেই পটভূমি করেছেন এটি লক্ষ্য করবার। রাজসিংহ ও আনন্দমঠ দুটি উপন্যাসেরই পট প্রসারিত তৎকালীন দেশ এবং জাতিকে নিয়ে, বউ-ঠাকুরানীর হাট ইতিহাসাশ্রিত হলেও পরিবারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।[১৬] রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে বঙ্কিমের আদর্শকে তেমন অনুসরণ করেছেন মনে হয় না। বঙ্কিমের উপন্যাস নায়ককেন্দ্রিক। নায়কের দুঃখবেদনা উদ্যমকে কেন্দ্র করে প্লট হয় ঘনবদ্ধ ও বাহুল্যবর্জিত। এই উপন্যাস অনেকটা নাটকীয় আদর্শে গঠিত। সেজন্য চরিত্রগুলির মনের ছবি আঁকায় লেখকের ততটা মনোযোগ নেই। লেখকের প্রধান লক্ষ্য ঘটনার বাঁধুনিতে। ঘটনাধারাতেই চরিত্র স্বতঃপ্রকাশিত। বউ-ঠাকুরানীর হাটে প্লটের বন্ধন অতিকথনের জন্য শিথিল, ছড়ানো। বঙ্কিমের উপন্যাসে মুখ্য ও গৌণ প্লট প্রসারের সঙ্গে নিপুণভাবে বদ্ধ থাকে। দুই প্লটের দুই চরিত্র বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে।

প্রতিভার দক্ষতার কথা ছেড়ে দিলেও বঙ্কিমের উপন্যাসের মোটা কাঠামোটার অনুকরণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা করতে যান নি। এই উপন্যাসে একটি কোনো মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী দানা বাঁধে নি। সুরমা উদয়াদিত্য বসন্ত রায় সকলের চরিত্রই সমান নিস্তরঙ্গ। সুরমা ও উদয়াদিত্যের

যে পরিণতি উপসংহারে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, তা একটি গার্হস্থ্য সংসারের করুণতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর কোনো বৃহত্তর ট্র্যাজিক মহিমা নেই, যে-মহিমাকে আমরা অনুভব করি বঙ্কিমের উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরবর্তীকালে বলেছিলেন এর চরিত্রগুলি পুতুলের ধর্মকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তবু 'এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি। সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়ে নি তাতে। কিন্তু আর্টের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেয়াল যা-তা কাণ্ড করতে বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।' রবীন্দ্রনাথের এই কথাটির একটি মূল্য আছে। বউ-ঠাকুরানীর হাটে বঙ্কিমের অনুকরণ যতটুকু আছে, তার থেকে বেশি আছে লেখকের তরুণ মনের আত্মবিকাশের প্রয়াস। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম নয়। উপন্যাসে উদাত্ত সুর তিনি যোগ করতে পারেন নি, কিন্তু তিনি পেরেছিলেন লিরিক সুরটি বাজিয়ে তুলতে। বউ-ঠাকুরানীর হাটে ভাবাবেগ বা প্যাসনের নাট্যলীলা নেই কিন্তু সংবেদনা বা সেন্টিমেন্টের বর্ণনায় গীতিসুর বেজেছে। এতে যতখানি ঘটনা, ততখানি বা তার চেয়ে বেশি উদয়াদিত্য ও সুরমার হৃদয়লীলার বিশ্লেষণ। বসন্ত রায়ের মতো ভাবভোলা স্নেহপ্রবণ কোমল চরিত্র অন্তত বঙ্কিমী আদর্শের উপন্যাসে স্বাভাবিক নয়। বরং প্রতাপাদিত্যের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে না উঠলেও তার চরিত্রের মধ্যে যে-অনমনীয়তা আছে তা শেক্সপীয়রীয় নাট্যাদর্শের ভিলেনের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এই উপন্যাসের দীর্ঘ বর্ণনা, বিস্তৃত হৃদয় বিশ্লেষণ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী রীতিকে অস্বীকার করে নিজের পথটি খুঁজে নিতে চেয়েছেন। চরিত্রগুলি অবশ্যই টাইপ, তাদের মধ্যে ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই। ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আছে সতেরো বছর পরে লেখা 'চোখের বালি' উপন্যাসে। চোখের বালিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাস বলা হলেও তার সূচনা যে বউ-ঠাকুরানীর হাটে অপটু হাতে শুরু হয়েছিল, একটু লক্ষ্য করলেই সেটা বোঝা যায়।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন, 'উদয়াদিত্যের প্রতি লেখকের সহানুভূতির কারণ ছিল; লেখক সম্বন্ধেও তাঁহার পিতা ভ্রাতা আত্মীয়বন্ধুর দল অনুরূপ আশা পোষণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে সংসারের মধ্যে কাজে-কর্মে জ্ঞানে-ধর্মে কোনোদিন বড়ো হইবেন এ আশা ত্যাগ করিয়া সকলে তাহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরাজিত হইয়া উদয়াদিত্য যেন পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতের কবির মধ্যে এই

বিষাদঘন ছায়া। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যেও এইরূপ দুঃখবাদ প্রবল।' এভাবে উপন্যাসের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত করা রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মভাবপ্রধান লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। পরবর্তী বহু উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো চিন্তা ও হৃদয়ানুভূতিকে চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। নষ্টনীড়ে, গোরায়, ঘরে-বাইরেতে চার অধ্যায়ে এরকম দেখা যায়। আত্মভাব প্রাধান্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে বিশিষ্ট ভাবমণ্ডল দেখা যায়, বউ-ঠাকুরানীর হাটেই তার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁকে উপন্যাসের একটা ভিন্নতর পথ খুঁজতে প্রণোদিত করেছিল।

রাজর্ষি উপন্যাসটিও ঐতিহাসিক কিন্তু এতেও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে চেয়েছেন। এর কাহিনী তিনি নিয়েছিলেন ত্রিপুরার রাজমালা বই থেকে। এতে তাতা নামে শিশুটিকে ঘিরে যে ঘটনাধারা গড়ে উঠেছে, তার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের। এই বক্তব্যই উপন্যাসের প্রধান বক্তব্য। গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্র রায়কে নিয়ে উপন্যাসের যেটা ইতিহাস-অংশ সেটা ষোড়শ পরিচ্ছেদ থেকে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও গোবিন্দ-মাণিক্যের রাজর্ষি-রূপটি অক্ষুণ্ণ— এ রূপটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা। রাজর্ষিতে রবীন্দ্র-নাথের নৈপুণ্য বউ-ঠাকুরানীর হাটের চেয়ে অধিকতর, চরিত্রগুলিও যথাসম্ভব জীবন্ত, ঘটনাধারাতেও স্বাভাবিক অনিবার্যতা আছে। রাজর্ষি প্রকাশের প্রাক্‌কালে বেরিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম এবং রাজসিংহ।

রাজসিংহ খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এর মূল চরিত্র রাজসিংহ ঐতিহাসিক তো বটেই, তার রাজকীয় ব্যক্তিত্বটি প্রকাশিত হয়েছে যে-সব ঘটনার মধ্য দিয়ে সে-সব ঘটনা স্বভাবতই পাঠককে একটি দূর অতীতের জীবন্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে নিয়ে যায়। রাজসিংহের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র রাজার যে-রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি স্বদেশরক্ষা, প্রজার প্রতি কর্তব্য, শরণাগতকে আশ্রয়দান প্রভৃতি বীরত্বব্যঞ্জক গুণে বিভূষিত। রাজসিংহ যে তেমন জীবন্ত চরিত্র হতে পেরেছে তা নয়। তার হৃদয়-মধ্যে তেমন কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। তবু যে-সব চরিত্রবৈশিষ্ট্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সাজিয়েছেন সে-সব রাজারই গুণ।

রাজসিংহ মহাপুরুষ নয়, তাই তার চরিত্রে সাধারণ মানবসুলভ দুর্বলতা আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সব মিলিয়ে রচনা করেছেন তার রাজকীয় ব্যক্তিত্ব। সীতারাম উপন্যাসেও সীতারাম শরণাগতকে রক্ষা করে, প্রজাদের নেতৃত্ব দিয়ে, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তার রাজসিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সেও কোনো

মহাপুরুষ নয়, কিন্তু শক্তিশালী রাজা। অবশ্য সীতারাম ইন্দ্রিয়পরতার বশবর্তী হয়ে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে নিয়ে এসেছে। তার শক্তির প্রচণ্ডতা তাকে বিপথে চালিত করেছিল। তার শক্তিও প্রবল, তাই তার পতনও প্রবল।

রাজর্ষির গোবিন্দমাণিক্য আদর্শবান মহাপুরুষ। তার চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ রাজার যে আদর্শ দেখিয়েছেন; সীতারাম বা রাজসিংহের সঙ্গে তার মিল নেই। গোবিন্দমাণিক্য বলেছে 'রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়' —এ ধরনের প্রাজ্ঞোক্তি বঙ্কিমের রাজার কল্পনাতে আসতে পারত না। অথচ রবীন্দ্রনাথের রাজা কল্পনা বঙ্কিমের রাজা কল্পনার ঠিক পরেই, প্রায় প্রতিক্রিয়াই বলা যায়। রাজর্ষিতে রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, বাৎসল্যরসকে বলা যায় এর অঙ্গীরস ; সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠার চেয়ে আদর্শনিষ্ঠাই বড়ো। এ যেন রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভারই রূপ। তার ভাষায়, তার হৃদয় বিশ্লেষণে, তার প্রকৃতি বর্ণনায় এমন-কি, প্রতীক ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথ থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী অংশ জটিলতাহীন ও সরল। এই অংশের ইতিহাস পরিমণ্ডলের কোনো গুরুত্ব নেই। গুরুত্ব এসেছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের পরে যখন নির্বাসিত রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নক্ষত্র রায়কে গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসনে বসাতে উদ্যোগী হয়েছে। এই অংশে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পদ্ধতি অনেকটা অনুসৃত। সীতারাম ও রাজর্ষির তুলনা-প্রসঙ্গে আর-একটি তুলনার কথাও মনে পড়ছে। রাজর্ষির কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বিসর্জন' (১৮৯০)। সে-নাটকে রাজার চরিত্র কিছু আলাদা নয়। এতে বরং একটি নতুন চরিত্র আনা হয়েছে— অপর্ণা। অপর্ণা চরিত্রটি প্রায় একটি প্রতীক চরিত্র, প্রেম করুণার প্রতিমূর্তি। পশুবলি ও হিংসার ক্লিন্ন পরিবেশের মধ্যে অপর্ণা দেখা দিয়েছে করুণাময়ীরূপে। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলাও ছিল এমনই করুণাময়ী যে নিজের জীবন দিয়ে অন্তর্দাহে দগ্ধ নবকুমারকে শান্ত করতে চেয়েছিল। নারীত্বের সঙ্গে করুণার এই নিবিড় যোগটি বঙ্কিম যে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেই দেখিয়েছেন তা নয়, তাঁর অন্যান্য রচনাতেও নারীচরিত্রের এই দিকটি ফুটেছে। সৃষ্টির দিক দিয়ে তুলনা করে দেখলে কপালকুণ্ডলা এবং অপর্ণার মধ্যে পার্থক্য আছে— কপালকুণ্ডলা নানা ঘটনার নায়িকা, অপর্ণা নায়িকা নয় এমন-কি, চরিত্রও নয়। অপর্ণা বিসর্জন নাটকে কবিকল্পিত সমস্যার সমাধানের সংকেত, একটি আইডিয়া।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসকে রোমান্স বললেও কপালকুণ্ডলার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর এর আগেই পড়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্যোপন্যাস বনফুলের (১৮৮০) কমলা চরিত্রে কপালকুণ্ডলার ছায়া স্পষ্ট।[১৭] বহিরঙ্গ অনুসরণের কথা ছেড়ে দিলেও নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমান। কমলাকান্ত বলেছিল, 'মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে?' পঞ্চভূতের 'নরনারী' লেখাটিতে বাঙালি নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন আছে। সেই প্রসঙ্গেই বঙ্কিমের উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, ভ্রমর, রোহিণী, কপালকুণ্ডলা চরিত্রগুলির সজীবতা পুরুষ চরিত্রগুলির তুলনায় কত বেশি, সে-কথা বলেছেন। সেইসঙ্গে দেখিয়েছেন আর-এক শ্রেণীর নারীচরিত্র সেগুলি প্রচণ্ড ক্রিয়াশীলা যেমন দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা, আনন্দমঠের শান্তি, দেবীচৌধুরানী।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে পরবর্তীকালেও।[১৮] তথাপি শিল্পরচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রবণতা ছিল। রাজার কল্পনায় দুজনের কল্পনার বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছি। আর একটি সূত্র আছে সীতারাম উপন্যাসে এবং রাজা ও রানী নাটকে প্রেমের দ্বন্দ্বে। রাজা ও রানী নাটক (১৮৮৯) রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত। সীতারাম উপন্যাসে সীতারাম ও শ্রীর মধ্যে মিলনে বাধা ছিল দৈবজ্ঞের এই বাণী— শ্রী প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হবে। এখানে দেখি সীতারাম বা শ্রী একের অন্যের প্রতি ভালোবাসায় খাদ নেই। তবু মিলন হতে পারছে না তৃতীয় একটি বাধায়। রাজা ও রানী নাটকে বিক্রমদেবকে ছেড়ে চলে গেল সুমিত্রা। সেখানে বাধাটা কী? সুমিত্রা তার স্বামীকে যেভাবে কল্পনা করতে চেয়েছে বিক্রমদেব তা নয়— এই বাধা। এ বাধা বাইরের নয়, আদর্শের। সুমিত্রা বিক্রমের মধ্যে আদর্শ স্বামীকে পেতে গিয়ে বাস্তব বিক্রমের প্রাচীরে বাধাগ্রস্ত হয়ে ফিরে এসেছে। তাদের ট্র্যাজেডি ভাবের ট্র্যাজেডি, প্রেমের ট্র্যাজেডি নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একেবারে প্রথম দিকের লেখা মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনায় ট্র্যাজেডির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে—

'সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না। যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা

আর ট্র্যাজেডি কী আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে— কুন্দনন্দিনী তো ট্র্যাজেডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল— মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল— আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম— বাকীটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম— ইহাই ট্র্যাজেডি।'[১৯]

তরুণ রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডির তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিলেন তা যেমন অভিনব তেমনি সুন্দর। এই ব্যাখ্যার আলোকে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের উপসংহারটিকেও নতুন ভাবে দেখা যায়। শৈবলিনীকে ঘরে ফিরিয়ে নিলেও চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর দাম্পত্যজীবনে প্রতাপের স্মৃতি চিরকালের বেদনা রচনা করল।[২০] বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগান্তক উপন্যাসগুলিতে ট্র্যাজেডির ধাপটি মৃত্যু এবং অপচয়ের শূন্যতা দিয়ে রচিত। রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডিকে ভাবময় উপলব্ধির স্তরে নিয়ে গিয়েছেন— এর সূক্ষ্মতা অবশ্যস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথ সেকালের কবিতা এবং উপন্যাসে যে ভাবগত সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর সেকালের সাহিত্য সমালোচনাতেও তার নিদর্শন ছিল। এখানেও দেখি, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সাহিত্যভাবনা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। স্পষ্টভাবে বঙ্কিমের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর লেখা বঙ্কিমের লেখার প্রতিক্রিয়া বলেই মনে হয়। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতিকাব্য' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন (বৈশাখ, ১২৮০), কবিতার লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত তিনি বলেছিলেন 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' উদাহরণ দিয়েছেন ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী এবং নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাস বললে স্বভাবতই যদি ব্যক্তিগত ভাবের উদ্‌বেল আত্মপ্রকাশকেই বোঝায় তবে তার সংজ্ঞা হয় ব্যাপক। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা— যে-কোনো ভাবের অসংযত পরিস্ফুটতা গীতিকাব্য হবে। বঙ্কিমের এই প্রবন্ধ লেখার নয় বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে লেখেন 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (বৈশাখ ১২৮৮)। এই প্রবন্ধে তিনি কবিতার একটা আলাদা লক্ষণের উপর জোর দেন— বস্তুরূপের নয়, ভাবরূপের প্রকাশই কবিতা। আর-একটি প্রবন্ধ 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭)[২১]-তে কবিতাসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ কল্পনাশক্তির প্রয়োজনের কথা ব'লে বলেন—

'সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কী একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনা সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে মাঝ পথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে।' ওই দুটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ কবিতার একটা আলাদা লক্ষণের কথা বললেন, সেটি ভাবোচ্ছ্বাস নয়, কল্পনাশক্তি। তিনি নির্দেশ করলেন কবিতা কল্পনাময় অশরীরী সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাকে কখনো বলেন নি অশরীরী বা অতীন্দ্রিয়। পরন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'ভাবগত কবিতা আর কিছুই নয়, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।' গীতিকবিতার যে-লক্ষণের তিনি বর্ণনা দিলেন প্রাচীন কালে তার দৃষ্টান্ত ছিল বৈষ্ণব পদাবলী। পদাবলী নিয়ে এ সময় রবীন্দ্রনাথ সানুরাগ আলোচনা করছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় বঙ্কিম যাদের উল্লেখ করে-ছিলেন গীতিকবি বলে রবীন্দ্রনাথ তাদের কোনো উল্লেখের আভাসও দেন নি কোথাও। বরং একটি লেখকনামহীন লেখায়[২২] নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর একটি কবিতাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন। সেইসঙ্গে বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী কাব্য থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন— 'একপ্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই। অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা বাঙ্গালা কবিতায় প্রকাশ হয় না।' এই ভাষা রবীন্দ্রনাথের 'সংগীত ও কবিতা' 'বস্তুগত কবিতা ও ভাবগত কবিতা'র ভাষার সঙ্গে মেলে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে বিহারীলালের উল্লেখ করেন নি।

গীতিকবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এ-সব মতামত ভারতী পত্রিকাতে বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর তখনকার কবিতা ছিল ভাবাশ্রিত। 'শৈশব সংগীত'-এর কবিতাগুলি সে সময়ের লেখা। ইতিপূর্বে 'বনফুল' প্রকাশিত হয়েছিল জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায়। বনফুলের আগে রবীন্দ্রনাথের যে-কয়টি কবিতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে অভিলাষ (তত্ত্ববোধিনী ১৮৭৪), হোক ভারতের জয় (বান্ধব ১ম বর্ষ মাঘ), হিন্দুমেলায় উপহার (অমৃতবাজার পত্রিকায় স্বনামে প্রকাশিত প্রথম কবিতা ১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি) এবং প্রকৃতির খেদ (তত্ত্ববোধিনী ১৮৭৫)— এ-সবই রবীন্দ্রনাথ-নির্দিষ্ট বস্তুগত কবিতার দৃষ্টান্ত। এদের বিষয় নরনারীর প্রণয় নয়, হেমচন্দ্রোচিত দেশপ্রেম। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চোদ্দ থেকে সতেরোর মধ্যে। সম্ভবত তখনও তিনি নিজের কাব্যচিন্তা ও

কাব্যরূপ খুঁজে পান নি। তখনও তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি হেমচন্দ্রকেই অনুসরণ করছেন। কিন্তু এর মধ্যেও পারিবারিক প্রভাবেই হয়তো 'অভিলাষ' কবিতার 'ফলশ্রুতি' কিছু অন্য রকম। প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেন, এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালির বাহুবল (১২৮১ শ্রাবণ) প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায়। তাঁর মতে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালিকে ধর্মের প্রবর্তনায় বাহুবলে উজ্জীবিত হতে বলেন নি, বলেছেন জাতীয় সুখলাভের উদ্দেশ্যে। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ঠাকুর বাড়িতে ধর্মবোধ অতি প্রবল। দ্বিজেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু এবং তাঁদের পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ধর্মপ্রভাবাচ্ছন্ন। বালক রবীন্দ্রনাথও 'অভিলাষ' কবিতাতে বলতে চেয়েছিলেন নিছক ঐহিক কারণে নয়, ধর্মের অভিলাষেই উজ্জীবন বাঞ্ছনীয়।

প্রবোধচন্দ্রের অনুমান সত্য কিনা জানি না, তবে পারিবারিক প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও সাহিত্যসাধনায় ছিল, এটা অস্বীকার করা যায় না। ১৮৮৪-তে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন ধর্মের প্রতি আগ্রহের জন্যই। যে নীতিধর্মের মাহাত্ম্য রক্ষা করার জন্য অভিলাষ লিখেছিলেন, সেই নীতিধর্মের প্রতি কর্তব্যবশত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মসীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ১৮৮৪ সালে। এই বিতর্ক সাহিত্যের আদর্শ বা তত্ত্ব নিয়ে নয়, এই বিতর্ক সত্য ও ধর্মের সংজ্ঞা নিয়ে। বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিককালে অনেকেই আলোচনা করেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'একটি পুরাতন কথা প্রবন্ধটি লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে লেখনীবন্দ্ব হয়, লোকে তাহা বিস্মৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সাময়িক সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে এখনও তাহাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দুই মহৎ ব্যক্তি— একজন সাহিত্যসাম্রাজ্যের পীঠস্থানে অধিরূঢ় প্রবীণ লেখক, অপরজন সাহিত্যক্ষেত্রের দ্বারে উপনীত নবীন লেখক— ইঁহাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল, তাহা বর্তমান যুগের বাঙালি পাঠকের নিকট কৌতুকপ্রদ লাগিবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র তখন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। এই সূত্রে তিনি প্রচার পত্রিকায় (শ্রাবণ ১২৯১) 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাতে ধর্মকে বলেছিলেন লোককল্যাণমূলক। লোককল্যাণের জন্য কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক মিথ্যা বললেও সেটা দোষ নয়। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেন কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না। 'শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের উত্তরে লেখেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং নব হিন্দু সম্প্রদায়'

(প্রচার, অগ্রহায়ণ ১২৯১)। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। ফলে বিতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই দৃষ্টিভঙ্গির।[২৩] রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমের বক্তব্যকে কিছু ভুল বুঝেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিম তাঁর ব্যাখ্যাত ধর্মকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে লোককল্যাণের উপযোগী ও ব্যবহার্য করে গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণেই ছিল তার ভিত্তি। এ রকম চিন্তায় বলাধান করেছিল কোমতের পজিটিভিজম এবং মিল-এর হিতবাদ। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সত্যকে প্রয়োজন নিরপেক্ষ সর্বকালীন বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এ সত্য আধ্যাত্মিক। বঙ্কিমের প্রবন্ধের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'একটি পুরাতন কথা' (অগ্রহায়ণ, ১২৯১) নামে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে প্রসঙ্গত বলেছেন—

'সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই, কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত তাহা হইলে বিষম গোলযোগ বাধিত। বুদ্ধিবিচারগত আদর্শের উপর সমাজপ্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজপ্রতিষ্ঠা করা হয়।'

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে সত্যকে নির্ণয় করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মত : সত্য বুদ্ধি ও বিচারের বিষয় নয়, সত্য ধ্রুব, সত্য উপলব্ধিগম্য। বোঝাই যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ যে সত্যের কথা বলেছেন সে-সত্য আধ্যাত্মিক। এ রকম সত্যের সামাজিক মান কীভাবে সম্ভব ? সমাজকে তো খণ্ডসত্য নিয়েই চলতে হয়, খণ্ডসত্যগুলিকে কীভাবে মানবকল্যাণে সমগ্রভাবে উপযোগী করে তোলা যায় সেটা বিচারণীয় বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'একটি পুরাতন কথা'র উত্তরে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নবহিন্দুসম্প্রদায়' লিখলেন। রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছিলেন 'কৈফিয়ত' (ভারতী, ১২৯১ পৌষ)। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধের আর উত্তর দেন নি। জীবনস্মৃতিতে এই বিতর্ক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি লিখেছিলেন এখানে অবশ্যই তা উদ্ধৃতিযোগ্য—

'এই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার ভারতী ও প্রচারে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে ; তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষমা যে কত সত্য ও সুন্দর পরবর্তী দুটি ঘটনাই তার প্রমাণ। ১৮৯২তে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন সাধনা পত্রিকায়। এই প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখে জানান যে তিনি সেই প্রবন্ধ দুবার পড়েছেন এবং 'প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।' তিনি আরও জানান বিষয়টি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র বহুকাল পূর্বে বঙ্গদর্শন পত্রিকার পত্রসূচনায় যে কথাগুলি বলতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের বক্তব্য তারই বিস্তৃত নানা উদাহরণসমন্বিত সমর্থন। জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবদ্ধ মনোভাব গড়ে তুলবার উপায় মাতৃভাষা দ্বারা শিক্ষা— এ কথাই রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেছেন. বঙ্কিমচন্দ্রও বঙ্গদর্শনকে সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করেছিলেন। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁর এই মতে অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর আগে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শেষ সভাতে রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন তাঁর প্রবন্ধ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী'। সভাপতিত্ব করার আগে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি শুনতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে সেই স্মৃতিচারণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তার পরে সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৯৪, এপ্রিল) রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম সম্বন্ধে তিনটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা (১৮৯৫), রাজসিংহ সমালোচনা (১৮৯৪) এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ (১৮৯৪)। প্রবন্ধ তিনটি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয় সাধনায়। রাজসিংহ এবং কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণের সময় রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ লেখক রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠিয়েছিলেন।[২৪] বঙ্কিমের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ লেখেন সেটি মূলত বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের দানের বর্ণনা। এতে বঙ্কিম-সাহিত্যের গুণগত বিচার নেই। তবে এই তিনটি প্রবন্ধ মিলিয়ে বঙ্কিমকে মোটামুটি সমগ্রভাবে পাওয়া যায়। একটিতে সমালোচক কর্মযোগী বঙ্কিম, একটিতে ভাবুক চিন্তাশীল বঙ্কিম, আর-একটিতে উপন্যাস-রচয়িতা বঙ্কিম। কর্মযোগী বঙ্কিম বর্ণিত হয়েছেন যে প্রবন্ধে তাতে রসস্রষ্টা হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের কোনো কথা নেই, তেমনি নেই বাংলা চিন্তাজগতে তাঁর দানের বিবেচনা। কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধে বঙ্কিমের স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রশংসা করেছেন—

'আমাদের বঙ্গসমাজের এইরূপ উল্টারথের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচিত হয়। যখন বড়ো ছোটো অনেকে মিলিয়া জনতার স্বরে স্বর মিলাইয়া গোলে হরিবোল দিতেছিলেন তখন প্রতিভার কণ্ঠে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গোলে হরিবোল নহে। ইহাতে সর্বসাধারণের সমর্থন নাই, সর্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে।'

তবে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছেন এই বলে যে বঙ্কিমের প্রখর যুক্তিবোধ তাঁকে থিয়োরি রচনায় প্রণোদিত করেছে। মহাভারত থেকে বঙ্কিম যে কৃষ্ণকে খুঁজছিলেন, তিনি বঙ্কিমের মনঃকল্পিত, সর্ববৃত্তির সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত এক আদর্শ মানুষ। রবীন্দ্রনাথের এতে আপত্তি ছিল। কৃষ্ণকে আদর্শ মানুষ ধরে না নিলে মহাভারত নিয়ে ইতিহাস গবেষণা সার্থকতর হত বলে তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমের ক্ষুরধার মনীষা ও আদর্শবাদে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কতখানি ছিল তার প্রমাণ আছে প্রায় সমকালে লেখা একটি প্রবন্ধে। পঞ্চভূতে (১৮৯৭) সংকলিত 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' রচনায় সমীর যা বলেছে, সেটা রবীন্দ্রনাথেরই কথা—

'ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ। বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করিবার এবং কৃষ্ণপূজা প্রচার করিবার পূর্বে কৃষ্ণকে নির্মল ও সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন-কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা-কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজের উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ কথা বলেন নাই যে, দেবতার কোনো কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জনীয়। তিনি এক নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন; তিনি পূজাবিতরণের পূর্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই।'

রাজসিংহ উপন্যাসের যে-সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তার মতো উৎকৃষ্ট সমালোচনা বাংলায় কমই আছে। রবীন্দ্রনাথ এতে করেছেন রসের বিচার। তিনি দেখিয়েছেন উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণে যুক্ত মবারক-জেবউন্নিসার প্রণয়কাহিনী রাজসিংহ-ঔরঙ্গজেবের দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক পটভূমিরূপে যুক্ত হওয়ায় এই প্রেমকল্পনা কতখানি গভীরতা অর্জন করেছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাফল্য এখানেই। সে-সার্থকতা ইতিহাসের সত্যে নয়। নীতি বা উপদেশ নয়, তার সার্থকতা বিশেষ ধরনের রসসৃষ্টিতে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে উপন্যাসের রস একটা

বিশেষত্ব লাভ করে। সে কথা তিনি দেখিয়েছিলেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি লেখার একটি উপলক্ষ ছিল, সেটাও স্মরণীয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীরকাশেমের চরিত্র বিকৃত করা হয়েছে বলে বঙ্কিমের সমালোচনা করেছিলেন। বিতর্কে যোগ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে ইতিহাসকে ব্যবহার করার একটি অপূর্ব সার্থকতার হদিশ দিলেন। এতে বঙ্কিম-চন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মহত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, উপন্যাসে যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে সেটা সংশোধন করে নেব। কিন্তু ইতিহাসের পরিমণ্ডলে উপন্যাসে যে বিশেষ ধরনের রসের সৃষ্টি হয়, তার লোভ ছাড়া যায় না। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাহিত্য হিসাবে একান্ত গুণ-গ্রাহিতাই সূচিত হয়েছে।

ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কোনো অংশে কম ছিল না। বঙ্গদর্শনে ইতিহাসচর্চার একটা নিবিড় পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, যেমন ভারতীতে গড়ে উঠে-ছিল তত্ত্ব ও দর্শনচর্চার পরিবেশ। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার একটি বড়ো লক্ষণ ছিল ইতিহাসে অনুরাগ। প্রতি পদেই তিনি ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্য চর্চাতেই হোক, অর্থনীতি চর্চাতেই হোক, সমাজবিষয়ক চর্চাতেই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্রই ইতিহাস নিয়ে সতর্ক অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাস-বোধ অর্থ কালসচেতনতা। যে-ঘটনা যে-কালের তাদের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও পারম্পরিক কার্যকারণের ধারাবাহিকক্রমে সম্পর্ক নির্দেশ ইতিহাসচেতনার লক্ষণ। এজন্য তথ্যের উপর অধিকার যেমন থাকা চাই, তথ্যকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিকায় কার্যকারণের কাঠামোয় স্থাপনের দক্ষতাও তেমনি থাকা চাই। বঙ্কিমের প্রবন্ধে এ দুয়েরই পরিচয় আছে। বাঙালি জাতি-চরিত্রের মধ্যে কালচেতনার অভাব চিরকাল। উনিশ শতকে বিদেশীদের দ্বারা ইতিহাস লেখা শুরু হয়। বাংলা ভাষাতে তীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধের পরিচয় দেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদর্শনে যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, তথ্য সংকলন ও ইতিহাস-দৃষ্টির সমাহারসাধনে সেগুলি বিশিষ্ট হয়েছিল বঙ্কিমেরই প্রণোদনায়। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও লেখায় ইতিহাসে আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ঐতিহাসিক চিত্র পত্রিকা প্রকাশে তাঁর প্রেরণা স্মরণীয়। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন 'বাংলা সাহিত্যের এক পর্বে ইতিহাস সংকলনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে-প্রেরণা দিয়েছিলেন তার পরবর্তী পর্বে তাতে শক্তি জোগালেন রবীন্দ্রনাথ।' বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচর্চার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পার্থক্য কী রকম

রবীন্দ্রনাথ থেকে একটি উদ্‌ধৃতি দিয়েই তা বোঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

'তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে fact কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশিকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সত্য কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। অতএব এত দীর্ঘকাল পরে মহাভারতের কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ লইতে বসা আমরা দুঃসাধ্য এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বাহুল্য বোধ করি।'

সুতরাং তথ্যকে স্বীকার করলেও তিনি 'যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার' করাই বেশি দরকার মনে করেন। ঐতিহাসিক 'কল্পনা' করেন না তবে তথ্য তাকে 'হাইপোথেসিস' রচনা করতে অবশ্যই সাহায্য করে। বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মিত এবং প্রণালীবদ্ধ অধ্যয়নের দ্বারা অতীত থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার সাহায্যে হাইপোথেসিস করে নিয়ে যুক্তিবদ্ধ ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর বাংলার ইতিহাস সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি তার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ অল্পমাত্র তথ্যের উপর নির্ভর করে ইতিহাসের কল্পনা করতেন। ফলে তাঁর কাছে তথ্যগুলি প্রতীকী (symbolic) মূল্য পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ-ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি প্রবন্ধ তার দৃষ্টান্ত। তার কাব্যিক মূল্য অসাধারণ কিন্তু ঐতিহাসিকের লক্ষ্য ও পদ্ধতি আলাদা।

বঙ্কিমের দেশাত্মবোধে ছিল এই ইতিহাসপ্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য যে-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার স্পর্শ পেয়েছিলেন। কড়ি ও কোমল-এর যুগেই রবীন্দ্রনাথের মনে বঙ্কিমের উদাত্ততা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।[২৫] রবীন্দ্রনাথও প্রয়োজনবোধ করেছেন বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার।[২৬] সেকালে তাঁরও ছিল দেশাত্ম-বোধের প্রেরণা, যে-প্রেরণায় তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে বহু গান রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষরিক অর্থে কবি ছিলেন না, তিনি প্রবন্ধ লিখে দেশের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ছিল ঐতিহ্যগর্ব এবং ভবিষ্যৎ বাঙালিকে গড়ে ওঠবার জন্য উৎসাহদান। রবীন্দ্রনাথের গানে ঐতিহ্যের কথা নেই, ছিল জননীর স্নেহে অন্ধ আকর্ষণ।[২৭] বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম রচনা করে ওজস্বিনী মাতৃমূর্তির কল্পনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বঙ্গজননী আমাদের দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত ঘরের জননী। বঙ্কিমচন্দ্র যে-বঙ্গচেতনার জাগরণ ঘটালেন,

সেই জাগরণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাতে পুরোপুরিই যোগ দিয়েছিলেন, এ কথা সুবিদিত। রবীন্দ্রনাথ এ সময় দেশ সমাজ ও জাতির চিন্তায় কতখানি বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন, বঙ্গদর্শনকে নতুন করে উজ্জীবিত করার দ্বারাই তা বোঝা যায়। বঙ্কিমের মতো তাঁর এ-সময়ের জাতীয়তাবোধেও ঐতিহ্যগর্ব ছিল। তিনি অবশ্য বাঙালির ঐতিহ্যের কথা সেভাবে বলেন নি। কিন্তু ভারতের আদর্শ, ও সংস্কৃতির গর্বে তিনি উদ্‌বেলিত ছিলেন। এ-সময়ের লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ।

এই নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের পাতাতেই বঙ্কিমী ভাবধারার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতির আলোচনা আরম্ভ করেন। এর মূলে বিবেকানন্দের প্রেরণাও থাকতে পারে। তার আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন অনেকেই। ভারতবর্ষের জাতিগঠনের ইতিহাস আলোচনায় বঙ্কিম যে-সূত্রটি দিয়েছিলেন 'ভারত-কলঙ্ক' (১৮৭৩) প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথের আলোচনাতেও সেই সূত্রটি নতুন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ইতিহাস যে সব দেশেই একই প্যাটার্ন অনুসরণ করবে এমন কোনো কথা নেই। ভারতের ইতিহাস ভারতেরই মতো, তার সঙ্গে য়ুরোপের ইতিহাসের মিল খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এই মনোভাবের মধ্যে যে-স্বাজাত্যভিমান ছিল, তা বঙ্কিমেরই মতো। বঙ্কিম ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে একটিই প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ভারত-কলঙ্ক প্রবন্ধেই পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের ভারত-ইতিহাসচিন্তার বীজ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতবর্ষকে একটি জাতির দেশ বলা যায় কিনা। এই 'জাতি' শব্দটাকে ইংরেজি 'নেশন' শব্দের অনুবাদ বলে ধরা সংগত কি ? এই প্রশ্নই তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি আলোচনা করেছিলেন ইতিহাসের তথ্য ও কালপরম্পরা ধরে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন ভারতে বহুজাতির মিশ্রণ। বহুজাতি ভারতবর্ষে এক ভারতীয় জাতির সৃষ্টির অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রে বদ্ধ হয়েছে। এই ঐক্যই ভারতীয় জাতির সত্যরূপ। য়ুরোপে একটি নেশনে যে ঐক্য থাকে, ভারতে বহুজাতি সহযোগে সেই ঐক্য। এজন্য ভারতীয় জাতি (রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মহাজাতি') আর য়ুরোপের নেশন এক বস্তু নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের তথ্য দিয়ে ভারতের অতীতকে একে একে দেখিয়েছেন, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি বাহির থেকে এসেছে, ফলে এ দেশে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। অবশেষে ইংরেজ এসে এই বৈচিত্র্যকে রাষ্ট্রবন্ধনে বাঁধল, তখন তৈরি হল 'নেশন'। তিনি অর্থপূর্ণভাবে বলেছেন 'নেশন বলিতে জাতি বুঝিতে হইবে।' এই ভারতীয়

নেশনের সঙ্গে য়ুরোপের নেশনের যে পার্থক্য আছে, তাও তিনি বলেছেন। কিন্তু নেশন অর্থে জাতি শব্দের চেয়ে উপযুক্ততর শব্দ তিনি পান নি।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতি থাকলেও এর মধ্যে যে একটি ঐক্য প্রচ্ছন্ন আছে, সে কথা বিদেশী ঐতিহাসিকেরাও বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে ঐক্যের কথা না বললেও প্রকারান্তরে মেনেছেন, ভারতকে একটি সমগ্র দেশসত্তা বলেই তিনি অনুভব করেছেন। এই সত্তাটিকে আরও প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ভাবনাসূত্রটি রবীন্দ্রনাথ এই দুইজনের কাছেই পেয়েছিলেন বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাস -বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে, 'ভারততীর্থ' কবিতা এবং 'জনগণমন' গানে বিচিত্র এবং একের তত্ত্বটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্য এবং যুগে যুগে বহিরাগতদের এ দেশে আসা রবীন্দ্রনাথের মতে বিধাতার ইচ্ছা এবং ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতির চরিতার্থতা। বিধাতার এই ইচ্ছাকে সম্মান করে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে বলেছেন, মহামানবসাগর, যেখানে বহুমানবের ধারা এসে মিলিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো কবির দৃষ্টিতে এই ইতিহাসকে দেখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে একে বলেছেন ভারত-কলঙ্ক, এখানে বিচিত্র একাকার হয় নি বা একজাতীয়ত্ব লাভ করে নি। তাই ভারতবাসী বার বার বিদেশাগতদের কাছে পরাস্ত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র সেকালে জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্‌গাতা। তাঁর ইতিহাসচর্চা ছিল জাতীয় চেতনার দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বাঙালিকে শেখাতে চেয়েছেন নিজের জাতিকে চিনতে ও ভালোবাসতে। এ-সব কথা বহুকথিত সুতরাং নতুন করে বলার দরকার নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের আবেগের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে কমলাকান্তের দপ্তরে; তাকে রূপায়িত করেছেন আনন্দমঠের কাহিনীতে, ওজস্বিতাপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধে। সেই আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তরুণসমাজ। সে প্রভাব থেকেছে দীর্ঘকাল। বন্দেমাতরম গান এবং ধ্বনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রাণস্বরূপ হয়েছিল। সেই যুগে রবীন্দ্রনাথও স্বজাতি এবং স্বদেশী সংস্কৃতির ভাবনায় প্রবল ভাবে উদ্দীপ্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এ-সময়কার লেখা প্রবন্ধের সংযত শান্তভাষা আমাদের আত্মচেতনাকে উজ্জীবিত করতে কম সাহায্য করে নি। তাঁর আহ্বান ছিল স্বজাতিকে চেনা, পরমুখাপেক্ষী না থেকে স্বাবলম্বী হবার জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রবন্ধে এবং অন্যত্র উদ্যম ঐক্য সাহস ও অধ্যবসায় অবলম্বনে জেগে উঠতে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথও

তেমনি 'নেশন কী' 'স্বদেশী সমাজ' 'সফলতার সদুপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে আত্মগঠনে প্রবুদ্ধ হতে বলেছেন। এ-সব ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। ভারতবর্ষ নেশন কি না আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করি—

'নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমান কালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প— ইহাই জনসম্প্রদায়-গঠনের ঐকান্তিক মূল।' অর্থাৎ বঙ্কিমের ভাষায় 'উদ্যম ঐক্য সাহস ও অধ্যবসায়'।

জাতি চেতনার মূলে যে-ঐতিহ্যবোধ থাকে এবং সমাজবোধ কাজ করে রবীন্দ্রনাথও সেই কথাও এখানে এবং অন্যত্র বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের মূলে ছিল এই অতীত গৌরববোধ এবং সমাজবোধ। এখানে একটি সূত্র বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি আলোচনা করে দেখিয়েছেন আমাদের দেশে নেশন ছিল না, কিন্তু সমাজ ছিল শক্তিশালী। সমাজই ছিল নেশনের স্থলাভিষিক্ত। অবশ্য আধুনিককালে য়ুরোপে রাষ্ট্রতন্ত্র যেভাবে নেশনকে গঠিত করেছে, প্রাচীনকালে আমাদের সমাজ কখনোই সেভাবে কাজ করে নি। সমাজ রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ভাবেই গড়ে উঠেছে। বর্তমান কালেও ভারতের জাতীয় প্রকৃতি অনুসরণ করে এভাবেই সমাজকে গড়ে তুলতে হবে— আবার সমাজে নতুন শক্তি নিয়ে আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'এই লোকচিত্তের একতা সবদেশে একভাবে সাধিত হয় না। এইজন্য য়ুরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে কথা বলা যায় না। সে-ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার— কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, য়ুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।'[২৮]

য়ুরোপীয় ভাবে নয় আমাদের জাতীয় ভাবে নেশন গড়তে হবে এবং সে-নেশন হবে সমাজনির্ভর। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই রবীন্দ্রনাথ এখানে জাতীয় ভাবে আচ্ছন্ন। ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রকৃতির উপরেই জোর দিয়েছেন। এই সমাজনির্ভর নেশনের

কল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্ব আলোচনাকালে সমাজের গুরুত্ব দেখিয়েছেন। সমাজের গঠন ও ব্যক্তি-সমাজের সম্পর্ক নিয়ে বঙ্কিম যা ভাবছিলেন, তাতে কোমতের প্রভাব ছিল। কিন্তু ভারতীয় হিন্দুসমাজই যে তাঁর মূল আলোচ্য সমস্ত ধর্মতত্ত্বই তার প্রমাণ। বঙ্কিমের এই আলোচনাতে রাজনৈতিক রাষ্ট্রতন্ত্র বা নেশন অপেক্ষাকৃত নেপথ্যে, রবীন্দ্রনাথের আলোচনার মতো সমাজই প্রধান। তাঁর একটি উক্তি—

'স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবর্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য নহে যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।'[২৯]

রাজা বলতে সমাজ-নির্ধারিত শাসনকর্তাকেই বোঝাতে চান— সমাজই যে-রাজাকে প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। তাই তিনি বলেন—

'যে-মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে-দেশে একজন রাজা নাই, যে-রাজ্য সাধারণতন্ত্র সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে।'

তার পরেই বলছেন—

'সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।[৩০]

রবীন্দ্রনাথ এই সমাজনির্ভরতার কথাই বলেছেন। সমাজকে শক্তিশালী করে তুলতে পারলে আমরা সত্যকার আশ্রয় পাব। বিদেশী রাজা আমাদের আশ্রয় দেবে না। বঙ্কিম স্বদেশী রাজার প্রসঙ্গে নীরব থেকে আমাদের নিজস্ব শক্তিকেন্দ্র সমাজকে গড়ে তুলতে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথও বিদেশী রাজাকে উপেক্ষা করে সমাজের কল্পনা করেছিলেন। অবশ্য বঙ্কিম কোনো আলাদা সংস্থা গড়ে তোলার ইঙ্গিত দেন নি, ব্যক্তিগত অনুশীলন দ্বারা উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে আমাদের বর্তমান সমাজই সুগঠিত হবে।

সমাজই যে ভারতবর্ষের শক্তি বঙ্কিম তার ব্যাখ্যাও করলেন, রবীন্দ্রনাথ তার অনুসরণ করলেন কিন্তু তাঁদের চিন্তা শেষ পর্যন্ত তত্ত্বের স্তরেই রয়ে গেছে। তার প্রধান কারণ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন। সমাজ নানা কারণেই বিকেন্দ্রিত হয়ে যাচ্ছে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রবল থেকে প্রবলতর

হচ্ছে, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং অন্যান্য মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে, ইংরাজের আমলে নতুন ধর্ম ও নীতির প্রবর্তন হয়েছে। এ অবস্থায় বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব থেকে গেল শিক্ষার নিছক আদর্শ তত্ত্ব হিসাবে। রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন ভারতীয় সমাজের আদর্শের প্রতি আস্থা শিথিল করে নতুন মূল্যবোধকে গ্রহণ করলেন। জাতীয়তাবাদী বঙ্গভাবনাকে গৌণ করে ভারতীয় জাতিচিন্তায় নিবিষ্ট হলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির চিন্তায় অবশ্য আগের থেকেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম উন্মাদনার পর তাঁর চিত্ত বৃহত্তর ভারতীয়তায় আকৃষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের সমাজ নিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করছিলেন, তখন আসলে হিন্দু-সমাজই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বঙ্কিমও তাই করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরে ভারতের যে-ছবি আঁকলেন তা শুধু হিন্দুকে নিয়ে নয়— 'হিন্দুজৈন শিখপারসিক মুসলমান' সবাইকে নিয়ে। যে-ব্রাহ্মণকে তিনি আগে ভারতে ত্যাগের প্রতীক লোকগুরু হিসাবে কল্পনা করেছিলেন, সেই ব্রাহ্মণকে তিনি আহ্বান করলেন মন শুচি করে সবাকার হাত ধরে চলার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তিনি বঙ্কিমী চিন্তার জগৎ থেকে সরে এলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-জাতীয়তার মন্ত্র শুনিয়েছিলেন বাঙালিকে, রবীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেলেন আন্তর্জাতীয়তার দিকে। অবশ্য বঙ্কিম দেশবাৎসল্যের সঙ্গে বিশ্বজনীনতার মহত্ত্বের গুণগান করেছেন তাঁর ধর্মতত্ত্বে। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর সময়ে দেশবাৎসল্যের প্রবণতাই তৈরি করতে চেয়ে সফল হয়েছিলেন। বন্দেমাতরম্ গান কণ্ঠে নিয়ে বহু তরুণ প্রাণ উৎসর্গ করেছে। তাদের আত্মত্যাগ রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেছে, কিন্তু তাঁর বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন জাতীয়তাবাদের বৈনাশিক রূপ এবং বন্দেমাতরমের হিংস্রতাকে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিদেশেও জাতীয়তাবাদের অনিষ্টকারিতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। ঘটনাচক্রে ধীরে ধীরে বন্দেমাতরম্ গানের সঙ্গে জাতীয় সংগীতরূপে জনগণমন গান স্থান করে নিয়েছে, বঙ্কিমের মাতৃকল্পনার স্থলে এল দেশের অধিনায়করূপে বিধাতাপুরুষের কল্পনা।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনেই বন্দেমাতরম্ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। সে-গানের সুর দিয়েছিলেন যদুভট্ট, যিনি বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই কিছুকাল সংগীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ নিজে সুর দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম্ গানে এবং সেই সুরে গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন তার স্রষ্টাকে। এ-সংবাদ রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন বঙ্কিমশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে। তাঁর সেই স্মৃতিচারণ থেকে

উদ্ধৃত করি। বঙ্কিম সম্বন্ধে এটিই তাঁর সভাসমক্ষে শেষ ভাষণ। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের যে কর্মযোগী রূপ যৌবনে দেখেছিলেন, বার্ধক্যেও সেই কর্মযোগীকেই স্মরণ করলেন—

'তিনি সাধকই বটেন। তাঁর সাধনালব্ধ যে চিন্ময় আধারটি তিনি দিয়ে গেলেন, তাহাই ক্রমে বাঙালির নব ইতিহাস সৃজনের মূল কাব্য হল। সেই দিক থেকে এই যোগ্যপাত্রে দেশ-বিদেশের কত ঐশ্বর্য যে সংগৃহীত ও সঞ্চিত হতে শুরু করেছে তা আর শেষ করা যায় না। নানা দেশের ও কালের সমাজ তাতে তিনি সঞ্চয় করে দেখালেন। ভরসা পেয়ে অন্যেরাও তাতে তাঁদের অর্ঘ্য রাখতে শুরু করলেন। যে ভাষা অবজ্ঞার আবর্জনার আঁস্তাকুড়ে ছিল, তা হল শ্রদ্ধাবান যজমানের অর্ঘ্যের আধার পবিত্র যজ্ঞভূমি। এত বড়ো দাম আর নেই।'[৩১]

উল্লেখসূত্র

১. জীবনস্মৃতি, ১৩৫০, গ্রন্থপরিচয়ে উদ্‌ধৃত ; র.-র. ১৭, পৃ. ৪৭৯, বিশ্বভারতী
২. জীবনস্মৃতি, গঙ্গাতীর ; র.-র. ১৭, পৃ. ৩৯৪, বিশ্বভারতী
৩. কবিতাপুস্তকে এই সমালোচনা সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথের করা বলে মনে হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন এ-সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ-কৃত। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা (বিশ্বভারতী) ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩। প্রশান্তকুমার পাল রবিজীবনী গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু বলেন নি। সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের ধরে নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্ব' (১৯৭৮) গ্রন্থে।
৪. 'বাউলের গান' সমালোচনা (১৮৮৮) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্রষ্টব্য : র.-র. অচলিত সংগ্রহ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১
৫. বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৭৭) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ও রচনা যথাসম্ভব সংকলন করেছেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। অমিত্র-সূদনের 'অন্যোন্যদর্শন : বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ' বইটিও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
৬. পঞ্চাশোর্ধ্বম্, ফাল্গুন ১৩৩৬, সাহিত্যের পথে, দ্রষ্টব্য, র.-র. ২৩, পৃ. ৫১৯, বিশ্বভারতী।
৭. ব্যতিক্রম রামদাস সেন। রামদাস সেনের 'কুমারপাল' প্রকাশিত হয় ভারতী ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায়।

৮. ভারতীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৫৭

৯. বঙ্কিমচন্দ্র (বিশ্বভারতী), পৃ. ১০২

১০. রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪ (বিশ্বভারতী) পৃ. ৫৩৯। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা পত্র।

১১. ছিন্নপত্রে সংকলিত

১২. বঙ্কিমচন্দ্র (বিশ্বভারতী), পৃ. ৯৫

১৩. রবীন্দ্রনাথের গল্পেও এ-ধরনের রোমান্স নেই তা নয়। দৃষ্টান্ত, মণিহারা, মহামায়া।

১৪. ছিন্নপত্রাবলী, ১৯৬৩, পৃ. ১৯

১৫. ইতিপূর্বে করুণা উপন্যাস এবং ভিখারিণী গল্প লিখেছেন। সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়।

১৬. এর চরিত্রেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছায়াপাত আছে। বসন্ত রায় চরিত্রটি শ্রীকণ্ঠ সিংহের প্রতিরূপ।

১৭. স্বর্ণকুমারী দেবীর ছিন্নমুকুল (১৮৭৯) উপন্যাসের নীরজাও স্পষ্টতই কপাল-কুণ্ডলার আদর্শে গঠিত।

১৮. 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সাহিত্যরূপ' 'পঞ্চাশোর্ধ্বম' 'বাংলাসাহিত্যের ক্রম-বিকাশ' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১৯. ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৯

২০. রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিনী গল্পের উপসংহার তুলনীয়।

২১. ভারতীতে প্রকাশের সময় এর নাম ছিল 'বাঙালী কবি নয়'।

২২. এই লেখাটি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে রবীন্দ্রনাথের। এটি 'সমা-লোচনা' বইতে সংকলিত হয় নি। ভারতীতে (আশ্বিন ১২৮৭) লেখার নাম ছিল 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন'। 'বাঙ্গালী কবি নয়' এবং 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' দুটি লেখাই বঙ্গদর্শনের 'বাঙ্গালী কবি কেন' (১২৮২ পৌষ) প্রবন্ধের উত্তরে লেখা বলে প্রভাতকুমার মনে করেছেন। সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন ও ভারতীর তিনটি প্রবন্ধ নিয়েই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিপর্ব, পৃ. ৩৪০-৪৪। উল্লেখযোগ্য, বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না যদিও প্রভাতকুমার ধরে নিয়েছেন লেখক বঙ্কিমচন্দ্র।

২৩. এই বিতর্ক প্রসঙ্গের জন্য রবীন্দ্রজীবনী ছাড়াও দ্রষ্টব্য বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ); পুলিনবিহারী সেন, রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী ১৯৭৩; অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অন্যোন্যদর্শন : বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। এই বিতর্কের তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ।

২৪. দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের জন্য দুটি বই পাঠিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বঙ্কিম একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র (বিশ্বভারতী) বইতে।

২৫. কড়ি ও কোমল কাব্যের 'বঙ্গভূমির প্রতি' 'বঙ্গবাসীর প্রতি' 'আহ্বান গীত' দ্রষ্টব্য।

২৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাতেই বাংলাদেশের একটি বিবরণাত্মক ইতিহাস রচনা করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাক্ষাৎকারেই তাঁকে বাংলাদেশের একটি ইতিহাস লিখতে বলেছিলেন।

২৭. বাঙলা ও বাঙালি সম্পর্কে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের তুলনা করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন 'বঙ্কিম-রবীন্দ্রের দৃষ্টিতে বাংলার অতীত', দেশ কার্তিক ২০, ১৩৬১।

২৮. 'ভারতবর্ষীয় সমাজ', আত্মশক্তি; র.-র. ৩, পৃ. ৫২০, বিশ্বভারতী

২৯. ধর্মতত্ত্ব, অধ্যায় ৮, বঙ্কিম রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৩০. ধর্মতত্ত্ব, অধ্যায় ১০, বঙ্কিম রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৩১. বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৩৮, ৬ আগস্ট শান্তিনিকেতনে কবির ভাষণ। ভাষণটি ক্ষিতিমোহন-সেন অনুলিখিত। বক্তৃতার শেষে কবি বন্দেমাতরম নিজের দেওয়া সুরে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। —বঙ্কিমচন্দ্র (বিশ্বভারতী) পৃ. ১৬৭।

প্রত্যক্ষতাবাদের ধর্ম

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে আমাদের দেশে পজিটিভিজম নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হত। কেউ কেউ আচরণে ও চিন্তায় পজিটিভিস্ট হয়েছিলেন, কেউ ঠিক পজিটিভিস্ট না হলেও এই তত্ত্বটি নিয়ে মত্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে তখন যে ধর্মান্দোলন চলেছিল, সমকালীন য়ুরোপীয় দর্শন হিসাবে পজিটিভিজম সেই আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের মানসজাগরণের এই সময়ে তিনিও যে এর স্পর্শ পান নি তা বলা যায় না যদিও আমরা রবীন্দ্রমানসে উপনিষদ-চর্চার প্রভাবটাই বড়ো করে দেখে থাকি। কিন্তু সময়টা মনে রাখলে রবীন্দ্রমানসে পজিটিভিজমের প্রভাব অনুসন্ধান করতে চাওয়া অসংগত মনে হবে না। যদিও রাজনারায়ণ বসু বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন 'জঘন্য কোম্‌তমতাবলম্বী' এবং বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের প্রামাণিকবাদের সমালোচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথাপি ব্রাহ্মধর্মাদর্শও যে কোম্‌ত-মত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না এ কথা বলা যায়।

আসলে ফরাসী দার্শনিক অগুস্ত কোম্‌ত (১৭৯৭-১৮৫৮) পজিটিভিজম নামে একটি তত্ত্ব তৈরি করে তুলেছিলেন সত্য, কিন্তু পজিটিভিজমকে কেবল একটা তত্ত্ব হিসাবে দেখলে চলে না। একে বলা যেতে পারে একটা দৃষ্টিভঙ্গি যা উনিশ শতকে ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলন লাভ করেছিল। ইহজগতের নীতিনিয়মকে বুদ্ধি দিয়ে নির্ণয় করা, মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা, এ সবই পজিটিভিজম মতবাদের প্রধান লক্ষণ। এর জন্য অলৌকিক ঈশ্বর-ভাবনার প্রয়োজন নেই। অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় জগত্তত্ত্বকে বুঝবার বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। এই জগৎ এবং এই মানুষই হচ্ছে চরম ও পরম সত্য। কোম্‌তের এই বিশ্বাস গড়ে উঠবার মূলে যে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধানে ক্লান্ত মানুষ, বিশেষ করে কাণ্টের পর, যুক্তি দিয়ে জগতের নীতিনিয়মকে বুঝতে চেয়েছে। পদার্থবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, জীবতত্ত্ব জ্ঞানের নানা দিকেই অলৌকিক কারণকে পরিহার এবং কার্যকারণের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। কোম্‌ত চেষ্টা করেছিলেন নিয়মতন্ত্রের উপর অটল আস্থা রেখে মানুষের সমাজ ও নীতিধর্মকেও ব্যবহারিক নিয়মে বদ্ধ করতে। গণিতকে

তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন কেননা গণিত স্বনির্ভর। কোম্‌তের এই বিজ্ঞান-প্রবণতায় চিন্তাকে স্পষ্ট স্বচ্ছ ও যুক্তিনির্ভর করার চেষ্টাতে নব সমাজনীতিও গড়ে উঠেছে। ইউটিলিটারিয়ান তত্ত্বের সঙ্গে পজিটিভিজমের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ— এই প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিলও পজিটিভিজমকে মূলত স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কোম্‌তের তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'কোম্‌ত বলেন যে বিশ্বমণ্ডলের সকল বস্তুই নিয়মের অধীন। আকাশে যে ধূমকেতু কখনও কখনও দেখা যায়, আর মানুষের মনে যখন যে ইচ্ছা উদিত হয় সকলই নিয়মের অধীন। পৃথিবীতে লোকের পদাঘাতে যে রেণুরাশি উড়িতে থাকে নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণ বিরাজিত, মনুষ্যসমাজে যখন যে ঘটনা ঘটে সকলই নিয়মের অধীন।'[১]

এই অলৌকিকতা-বর্জিত নিয়মে যেমন চলছে বস্তুজগৎ তেমনি চলছে মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য দায়-দায়িত্বও তেমনি একটি নিয়মে চলছে। এই নিয়মেই আমরা জানি যে ধর্ম এখন অতিলৌকিক ঈশ্বরভজনাতে নেই, নিয়মচালিত অতি-প্রত্যক্ষ এই মানবসমাজের সেবাতেই ধর্ম। কোম্‌ত ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়েছেন মানবকে। এই জগৎ মানবজগৎ; মানববুদ্ধির বাইরে আর কোনো কিছুর কল্পনা অর্থহীন। জন স্টুয়ার্ট মিল কোম্‌তের আলোচনা প্রসঙ্গে এই মানবদেবতার ব্যাখ্যা করেছেন—

Mr. Comte believes in what is meant by the infinite nature of duty. But he refers the obligations of duty as well as sentiments of devotion to a concrete object at once ideal and real : the Human Race conceived as a continuous whole, including the past, the present and the future. This great collective existence the Grand Etre as he terms it, though the feelings it can excite are necessarily very different from those which direct themselves towards an ideally perfect being.

কোম্‌তের এই বিরাট সত্তা ঈশ্বর (Perfect Being) থেকে আলাদা, রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্মে'র 'বিশ্বদেবতা' যেমন ঈশ্বর থেকে আলাদা। এই সত্তা মহামানব সত্তা। কোম্‌ত এই মহামানবের প্রতি দায়িত্বপালনের নাম দিয়েছিলেন মানবধর্ম (Religion of Humanity)। বুদ্ধি দিয়ে এই প্রত্যক্ষ জগৎকে নিয়মরূপে জানা এবং প্রত্যক্ষ এই মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই মানব-

ধর্ম। কোম্‌ত জগতের নিয়মের পিছনে অদৃশ্য শক্তিকে অস্বীকার করেছেন তেমনি মানবসেবার জন্য কোনো ঐশ্বরিক অনুপ্রাণনারও দরকার বোধ করেন নি। এজন্য নিরীশ্বরবাদী কোম্‌ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে **Comte offered the world all of catholicism except Christianity.**

নামে পজিটিভিজম না হলেও মানবধর্ম আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। মানববুদ্ধি এবং মানবজীবনের আশ্রয়ে থেকেই আধুনিক মানুষ জগতের দিকে তাকিয়েছে— ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর শিথিল হয়ে যাচ্ছে, বস্তুজগতের চেয়ে সত্য আর কিছুই থাকছে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোনো কালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোনো চিত্ত কোথাও থাকতেও পারে যার উপলব্ধ জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত। আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে যে বিরাজ করে না। কিন্তু, যে-জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কী করে। এইজন্যে কোনো আধুনিক পণ্ডিত বলেছেন, বিশ্বজগৎ গাণিতিক মনের সৃষ্টি।'[২]

বাঙালিরা কোম্‌ত ধর্মের পরিচয় লাভ করে ইংলণ্ডের মধ্যস্থতায়। ইংলণ্ডে কোম্‌তের প্রধান অনুগামী ছিলেন রিচার্ড কংগ্রীভ (১৮১৮-১৮৯৯); কিন্তু ইংলণ্ডেও কোম্‌তের মত পরিচিত হয় ১৮৫০-এর পরে। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে ইংলণ্ডে পজিটিভিজমের চর্চা চলে। এই সময়ের মধ্যেই স্যামুয়েল লব, জেমস গেডেস এবং হেনরি কটন— এই তিন পজিটিভিস্ট ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী-রূপে আসেন। এ দেশীয় শিক্ষিত সমাজে তাঁরাই এই মতটি সঞ্চারিত করেন। মিলের বই *August Comte and Positivism* (১৮৬৫) এ বিষয়ে ছিল বড়ো সহায়ক। বাঙালিদের মধ্যে দ্বারকানাথ মিত্র এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যই মূল ফরাসীতে কোম্‌ত দর্শন পড়েছেন। অন্যেরা ইংরেজ পজিটিভিস্টদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিলেন। পজিটিভিজম আমাদের দেশে ধর্মবিশ্বাস হিসাবে কোনো গোষ্ঠী বা অনুগামী সৃষ্টি করে তোলে নি। উনিশ শতকে বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি প্রত্যক্ষতাবাদী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন সত্য কিন্তু বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মের মতো তাঁরা কোনো সম্প্রদায় গড়েন নি। তালতলায় নীলমণি কুমারের বাড়িতে পজিটিভিস্ট ক্লাব ছিল। ইংরেজরা কেউ আসতেন না, আসতেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ডব্লিউ. সি.

ব্যানার্জি, ছোটো আদালতের জজ কে. এস. চ্যাটার্জি, হাইকোর্টের অনুবাদক কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার ও নীলমণি কুমার। যোগেন্দ্রচন্দ্র রামমোহনের ইংরেজি রচনা সম্পাদনা করেছিলেন, বঙ্কিমের সঙ্গেও কোম্‌ত দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন।[৩] বিশেষভাবে পজিটিভিজম মতাবলম্বী বলে অল্প কয়েকজনই চিহ্নিত ছিলেন এবং এই মতটি নানাভাবে আমাদের চিন্তায় ও আচরণে প্রবেশ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পরিকল্পিত হিন্দুধর্মকে কোম্‌তের মানবধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা বিশ্লেষণ করে দেখলেও কোম্‌তের প্রভাব পাওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণকমল বলেছেন, কবি বিহারীলালের রচনাতেও কোম্‌তের ছায়া আছে। বঙ্গদর্শনে এই নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। পজিটিভিস্ট সার হেনরি কটন বলেছিলেন—

Sooner or later, however the logic of events must bring about in India, as well as in Europe, the substitution of the conception of law for that of will; and as a necessary consequence, the substitution of a human for a supernatural point of view in all social and religious organisations.[৪]

কটন আশা করেছিলেন বাঙালি যদি পজিটিভিস্ট হয়ে নাও যায় তবু পজিটিভিজমের প্রভাবে অলৌকিকতার পরিবর্তে নিয়মের প্রতি অনুরাগ, অতীন্দ্রিয়তার পরিবর্তে কার্যকারণে বিশ্বাস বাঙালির মনোজগতে স্থান করে নেবে। বঙ্কিম ভূদেব রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতির যুক্তিধর্মে এ আশা যে অনেকখানি ফলবতী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তখনকার নব্যহিন্দুধর্মে কিংবা ব্রাহ্মধর্মে ঈশ্বরের অবিচল আসন সত্ত্বেও মানবত্বসাধনার উপর যতখানি জোর দেওয়া হয়েছে এমন আগে কখনও হয় নি। নির্বাণমুক্তি সংসারত্যাগ লৌকিক কার্যে অলৌকিক কারণের আরোপ প্রাকৃতিক নিয়মবহির্ভূত জগদতিরিক্ত শক্তিকে বিশ্বাস অন্তত সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে গিয়েছে। ইতিহাসকেও নতুনভাবে দেখবার অভ্যাস হয়েছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনও ঈশ্বরের ইচ্ছার ফল নয়। তাই শাসনকে দূর করা আমাদেরই আয়ত্তে— এ কথাও ভাবতে শিখছে। এ দৃষ্টান্ত দিলাম এইজন্যেই যে ইংলণ্ডের পজিটিভিস্ট নেতা রিচার্ড কংগ্রীভ সুস্পষ্টভাবেই এই অভিমত পোষণ করতেন। ভারতের জাতীয়তাবাদকেও তাঁরা শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছেন। ব্রিটিশের পীড়নকে তাঁরা অন্যায় বলেই মনে করেছেন। উনিশ শতকের দেশাত্মবোধক আন্দোলনের মূলে পজিটিভিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করলেই জানা

যায়। তেমনি মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রবল সমর্থন ছিল ইউটিলিটারিয়ান এবং পজিটিভিস্ট চিন্তাধারায়।

১৮৮৫-তে (১২৯২ শ্রাবণ থেকে পৌষ) ভারতী পত্রিকায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় পজিটিভিজম সম্বন্ধে। কৃষ্ণকমল সুস্পষ্ট ভাষায় ও রীতিতে কোম্‌তের এই তথ্যটি ব্যাখ্যা করেন। তাতে প্রসঙ্গত তিনি জাগতিক নিয়মের প্রতি কোম্‌তের অটল বিশ্বাস এবং চিরাচরিত ধর্মবোধের অপ্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই ব্যাখ্যা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'পজিটি-ভিজম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম' লিখে তাঁর প্রতিবাদ করেন। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য কোথায়, সে সূত্র নির্দেশ করবার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে উদ্‌ধৃত করি—

'মঙ্গলনিষ্ঠ আত্মা কখনই মঙ্গলময় মূল সত্যের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনাশ পাইতে পারে না। আত্মার অভ্যন্তরে অন্বেষণ করিলেই এই আনন্দজনক সত্যটি উপলব্ধি করা যাইতে পারে— দূরে যাইতে হয় না। মূল সত্যের প্রতি আমাদের আত্মার এই যে একটি মর্মান্তিক আকর্ষণ— ইহা একদিকে আমাদের সমস্ত ধর্মকার্যের মূল প্রবর্তক, আর একদিকে আমাদের আত্মার অমরত্বের নিদান। কমটি মূল সত্যকে ছাড়িয়া, অবিনাশী আত্মার অনন্ত উন্নতিকে ছাড়িয়া, জনসমাজের অনন্ত উন্নতির প্রয়াসী! ইহারই নাম "গোড়া কাটিয়া আগায় জল"।'[৫]

কোম্‌তের মত নিয়ে ভারতীতে এই বাদবিতর্কের সময়ে তত্ত্ববোধিনী[৬] পত্রিকাতেও কোম্‌ত মতের সমালোচনা করে রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি প্রগাঢ় ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু তাঁর ধর্মতত্ত্বে তিনি তর্কের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সমর্থন হিসাবে উল্লেখে বিরত থেকেছেন।

উনিশ শতকের অষ্টম নবম দশকে যখন কোম্‌তের মত নিয়ে নানা আলোচনা চলেছিল তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স কুড়ি-বাইশ বছর। ভারতী এবং তত্ত্ববোধিনী— দুই পত্রিকাই তাঁর পারিবারিক পত্রিকা। ইতিমধ্যেই ভারতীতে (১২৮৬-৮৭) রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে মন্তব্যও করেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। বঙ্গদর্শনের তিনি ভক্ত ছিলেন। 'নবজীবন'ও তিনি পড়তেন। সেকালের বাঙালির চিন্তার গতিপ্রকৃতি তিনি লক্ষ করছিলেন, এ কথা বললে ভুল বলা হবে না।

এর প্রমাণ দেওয়াও কঠিন নয়। ১২৯১-তে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সত্যের সংজ্ঞা নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (১২৯১ অগ্রহায়ণ) লিখেছিলেন 'একটি পুরাতন কথা'। এটির উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়'। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ১২৯১, পৌষ সংখ্যায় 'কৈফিয়ৎ' প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই-সব প্রবন্ধের মধ্যেই তাঁর চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পরের বছরে দ্বিজেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকমলের প্রবন্ধের সমালোচনায় যে কোম্‌ত-মতবিরোধী বক্তব্য লিখেছিলেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল পাওয়া যায়। যেমন

'মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ।'[৭]

এর থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ কোম্‌তের মতকে নিঃসংকোচে গ্রহণ করেন নি। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণের মতোই তিনিও জগতের জড় প্রাকৃতিক নিয়মেই শুধু বিশ্বাস করতেন না। মানুষের অধ্যাত্মজীবন ও অধ্যাত্মশক্তিতে তাঁর আস্থা ছিল। যে প্রেরণায় তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (রচনা শ্রাবণ ১২৮৮) লিখেছিলেন, তার কোনো প্রাকৃতিক কারণ নির্দেশ করা যায় না। জীবনস্মৃতিতে তিনি এই কবিতারচনার প্রেরণার যে-বর্ণনা দিয়েছেন তাকে মিস্টিক বললে অসংগত হয় না—

'আমার মনে আছে, জগৎটাকে কেমন করিয়া দেখিলে যে ঠিকমতো দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে নিজের ভার লাঘব হয়, সেই কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম— কিছুমাত্র কৃতকার্য হই নাই, তাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

'একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই

ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।'[৮]

মনের এই জাগরণের কোনো ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষবাদী চিন্তায় পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরানুভূতি, সৃষ্টির প্রেরণা, সৌন্দর্যবোধ এ-সবের কোনো নিয়ম কোম্‌ত নির্ধারণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের তরুণচিত্তের এই জাগরণটিরও কোনো প্রাকৃতিক কারণ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাণ জেগে উঠে যে সমগ্র বিশ্বভুবনকে গ্রহণ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, এই বিশ্বভুবনচেতনার প্রসারের কথা বলেছেন কোম্‌ত। পজিটিভিজমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমল লিখেছেন—

'কম্‌ট কহিয়াছেন যে পূর্বোক্তরূপ পরার্থপরতা দ্বারা সমাজের বন্ধন দৃঢ়তর হয়। অন্য কোন প্রবৃত্তির বশবর্তী হইলে তাহা হইবার যো নাই। অতএব নবসমাজের মঙ্গলের জন্য সহানুভূতিকেই যত পারা যায় প্রসর দেওয়া কর্তব্য। কম্‌ট এই কথাই সংক্ষেপ করিয়া কহিয়াছেন যে, প্রীতিই আমাদিগের প্রবৃত্তি। প্রীতি অর্থাৎ ভালবাসা। আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ভালবাস; আপনার জন্মভূমি ভালবাস; তাহাতেও তোমার ভালবাসার খাঁই না মেটে; সমস্ত নরজাতিকে ভালবাস; যদি পার, তবে যতদূর পার, ইতর জন্তুদিগকে পর্যন্ত ভালবাসিলেও ক্ষতি নাই।'[৯]

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার মধ্যে কবির হৃদয়গুহা থেকে বেরিয়ে জগতে আত্মপ্রসারের আনন্দময় অভিব্যক্তির কথা আছে। এর সঙ্গে আছে প্রীতির কথা— আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙিব পাষাণকারা— সবাইকে ভালোবাসা দিয়ে অভিষিক্ত করে নেওয়ার কথা। জীবনস্মৃতিতে এই প্রসঙ্গে তিনি মনের যে প্রতি-ক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, তাও সর্বব্যাপক প্রীতির আনন্দে পূর্ণ। ১৯৩৩-এ 'মানবসত্য' রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ আর-একবার এই বিস্ময়কর আত্মজাগরণের স্মৃতিচারণ করেছেন। এবার বিশ্লেষণ করেছেন অন্যভাবে। তিনি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গকে বলেছেন খণ্ডজীবন থেকে মহামানবলোকে মুক্তি। বদ্ধজীবন থেকে কবিহৃদয়ের বৃহৎজীবনের দিকে যাত্রা। নির্ঝরের যাত্রা সমুদ্রের দিকে।

'সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই-যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে। এই-যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল, এ আহ্বান কোথা থেকে? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে, ভোগ ত্যাগ কিছুই অস্বীকার করে নয়,…মানবধর্ম

সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।'[১০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ দশকে একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছিলেন, তার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'মানুষের ধর্ম'। এ বিষয়ে তিনি অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেন *Religion of Man* (১৯৩১) নামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৩-এ যে কমলা বক্তৃতা দেন তার নাম 'মানুষের ধর্ম'। এই বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন 'মানবসত্য' প্রবন্ধে। ওয়ালটেয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে *Man* (১৯৩৩) নামে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তারও মূল বিষয়টি ছিল এই। প্রবাসীতে (১৩৩৮ আশ্বিন) তিনি 'নরদেবতা' নামে প্রবন্ধও লেখেন। শেষ বয়সের নানা কবিতাতে 'মানুষে'র বিশ্বজনীন রূপ তিনি রচনা করেছেন। স্বভাবতই মনে হতে পারে শেষ বয়সে অর্জিত ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে রচিত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' আরোপ করেছেন।

হয়তো এমন অনুমানের কারণ আছে। তবু মানবধর্মের ভাবটি অপরিস্ফুটভাবে প্রথম জীবন থেকেই তাঁর চিন্তাধারার মূলে ছিল এটাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী কবিতাতে মানুষ এবং মানবমহিমাকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেই এমন মনে হয়। এই মানুষ নিছক জৈব মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ইনি 'নিখিল মানবের আত্মা'। প্রচলিত বিশ্বাসের ঈশ্বর ইনি নন। কোম্‌তের মানবদেবতার সঙ্গে এর মিল অনেকখানি। সম্ভবত কোম্‌তে 'মানবসমাজ'-এর প্রতি যতটা দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সামাজিক রূপটার দিকে ততখানি সংজ্ঞাকে সুনির্দিষ্ট করেন নি। তথাপি 'নিখিল মানবের আত্মা' ব্যক্তি মানুষের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি ও কল্পনার আশ্রয়স্থল। তিনি বলছেন—

'মানুষের এই-যে কল্যাণের মতি এর সত্য কোথায়। ক্ষুধাতৃষ্ণার মতো প্রথম থেকেই আমাদের মনে তার বোধ যদি পূর্ণ থাকত তা হলে তার সাধনা করতে হত না। বলব, বিশ্বমানবমনে আছে। কিন্তু, সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্বমানবমনের মহাদেশ সৃষ্ট, এ কথা বলব না। ব্যক্তিমন বিশ্বমনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়। তাই যদি হত তা হলে যা আছে তাই হত একান্ত, যা হতে পারে তার জায়গা পাওয়া যেত না।'[১১]

বিশ্বমানবমনের অস্তিত্ব অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির বিষয় নয়। যে-কোনো অমানব বা অতিমানব সত্য নয়, সেও মানববুদ্ধিজাত সত্যধারণা। এই সত্য বস্তু বা

মানবজগতের সত্য। বেদান্ত যে নির্বিশেষ সত্যের কথা বলে এ সত্য সে-জাতীয় নয়। এই সত্য-ধারণার সঙ্গে কোম্‌তের পজিটিভিস্টিক প্রত্যক্ষতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের মহামানব যেন কোম্‌তের হিউম্যানিটিরই আর-এক রূপ। এই সাদৃশ্যের কথা একদা রমাপ্রসাদ চন্দ 'মানবধর্মের মর্মকথা' প্রবন্ধে বলেছিলেন।[১২] এই সাদৃশ্যের কথা আরো বেশি করে মনে হয় আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ সংলাপ অনুসরণ করলে।[১৩] রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন— When our universe is in harmony with man, the eternal, we know it as truth, we feel it as beauty.

তখন আইনস্টাইন বললেন— This is purely human conception of the universe.

রবীন্দ্রনাথের মানবজগৎ কেবল যা আছে তারই সমগ্রতা নয়, যা হওয়া উচিত বলে মানববুদ্ধিতে প্রতিভাত তাই নিয়ে। কল্যাণ ও সৌন্দর্যের আদর্শও তো মানববুদ্ধিতেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলেন মানুষ এ পর্যন্ত যা, শুধু তাই নিয়ে থাকলে মানুষের ধর্ম হত অপরিপূর্ণ। 'মূল কথাটা হচ্ছে তার এই বিশ্বাস যে প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্নতাকে পরিপূর্ণ করে আছে অপ্রত্যক্ষ নিখিলতার সত্য। সমগ্রকে উপলব্ধি করবার যে প্রেরণা আছে তার মনে, সেই তার ভূমার বোধ।' সমগ্রের প্রতি আকর্ষণ থেকে জন্মে কল্যাণ ও সৌন্দর্য। তার ব্যাখ্যা কোম্‌তের নেই, কিন্তু বিশ্ব-মানবসমাজের প্রীতি ও কর্তব্যের কথা আছে পজিটিভিজমে। আবার রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ভূমার প্রতি আকর্ষণ, তাকে তিনি বৈদান্তিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা না করে ব্যাখ্যা করেছেন মানবস্বভাব রূপে। তাঁর ভূমা মানবিক ভূমা। মিস্টিসিজমে বিশ্বাস করতেন না বলে কোম্‌তে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন; বস্তুজগৎ এবং মানববুদ্ধিতে একান্ত আস্থা বলে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে (সগুণ ঈশ্বরেও) রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস নেই। এটা সুস্পষ্টভাবেই জানা যায় আইনস্টাইনের সঙ্গে সংলাপে। রবীন্দ্রনাথ যৌবনে লিখিত 'একটি পুরাতন কথা'য় 'অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যোগে'র কথা বলেছিলেন। সে ছিল ঈশ্বরাশ্রয়। এখন সে যোগ হয়েছে মানবাশ্রিত। লক্ষ্য করা যেতে পারে, মানুষের ধর্মের ব্যাখ্যানে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কথা দুটি কোথাও ব্যবহার করেন নি। তিনি অবশ্য বলেছেন—

'আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা এমন কত আত্মা। তারা যে-এক আত্মার মধ্যে সত্য, তাঁকে আমাদের শাস্ত্রে বলেন পরমাত্মা। এই পরমাত্মা মানব-

পরমাত্মা, ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, ইনি আছেন সর্বদা জনে জনের হৃদয়ে।'[১৪]

মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ এবং বেদ থেকে বচন উদ্‌ধৃত করেছেন। সবই তাঁর মনোগত তত্ত্বের প্রেক্ষিকায় প্রযুক্ত। আমাদের সনাতন তত্ত্বব্যাখ্যাতে এর প্রয়োগ ভিন্ন প্রেক্ষিকায়।

১৯৩১ থেকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে থাকেন— এর সূচনা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের জীবনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। বহু মানুষ বহু দেশ বহু জাতি ও বহু সংস্কৃতির সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন। মানুষের কল্যাণরূপ যেমন দেখেছেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা যেমন তিনি দেখেছেন বিশ্বমানব-সমাজের মধ্যে, তেমনি দেখেছেন মানুষের সংকীর্ণ বুদ্ধি যাকে তিনি বলেন অবুদ্ধি, দেখেছেন ধর্ম নিয়ে হানাহানি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ। মানুষের কীর্তিগৌরবে যেমন তিনি গৌরবান্বিত, মানুষের অন্ধ আত্মহননে তেমনি ক্ষুব্ধ। এ-সব মিলিয়ে তিনি মানুষের একটি অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন। তাঁর এই তত্ত্বসন্ধানী স্পৃহা যৌবন-কাল থেকেই ছিল। বস্তুত উনিশ শতকের মনীষীদের এটি একটি মৌলিক প্রবণতা। স্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে গুরুর উক্তি— 'অতি তরুণ বয়স হইতেই এ প্রশ্ন জাগ্রত ছিল, এ জীবন লইয়া কি করিব।' এই প্রশ্নের উত্তর রচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছিলেন ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলন তত্ত্ব। তাতে সমকালের নানা তত্ত্ব নানা জিজ্ঞাসা তাঁর মানবধর্মকে নির্মাণ করেছিল। পজিটিভিজম ইউটি-লিটারিয়নিজম হল তাদের অন্যতম, আর ছিল আমাদের দেশের পুরাণ এবং উপনিষদ। রবীন্দ্রনাথ সেই যুগেরই মানুষ। তিনিও খুঁজেছেন মানুষের ধর্ম। যৌবনে বঙ্কিমের সঙ্গে বিতর্কে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। তখন তাঁর পারিবারিক ব্রাহ্মধর্ম তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করেছিল। আমরা দেখেছি পজিটিভিজম বা প্রত্যক্ষতাবাদ তখন মানবকল্যাণবোধের অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল।

পরে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের জিজ্ঞাসাকে কয়েকটি ধারাবাহিক ভাষণে আলোচনার রূপ দিয়েছিলেন। ১৩১৫ থেকে ১৩২২-এর মধ্যে দেওয়া 'শান্তিনিকেতন' ভাষণ ও বক্তৃতায় তিনি জগৎ ও নীতি নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন। কবির এই দার্শনিক চিন্তাতে ঈশ্বর ব্রহ্ম এসেছেন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিত্যকার ব্রহ্ম-ভাবনায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। নানা ভাবে ব্রহ্মের উপস্থিতি অনুভব করেছেন নিত্যকার কাজে কর্মে আচরণে দিনরাত্রির আবর্তনে ঋতুর বৈচিত্র্যে গ্রহচন্দ্র-তারকার নিত্য পরিক্রমণে, অণুর তরঙ্গলীলায়। মানুষের সুখদুঃখ বেদনা আকাঙ্ক্ষা

প্রবৃত্তির সঙ্গে ব্রহ্মভাবনার যোগ দেখিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের মহত্ব ও ব্যঞ্জনাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের জীবন ব্যক্তিসাধনার মধ্য দিয়ে অখণ্ড-সাধনার অভিমুখী— তার চমৎকার ব্যাখ্যা করে আমাদের জীবনটাকে ব্রহ্মের উদ্দেশে নিবেদিত পূজাপুষ্পের মতো শুচি ও শুভ্র করে তুলেছেন।

'ক্রমে অখণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্বত্র এক বলে দেখবার শিক্ষা মানুষের হল তখন সে জানতে পারল যে যাকে অসামান্য বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্য নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেখবার অধিকার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রয় পেল। তখনই মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশস্ত ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ধর্ম থেকে সমাজ থেকে রাজ্য থেকে মূঢ়তা ক্ষুদ্রতা দূর হতে লাগল।'[১৫]

রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশ্বনিয়মের কথা বলেছেন, সেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। এই জগৎ নিয়মবিধৃত, ক্ষুদ্রতম অণু থেকে সৌরজগৎ, ব্যক্তিমানুষের মন থেকে সমাজমানুষের মন— সর্বত্রই নিয়ম। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মকে প্রতিষ্ঠা দান করেছে, সে নিয়ম শুধু জড়জগতে নয়, জীবজগতেও অব্যাহত। বাংলাসাহিত্যেও তিনটি পর্যায়ে প্রাকৃতিক নিয়মকে ভাবুকেরা স্মরণ করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত করেছেন বাহ্যপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিচারে (১৮৫১), বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন বিদ্যাপতি ও জয়দেব (১৮৭৩) এবং বঙ্গদেশের কৃষক (১৮৭৩)-এ এবং রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন 'নিয়মের রাজত্ব' প্রবন্ধে (১৮৯৯)। বিশ্বজগতে যে মিরাকল নেই সব-কিছুই কার্যকারণসূত্রে বাঁধা— এ বিশ্বাস মানুষ অর্জন করেছে বিজ্ঞানচেতনার প্রসারে। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, যদি কোথাও নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে সেটাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে না ধরে বুঝতে হবে সেখানেও কোনো নিয়মই কাজ করছে, যা এখনও বোধায়ত্ত হয় নি। নিয়ম ছাড়া কিছু থাকতে পারে না, বিজ্ঞান যেমন জড় এবং জীবজগৎকে নিয়মে বদ্ধ করতে চেয়েছে ইউটিলিটারিয়ানরা ও পজিটিভিস্টরা তেমনই মানুষের সমাজনীতি ও কর্তব্যনীতিকে নিয়মবদ্ধ করতে চেয়েছে।

সেই নিয়মের বাইরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করছেন না। বিশ্বজগতের এই মহানিয়মকে অনুধাবন করতে পারাই 'ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্বত্র ব্যক্ত করে দেখবার অধিকারলাভ'। আমাদের এই প্রত্যক্ষ জগতের বাইরে ঈশ্বর নেই। তিনি আছেন এই জগতেই— 'শুধু এই-

টুকু বলাই যথেষ্ট নয়; বলতে হবে এই জগৎই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। জগতের মহা-নিয়মের ধ্যানেই ঈশ্বরধ্যান। বিবেকানন্দ বলেছিলেন বিশ্বের মূলে এক— এরকম চিন্তার প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বস্তুকে একটা সাধারণ নীতির অধীনে আমরা পেতে চাই। বিবেকানন্দ যে অর্থেই বলে থাকুন, রবীন্দ্রনাথ সেই এককে দেখেছেন এই জগতেরই সংযম ও সামঞ্জস্যের মধ্যে। বিশ্বনিয়মের ছন্দে। নিয়মের লঙ্ঘনই বিকৃতি। জড়জগতে যেমন ধর্মের জগতেও তেমনি। তিনি বলেছেন, 'মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে— এই তো তার পাপের মূল এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।' সামঞ্জস্যের কথায় হার্বার্ট স্পেন্সারকে মনে পড়াই স্বাভাবিক। স্পেন্সারের সামঞ্জস্য-তত্ত্বের ভিত্তিতে ছিল বিবর্তনবাদের নীতি।

কোম্‌ত ঈশ্বরকে একেবারে বাদ দিয়েছেন, তার জায়গায় বসিয়েছেন প্রত্যক্ষ জগৎ এবং মানুষকে। রবীন্দ্রনাথ এই জগতেই দেখেছেন ইশ্বরকে। ভক্তের দৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বরের আলাদা সত্তা নেই, এই জগৎই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। এই জগৎকে আমরা বুদ্ধি দিয়ে নিয়মের মধ্যে পাই। নিয়মের মধ্যে পাওয়া মানে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পাওয়া। তাই এই ঈশ্বর-চিন্তাতে কোনোরকম সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নেই। কোম্‌তের পজিটিভিজমও সাম্প্রদায়িকতাশূন্য। রবীন্দ্রনাথ যখন 'মানুষের ধর্ম' লিখেছিলেন তখন তিনি কারো কারো কাছে নিরীশ্বরবাদীরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। তিনি যখন শান্তি-নিকেতন ভাষণ রচনা করেছিলেন, তখন তাঁকে কেউ নিরীশ্বরবাদী ভাবে নি; সর্বত্রই তিনি জগতের মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই প্রত্যক্ষ জগৎকে ছাড়িয়ে অতিলৌকিক জগতের কথা কিংবা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা বলেন নি বরং জগৎকেই বলেছেন ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মকে মানি আর না মানি জগৎকে মানতেই হবে। এটা পজিটিভিজমের কথা। মোহিতলাল একেই বলে-ছিলেন জগৎ ব্রহ্মবাদ— জগৎ আর ব্রহ্ম একই।[১৬]

প্রত্যক্ষ জগৎ আর প্রত্যক্ষ মানুষ, কোম্‌তের পজিটিভিজমের এই ছিল মূল উপজীব্য। প্রত্যক্ষ জগৎ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগৎ। এই পৃথিবী এই প্রকৃতি —এদেরই সৌন্দর্য সুখদুঃখ বেদনার অনুভূতি আর-সব চিন্তাভাবনাকে ম্লান করে দিয়েছে। ছিন্নপত্রে তিনি বলেছিলেন—

'ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি— ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা -সুদ্ধ দু হাতে

আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা -ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা -ভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত!'

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাটি যে তাঁর সারাজীবনের সাহিত্য-প্রেরণার মূলে তা কি আর বলার দরকার আছে? কবিরা জীবনকে ভালোবাসেন, সেই ভালোবাসাতেই শিল্পের সৃষ্টি— এ কথা তো সবাই জানেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনাতে জীবনপ্রেম ঈশ্বরপ্রেমেরই নামান্তর মাত্র, এটাই বিশেষ করে মনে রাখবার কথা। আলাদা করে ঈশ্বরধ্যানের প্রয়োজন নেই। এইজন্যেই নৈবেদ্যে তিনি বলেছেন—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥

কিন্তু প্রত্যক্ষতাবাদের একটি বিশিষ্টতা রবীন্দ্রকবিমানসের মূলে, সেটি আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ সৃষ্টিকল্পনার ক্ষমতা কম কবির মধ্যেই দেখা গেছে। কালিদাস বা ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। কিন্তু তাঁর কল্পনা কখনো যুক্তিধর্মকে অতিক্রম করে নি। সে কল্পনা কখনোই অতিচারী নয়, কিংবা অলৌকিক নয়।

কোম্‌তের প্রত্যক্ষতাবাদ-প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন সাহিত্যের রস সার্থক হয় অলৌকিকতার সৃষ্টিতে নয়, স্বভাবসংগত সৃষ্টিতে। তিনি বলেন—

'দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্যচরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না।'

দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলছেন—

'যদি আমরা কোথাও পড়ি যে, কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।...কিন্তু যদি আমরা পূর্ব হইতে জানিয়া থাকি যে নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুত মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তখন আর আমাদের ভয় বা কুতূহল থাকে না; কেননা আমরা আগেই জানি যে, এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।'[১৭]

বস্তুজগতে মানবজীবনে বিশ্বপ্রকৃতিতে যে অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিত্যনবীনরূপে প্রকাশমান বিজ্ঞানের তত্ত্বে যার প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকল্পনা তাকে মূল সূত্র-রূপে গ্রহণ করেই রূপে ও রূপকে সার্থক হয়েছে। জগতের বস্তুগত সত্য এবং আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই বহুবর্ণে বহু বৈচিত্র্যে রূপায়িত হয়েছে।

বিশ্বের নিত্যচলিষ্ণুতার তত্ত্বটি তিনি অনুভব করেছিলেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনার সময় থেকেই। এই চলার কথা কবি তার পর কতভাবেই না বলেছেন। গতির সত্য কবির সমগ্র কাব্যরচনার পশ্চাৎপটে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পর 'এবার ফিরাও মোরে'-তে মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গধ্বনি শুনতে পাই। পদ্মার প্রতীকে সেই গতি এসেছে, ছিন্নপত্রের লেখায় তার সুর। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটিতে বাজছে তৃণ থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত চিরচলার এবং পেছনে ফেলে যাওয়ার আর্ত হাহাকার। 'বলাকা'তে কবি বিশ্বজগৎ এবং আপন অন্তরের মধ্যে শুনতে পাচ্ছেন চিরচলার আনন্দধ্বনি। 'শুধু ধাও শুধু ধাও উদ্দাম উধাও' এই দুর্নিবার চলা কবিকে করেছে উতলা। 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গে' কবি দেখেন ঋতুচক্র জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তন। তিনি বলেন—

> প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
> নূতন প্রাণের যাত্রাপথে
> জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতার
> নিত্যবোনা চিন্তাজালে।[১৮]

এই গতির সত্যটি কবির অতিলৌকিক কল্পনা নয়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের চিরবহমানতাও অপরোক্ষ অনুভূতি নয়। এটা একটা বস্তুগত সত্য। এই গতিতেই নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি হয়, জীর্ণ যা তারা ঝরে যায়, প্রাণলীলা অব্যাহত থাকে। জগতের এই রূপটিকে বিজ্ঞানই ব্যাখ্যা করেছে। উনিশ শতকটি বস্তুতই গতি-ভাবনার যুগ ছিল। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি পরিবর্তন এবং বিবর্তনের ভাবনাটি ভাবুকচিত্তকে অধিকার করেছে। বিশ্বজগতের গতিধারা আসলে সেকালের প্রাকৃতিক নিয়মেরই একটি দৃষ্টান্ত। এই পরিবর্তন ও বিবর্তন— এটি বিশ্বনিয়মেরই একটি রূপ। কোম্‌ত সভ্যতার বিকাশে এই নিয়মটিকে দেখিয়েছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সার এই বিবর্তনবাদকে জড় এবং জীবের জগতে, নীহারিকাপুঞ্জ থেকে মানবসৃষ্টি পর্যন্ত, বর্বর যুগ থেকে শেকস্‌পীয়র পর্যন্ত সমানভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব বলে মনে করতেন।[১৯] উনিশ শতকে ডারউইন জীবজগতে বিবর্তনের যে বিজ্ঞান রচনা করেছিলেন, তার মূল মানুষের চিন্তায় অনেকদূর

পর্যন্ত ছড়িয়েছে। তাঁর সব বক্তব্যই নিঃসংশয়িতভাবে সত্যরূপে প্রমাণিত না হলেও তাঁর গতিধারণাটি আমাদের চিন্তায় যে যুগান্তর এনেছে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি দেখিয়েছেন প্রাণের অব্যাহত ধারা। তাতে ব্যক্তির অবলুপ্তি ঘটলেও সমষ্টি থাকে চিরজীবী। উনিশ শতকের বিবর্তনভাবনা দিয়েই টেনিসন তাঁর শোককাব্যে লিখেছিলেন

So careful of the type she seems
So careless of the single life :

রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও শুনতে পাই মহাজীবনের কথা, নব নব রূপের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার কথা। জন্মান্তরবাদ বিজ্ঞানে স্বীকৃত নয়, কিন্তু প্রাণের রূপান্তর বৃহত্তর অস্তিত্বের পটভূমিকায় স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতিকে মেনেই প্রাণতত্ত্বটিকে কবি-কল্পনার বাহন করেছিলেন। 'পত্রপুট' কাব্যের 'পৃথিবী' কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় শেষজীবন পর্যন্ত জাগতিক বিবর্তনের ভাবনা কবির অন্তরে কতখানি দৃঢ়মূল ছিল। যে নীতিতে নীহারিকাপুঞ্জ থেকে মানবজীবন পর্যন্ত বিবর্তিত হয়ে আসছে সেই নীতিচালিত বিশ্বের প্রতি অনুরাগ এবং তার ক্ষণসৌন্দর্যকে কল্পনা দিয়ে উদ্‌ভাসিত করে তোলাই তাঁর কবিজীবনের মর্মকথা।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়েই তাঁর কবিজীবনের উন্মেষ। যে সময়ে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লিখে তাঁর কবিজীবনের মুক্তি ঘটিয়েছেন, সে সময়কার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

'সদর স্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর-একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্‌স্‌লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ইয়ার, নিউকোম্ব প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম।'[২০]

এই বিজ্ঞানচেতনা তাঁর মনে জাগতিক নীতিনিয়মের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। সেইজন্যেই কল্পনাতে তিনি কখনও অতিচারী হন নি। এই প্রত্যক্ষ ভুবন কবির চেতনায় মিশে গিয়েছে। মর্ত্যপ্রেমিক জগৎকে ভালোবেসেছেন তার শুভ অশুভ মিলিয়ে, আলো অন্ধকার জন্মমৃত্যু উত্থান পতন নিয়ে তার সমগ্র রূপটিকে—

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;

প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনার সময় থেকে প্রত্যক্ষ জগতের নীতি-নিয়মের প্রতি অনুরাগ কবিচিত্তে দৃঢ়মূল হয়ে গেল। তেমনি রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকৃতি অনুযায়ী মানবধর্মের প্রতি আকর্ষণের সূচনাও হল তখন থেকেই। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মহাসমুদ্রকেই বলেছেন মহামানবলোক। তিনি নিজেই পরবর্তী পর্যায়ের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি।

চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।...

মানুষের এই চিরন্তন যাত্রা পরিপূর্ণ মানবলোকে। অনেক অপূর্ণতা ও নিষ্ফলতাকে উত্তীর্ণ হয়ে, অনেক কণ্টকস্তূপে পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত করে মানুষ যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলেছে। পূর্ণ মানবতাকে তিনি কখনও বলেছেন মহামানব। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী করবার জন্য হিউম্যানিটির নাম রাখতে চেয়েছিলেন 'নারায়ণী'।[২১] মানবদেবতাকেই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে বলা হয়েছে নারায়ণ। প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন—

'নর শব্দের নিত্যসান্নিধ্য এবং নরোত্তম শব্দের সঙ্গে অভিন্নতার স্বীকৃতি থেকে স্বতঃই মনে হয় নরত্বকে আশ্রয় করে বিশ্বনিয়ন্তৃশক্তির যে দেবোপম প্রকাশ, 'নারায়ণ' শব্দের দ্বারা তাকে সংজ্ঞিত করাই ছিল ভারতীয় ভাবকল্পনার মূল অভিপ্রায়।'[২২]

নারায়ণ এবং মানবদেবতার কথা এর পর রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রায়ই ঘুরে ঘুরে এসেছে। কবি যখন বলেন—

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার
মানুষের নারায়ণে তবুও করো না নমস্কার।

তখন এখানে যে কবি সেই মানবদেবতা-হিউম্যানিটিকেই উদ্দিষ্ট করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। 'ভারততীর্থ' কবিতাতেও তিনি নরদেবতারই বন্দনা করেছেন। এই নরদেবতাই কবির জীবনের শেষ পর্যায়ে মহামানবরূপে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। মানুষের ধর্মে তারই ব্যাখ্যান।

কোম্‌তের চরম লক্ষ্য যেমন হিউম্যানিটি, রবীন্দ্রনাথেরও চরম লক্ষ্য তেমনি মহামানব। তাঁর জীবনে প্রথম থেকেই মানবলোকের সান্নিধ্যে আসবার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও সেই মানব-কল্পনা তখনও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি। এ ধারণা পূর্ণতর হয়েছে বিশ্বের নানা জাতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে। মহামানবের সাগরতীরে যে-নরদেবতার বন্দনা তিনি করেছেন, তখনও পর্যন্ত সে-নরদেবতা অনেকটা নামমাত্র। গীতাঞ্জলিতে নরদেবতা নারায়ণকে তিনি দেখেছেন সাধারণ শ্রমজীবী ও কর্মজীবী মানুষের মধ্যে। তার পর মহামানবের ধারণা আরো সত্য ও ব্যাপক হয়েছে। ভারতবর্ষে যে ঐক্যসাধনার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, তাঁর বিদেশ ভ্রমণের সূত্রে সেই ঐক্যসাধনা অধিকতর অর্থবহ হয়েছে। সেখানে তিনি দেখেছেন রাষ্ট্র-তন্ত্র। রাষ্ট্রতন্ত্র সে দেশে সর্বমানবিক ঐক্যের পথে বাধা। তাই তিনি বলেছেন—

Man, the person, must protest for his very life against the heaping up of things where there should be the heart, and systems and politics where there should flow living human relationship.[২৩]

মানুষের মিলবার পক্ষে বাধা রাষ্ট্রগত স্বাতন্ত্র্য। যে মহামানবের সত্যকে কবি অনুভব করতে চান, সে সত্য খণ্ডিত হচ্ছে রাষ্ট্রের বাধায়। ভারতবর্ষে মহামানবের সত্য যেমন খণ্ডিত হয় ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভেদের বাধায়। বিদেশে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, তার মূল মর্ম ছিল হিউম্যানিটি বা মানবতন্ত্র। হেমন্তবালা দেবীকে তাঁর মানবধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'এবার ফিরাও মোরে'-র অংশ উদ্‌ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'আমার ঠাকুরের ধ্যান তোমার কাছে রাখলুম সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মাঝখানে, সকল বীরের সকল তপস্যায়, সকল প্রেমিকের সকল ত্যাগে। এসব লেখা রবীন্দ্রনাথের নয় তার গভীরতম মর্ম্মস্থানে যে কবি আছে তারই, সে কবির আসন সকল দেশেই, সকল মানুষেরই অন্তরে— (য়ুরোপেও)।'[২৪]

রবীন্দ্রনাথের এই মহামানবতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সন্ত-সাধক এবং বাউলদের নরদেবতার পূজা। এঁরা বাইরের অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে মানেন না। মানুষের মধ্যে যে দেবতা উদারদৃষ্টিতে অভেদরূপে প্রতীয়মান হন এঁরা তাঁরই আরাধনা করেন। রবীন্দ্রনাথ যে সন্তসাধকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ এই সাধকদের গানে ও বাণীতে আছে ভেদহীন মানুষের কথা।[২৫] 'The Religion of Man'-এর ভাষণে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন এই মানুষের ধর্মই চিরন্তন ধর্ম। এই-সব সাধক বহুকাল থেকেই এই ধর্মের কথা বলে এসেছেন। তিনি বলছেন এই-সব সাধক bore in their life the testimony of their intimacy with the Person who is in all persons, of men the formless in the individual forms of men. Rajjab, a poet-saint of mediaeval India, says of man :

God-man (nara-narayana) is thy definition, it is not a delusion but truth.

তার পর রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

All these are proofs of a direct perception of humanity as an objective truth that rouses a profound feeling of longing and love.[২৬]

আমাদের বোধহয় বলা উচিত রবীন্দ্রনাথ এই সাধকদের বাণীকে গ্রহণ করেছেন তাঁর মানবতন্ত্রের অনুকূলতার দিক দিয়ে। বাউলের 'মনের মানুষ' আর সহজিয়া সাধকের 'মানুষ সত্য'কে রবীন্দ্রনাথের মানববাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক করে দেখা যায় না। তাদের একটা নিজস্ব মিষ্টিক পন্থা আছে, যা কোম্‌ত বা রবীন্দ্রনাথের নাই। কোম্‌ত একেবারেই মিষ্টিসিজমকে বর্জন করে মানুষের একটা বিশ্ব-সামাজিক মূর্তি গঠন করেছিলেন, আত্মকেন্দ্রিক মিষ্টিক সাধনা দ্বারা সেই হিউম্যানিটি অনুধ্যেয় নয়। রবীন্দ্রনাথের মানব মানবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে গঠিত হলেও অনেকটা ভাবময়, বাউলের মনের মানুষের মতো। বাউলদের 'মনের মানুষ' বস্তুত ঈশ্বরেরই নামান্তর। তারা এই সাধনা দিয়ে মুক্তি খোঁজে। কোম্‌ত বা রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মে সেই অর্থে ঈশ্বর নেই, আছেন হিউম্যানিটি ও মানবদেবতা।

এই-সব সাধনা দেউল মন্দির মসজিদ নিয়ে গড়ে ওঠে নি। আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে এদের ধর্ম চিহ্নিত হয় নি বলে মানুষের মনে মানুষের বিভেদও রচিত

হয় নি। এই দিকটাই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর মানুষের ধর্মের সমর্থন তিনি এখানেই পেয়েছিলেন। মানুষমাত্রই যে পবিত্র এবং এক— এই বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ বাউলের সাধনার মহত্ত্বকে খুঁজে পেয়েছিলেন। 'পত্রপুটে'র কবিতায় কবির আকুল প্রার্থনা—

> তাকে বলেছি হাতজোড় করে
> হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
> পরিত্রাণ করো
> ভেদচিহ্নের তিলকপরা
> সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
> হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
> তামসের পরপার হতে
> আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

উপনিষদের ঋষি তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ময়কে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ জাতিবর্ণভেদের তমসার পরপারে দেখেছেন সর্বকালের মানুষকে। ইনি ব্রহ্ম নন, ইনি মানবদেবতা, নারায়ণ।

উল্লেখসূত্র

১. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কোমতদর্শন, বঙ্গদর্শন (পৌষ, ১২৮১) নানা প্রবন্ধে সংকলিত।
২. মানুষের ধর্ম (১৯৩৩) ২য় অধ্যায়, র.-র. ২০, পৃ. ৩৯৩
৩. 'বাংলায় ধ্রুববাদ', কৃষ্ণনগর কলেজ শতবর্ষোৎসব স্মারকগ্রন্থ (১৯৪৪), পৃ. ৬; বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ (বিদ্যাভারতী সংস্করণ ১৩৭৩), পৃ. ১০১
৪. প্রিয়রঞ্জন সেনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত।
৫. ভারতী, কার্তিক ১২৯২, পৃ. ৩০৭
৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৩ শক, কার্তিক, 'ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্মনীতি' এবং ১৮০৬ শক ভাদ্র, 'নূতন ধর্মমত'। দ্বিতীয়টি বঙ্কিমের ধর্মমতের সমালোচনা।
৭. 'একটি পুরাতন কথা', ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৯১
৮. জীবনস্মৃতি, প্রভাতসংগীত অধ্যায়।

৯. পজিটিভিজম, ভারতী, কার্তিক ১২৯২, পৃ ২৯৭
১০. মানবসত্য, দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট, 'মানুষের ধর্ম', র.-র. ২০, পৃ. ৪২৫-২৬
১১. মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), দ্বিতীয় অধ্যায়, র.-র. ২০, পৃ. ৪০৩-৪০৪
১২. দ্রষ্টব্য, রমাপ্রসাদ চন্দ, 'মানবধর্মের মর্মকথা', বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০
১৩. *The Religion of Man*, Appendix (1932)
১৪. মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), পৃ. ৪৮
১৫. 'স্বভাবলাভ', শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) ১৪, পৃ. ৪০৬
১৬. মোহিতলাল মজুমদার, কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য ২য় (১৩৬১), পৃ. ৭৫। 'পাশ্চাত্য কবিগণের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, রবীন্দ্রনাথের ওই জগৎ-ব্রহ্মবাদে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদই কিরূপ রসবাদ বা আর্টবাদে পরিণত হইয়াছে।'
১৭. বঙ্কিমচন্দ্র, প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮০), দ্রষ্টব্য : 'বিবিধ প্রসঙ্গ'।
১৮. নটরাজ।
১৯. He was fired with the thought of a series of works in which he would show the evolution of matter and mind from nebula to man, and from savage to Shakespeare. —Will Durant, *The Story of Philosophy*, Chap. VIII. 'The Development of Spencer'.
২০. জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপি, দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি (১৩৬৩), পৃ. ২১৬
২১. পুরাতন প্রসঙ্গ (বিদ্যাভারতী ১৩৭৩), পৃ. ১০১
২২. 'রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২, পৃ. ৪২
২৩. 'Nationalism in the West', *Nationalism*, p. 43.
২৪. হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত, পত্র ২৪, দ্র. চিঠিপত্র ৯, পৃ. ৬১
২৫. রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের সমর্থনে এই সাধকদের সাধনার পরিচয় দিতে ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন— The human body, despised by most other religions, is thus for them the holy of holies, wherein the Divine is intimately enshrined as the Man of the Heart. And in this wise is the dignity of Man upheld by them.
২৬. *The Religion of Man*, Chapter VII.

সমকালীন ভাবুক বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সমকালীন হলেও দুজনের মধ্যে যোগাযোগের উল্লেখ তেমন পাওয়া যায় না। নরেন্দ্রনাথ যখন সন্ন্যাস নেন নি, তখন তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের যোগ ছিল। সেই সূত্রে ঠাকুর পরিবারে তাঁর যাতায়াত ছিল, এমন কথা শোনা যায়। ব্রাহ্মসমাজে তিনি রবীন্দ্রনাথের রচিত গান গাইতেন। এ-সব বিষয়ে এবং পরবর্তীকালেও দুই মনীষীর পারস্পরিক যোগ নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান হয়েছে। বর্তমান আলোচনা এইদিক নিয়ে নয়। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই বাঙালি সমাজের উপর প্রভাব গভীর। যে-সব চিন্তাসূত্র বাঙালি সমাজকে প্রভাবিত করেছে, সেই সূত্র ধরে দুজনের মধ্যে তুলনাত্মক রেখাচিত্র অঙ্কন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তাঁর উনচল্লিশ বৎসরের জীবনকালে মাত্র নয় বছরই ছিল তাঁর যথার্থ কীর্তিকাল। ১৮৯৩-এর শিকাগো ধর্মসম্মেলনের পরেই বাঙালি বিবেকানন্দকে চিনতে পারে। তার আগে তাঁর জীবন কেটেছে নিভৃত সাধনায়। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ একটি সন্ন্যাসীগোষ্ঠী গড়লেন। তার কথা বাইরের বিশেষ কেউ জানতেন না। বিবেকানন্দ তখন থেকে দীর্ঘ পর্যটনে বেরিয়ে একবারে আত্মপ্রকাশ করলেন চিকাগোর সম্মেলনে। এই সময় থেকেই তিনি দেশবাসীর কাছে পরিচিতি হলেন। বিদেশে এবং দেশে তাঁর অসাধারণ ওজস্বিতাপূর্ণ বক্তৃতা সমগ্র দেশবাসীকে সহজেই আকর্ষণ করে নিল। স্বদেশী বিদেশী নানা ভক্ত তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। আসমুদ্র-হিমাচল তিনি পরিক্রমণ করেছেন, আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনলেন। ধনী-দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র উচ্চনীচ সকলের মধ্যে ঐক্যবোধ সঞ্চার করে ভারতীয় জাতিগঠনে সহায়তা করলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। আজ তার বহু শাখা নানাদেশে ছড়িয়ে সেবায় ও কর্মে ভারতচিত্তকে স্পর্শ করছে। বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে এ-সব কথা পুনরুক্তি মাত্র। তবু মাত্র নয় বছরের মধ্যে তিনি যে বিস্ময়কর কর্মপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন, সেটা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কী করছিলেন ?

১৮৯৩ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রায় তিরিশখানা কাব্য, নাটক ও গদ্যপ্রবন্ধ বেরিয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২) পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বরমাল্য দান করেছিলেন। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের নতুন পরীক্ষা। প্রভাতসংগীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০) কাব্যগ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত করেছে। বউঠাকুরানীর হাট (১৮৮০) এবং রাজর্ষি (১৮৮৭) উপন্যাস দুটিতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ-সময়ের নিজের মনোজীবনের কথা 'জীবনস্মৃতি'তেই লিখে গিয়েছেন। এই সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কাজের ভার নেওয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বাইরের জীবনের সঙ্গে তেমন ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন নি। বিশ্বজীবনের সঙ্গে মিলিত হবার অনতিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা বাধামুক্ত হয়েছে প্রভাতসংগীতে। তিনি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লিখলেন। তাতে দেখা গেল কবি মানব-সংসারের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এ-সময়ের সাহিত্য সৌন্দর্যসন্ধানী কবিমনের প্রকাশ। এই আর্টের সঙ্গে গভীরতর জীবনজিজ্ঞাসার সম্পর্ক কম। তখনও লেখার মধ্যে বাস্তব-জীবনের ছায়া পড়ে নি। প্রেম ও সৌন্দর্য, কবিমনকে স্বপ্নাতুর করেছে, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সেখানে নেই। পরবর্তীকালে পদ্মাবক্ষে ভ্রমণের সময় তিনি মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনের মাঝখানে এসেছিলেন। বাংলার পল্লীর দারিদ্র্য সংস্কার প্রেম ভালোবাসার অপূর্ব ছবি তিনি ফুটিয়েছেন তাঁর ছোটোগল্পে। বিবেকানন্দ যখন প্রবল আত্মিক উৎকণ্ঠা নিয়ে পথে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, অবশেষে প্রবল জাতীয়তা ও স্বধর্মবোধে উদ্দীপিত হয়ে বিশ্বসমাজের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ তখনও কবিতার জগতে বদ্ধ। মানসীতে তিনি বিশ্লেষণ করছেন প্রেমের গূঢ় রহস্য, 'সোনার তরী'তে রচনা করছেন সৌন্দর্যের স্বর্গলোক।

সৌন্দর্যলোক রচনা করে যে তাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্তি হচ্ছিল না, তার প্রমাণ কবি নিজেই রেখে গেছেন 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। কবিতার রচনাকাল মার্চ ১৮৯৫। বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা এর প্রায় দেড় বছর আগে। রবীন্দ্রনাথ যখন এ-কবিতাটি লেখেন তখন বিবেকানন্দ বিদেশে। তাঁর কীর্তির বিবরণ দেশে এসে পৌঁছচ্ছে। বিবেকানন্দের প্রবল আবির্ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই কবিতারচনার কোনো যোগ ছিল কিনা কোনো প্রমাণসহযোগে সে কথা বলা

যাবে না। কিন্তু কবি যে কল্পনার রাজ্য থেকে বাস্তবের জগতে আসবার ব্যাকুলতা অনুভব করছেন তার ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট লক্ষ্য করবার মতো অবশ্যই। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি বলছেন—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

এই কবিতার গোড়াতেই সেদিনকার বাস্তব-সংসারের যে-ছবি কবি এঁকেছেন, তার মতো প্রত্যক্ষ চিত্র বাংলা সাহিত্যে অল্পই আছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিবেকানন্দের মতো ও-ভাবে কর্মপ্রয়াসে ব্রতী হওয়া সম্ভব ছিল না। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে যা সম্ভব ছিল, কবির পক্ষে তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে আর-একভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে। কথা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), কল্পনা (১৯০০)-তে কবি আমাদের নিয়ে গেছেন প্রাচীন ভারতের উপনিষদ কালিদাসের যুগে, মধ্যযুগের আত্মত্যাগমূলক আদর্শ-কাহিনীতে। এ-সব কাব্যের মধ্যে তিনি সেই কল্পনারই রমণীয় জগৎসৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এ-কল্পনা আর সন্ধ্যা-সংগীত, প্রভাতসংগীত, মানসীর আত্মময় সৌখিন গুঞ্জন নয়। এ-সব কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এল এক গভীরতা যা পূর্বের কাব্যে ছিল না। ভারতীয় জীবন ও আদর্শের ছবি ফুটিয়ে তুললেন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ জীবনে যা করতে চেয়েছিলেন সেই প্রবল আত্মপ্রত্যয় এবং জাতীয় গৌরববোধের সুর ধ্বনিত হল কাব্যে। জীবনের উচ্চ আদর্শ মহৎ ত্যাগ মানবপ্রেমের উদাত্ত কল্পনা কবিকে জীবনাভিমুখী করেছে।

শুধু এই রোম্যান্টিক কল্পনার ভিতর দিয়ে নয়, তাঁর সমকালীন সমাজ ও জীবন সম্পর্কেও প্রখর সচেতনতা বিভিন্ন কবিতায় পাওয়া যায়। তিনিই তো একটি কবিতায় নিরীহ শান্ত প্রকৃতির বাঙালিকে 'গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া' করে দিতে বলেছেন। এরকম নির্জীব কর্মহীন নিরুদ্যম জীবনের প্রতি তীব্র ধিক্কার বিবেকানন্দের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠকেই মনে করিয়ে দেয়। এ-সময়ের বিভিন্ন গদ্য-রচনাতেও কবির এই মনোভাবের পরিচয় আছে। তাঁর সেই-সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে 'সমাজ' বইটিতে। 'সমাজ' ১৯০৮-এ প্রকাশিত কিন্তু এর প্রবন্ধগুলি বিগত প্রায় পনেরো বছরের বেশি সময়ে 'সাধনা' ও 'ভারতী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এ-সব প্রবন্ধের কতকগুলিকে বলা যায় রাজনৈতিক। বেশির ভাগই সমাজ বিষয়ে। আমাদের তৎকালীন হিন্দু-সমাজের নানা সংস্কার, রীতিনীতির সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।

বিবেকানন্দের রচনা 'উদ্বোধন' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশে তিনি প্রধানত বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর সেই-সব বক্তৃতায় বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন সর্বমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ এবং নৈতিক ভিত্তি ছিল প্রধানত তাঁর আলোচ্য। সে দেশে তিনি ভারতীয় সমাজ-জীবনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেন না। স্বদেশে তিনি যে-সব বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে সংগঠনমূলক কাজে তিনি সবাইকে আহ্বান করেন। ক্ষুদ্রতা, দীনতা ও সংকীর্ণতা বর্জন করতে বলেন। মোটের উপর তার মূল কথাটি ছিল নবভারত-গঠনে যুবশক্তির উদ্‌বোধন। প্রসঙ্গত সমালোচনা করলেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দেশের সামনে কর্মপ্রেরণা জোগানোয়। 'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনায় তিনি বলছেন—

'যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘনঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই— সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি— আর চাই— আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এ-বিষয়ে পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি হিন্দু-সমাজের নানা ক্ষুদ্র আচারের সমালোচনা করেছেন। এই সমস্ত আচার-সংকীর্ণতা সমাজকে বদ্ধ করে রেখেছে, মনুষ্যত্ব-বোধকে লুপ্ত করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছিল সংস্কারের আহ্বান, বিবেকানন্দের ছিল কর্মের আহ্বান। গভীর জাতীয়তা-বোধ এবং ঐতিহ্যপ্রীতি বিবেকানন্দের মূল প্রেরণা। এজন্য তাঁর ভাষণে এবং লেখায় ইতিহাসদৃষ্টি সর্বত্র অব্যাহত।

এ বিষয়ে তুলনা করবার মতো লেখা বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ড। বিবেকানন্দের বই দুটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'উদ্বোধনে' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে ১৮৯৮ থেকে ১৯০১-এর মধ্যে। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ প্রথম পড়েন চৈতন্য লাইব্রেরির এক বিশেষ অধিবেশনে এবং স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন ১৮৯১-তে।[১] ১৮৯০ সালের আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যান, নভেম্বর মাসেই ফিরে আসেন। এ-সময় বিবেকানন্দ এদেশেই পর্যটনরত।

দুজনেরই লেখার উপলক্ষ ছিল পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ।

দুজনেই দেখেছেন ভারতবর্ষের শান্ত জীবনযাত্রায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের কর্মচঞ্চল সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষের নিরুদ্যম অতীতস্বপ্নমগ্ন স্থিতিশীল সভ্যতার তুলনা করছেন। প্রাচীন হিন্দুদের অভিমানে বর্তমানের প্রয়োজন বাঁচিয়ে চলতে গেলে জাতি হিসাবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলছেন—

'এখন সমস্ত জাতিকে রক্ষা করতে হবে, কেবল টিকি এবং পৈতেটুকুকে নয়। আপনার সমগ্র মনুষ্যত্বকে মানবের সংস্রবে আনতে হবে, কেবল প্রাণহীন কঠিন ব্রহ্মণ্যের মধ্যে তাকে আগলে রেখে অজ্ঞতা এবং অন্ধ দাম্ভিকতার দ্বারা তাকে বনেদি বংশের অত্যন্ত আদুরে ছেলেটির মতো স্থূল এবং অকর্মণ্য করে তুললে আর অধিক দিন চলবে না!'[২]

রবীন্দ্রনাথ বলছেন বিদ্রূপ করে—

'আবার আমরা বাঙালিরা অধিকাংশই চিন্তাশীল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে 'স্বাধীন'-চিন্তাশীল। স্বাধীন চিন্তার অর্থ এই— যে চিন্তার কোনো অবলম্বন নেই; যার জন্যে কোনো বিশেষ শিক্ষা বা সন্ধান, প্রমাণ বা দৃষ্টান্তের কোনো আবশ্যক করে না। আর সকল প্রকার অপবাদই আমাদের সহ্য হয়, কিন্তু চিন্তা সম্বন্ধে কারো সাহায্য গ্রহণ করেছি এ অপবাদ অসহ্য।···প্রচলিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের সঙ্গে যতই অনৈক্য হবে আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও ততই স্বাধীনচিন্তাসম্পন্ন বলে সমাদৃত হবে; এবং যতই আমরা অধিক চক্ষু মুদ্রিত করতে পারব, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ততই আমাদের সমধিক পারদর্শিতা লাভ হবে।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের লক্ষ্য ছিল সেকালের দিনে আর্যামির ও হিন্দুত্বের অভিমান। এ বিষয়ে নানা বাদবিতর্ক তখনকার সাময়িক পত্রে ছড়িয়ে আছে।[৪] বস্তুত তখনকার দিন ছিল প্রাচ্যাভিমান ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের মধ্যে দোলা-চলতার দিন। এজন্য তখনকার লেখকরা দুই সভ্যতার তুলনা করতে ভালোবাসতেন। বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' লিখেছিলেন এই পটভূমিতেই, বিশেষ করে য়ুরোপ থেকে ফেরার পর। তিনিও স্বভাবতই লক্ষ্য করেছিলেন য়ুরোপের সভ্যতা জঙ্গম সভ্যতা, গতিশীলতা ও কর্মপ্রবণতা তাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশের সমাজ অনেকটা নিষ্ক্রিয়।—

'আমাদের কথাটা কি? আর্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস করে শস্যাদি উৎপন্ন করে শান্তিতে স্ত্রীপরিবার পালন করতে পেলেই খুশী। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল চালাচ্ছেন এবং সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিৎও তিনি।

ঋষি, মুনি, যোগীর অভ্যুদয়— গোড়া থেকে ; তাঁরা প্রথম হতেই জেনেছেন যে সংসারটা ধোঁকা।'[৫]

দুই সভ্যতার প্রকৃতি একইভাবে দুজনের কাছে প্রতিভাত হলেও দুজনের মনোভাবের পার্থক্য আছে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার গতিপ্রকৃতিকে ইতিহাসের তথ্য দিয়ে বিবৃত করেছেন। সেইসঙ্গে তাদের সভ্যতার কয়েকটি মূল গ্রন্থি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য সমাজের মূল প্রকৃতি ও ভারতীয় সমাজের মূল প্রকৃতি এবং সেই সূত্রে দুই সমাজের আচার-বিচার-অভ্যাসেরও তুলনা করেছেন। বিবেকানন্দ বলছেন—

'প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবন ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতিনীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড় বেশি এসে যায় না ; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।'[৬]

বিবেকানন্দ নির্জীব সমাজে প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছেন তার স্বজাতীয়ত্ব রক্ষা করে। বর্তমানে নিষ্ক্রিয় এই সমাজেও বহু মহৎ আদর্শ এবং সজীব চিন্তা ছিল। বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। ইংরেজ চরিত্রের ব্যাবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান। হিন্দুর আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা— 'মুক্তি'। ধর্মেই এ-জাতির প্রাণ। 'ধর্ম' কথাটার অর্থ তিনি করেছেন কর্ম ও চিত্তশুদ্ধি। 'ধর্ম' হচ্ছে কার্যমূলক।— যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ সে 'ধার্মিক'।'[৭]

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, তখন এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেন নি। কিন্তু এই কথাটা তিনিও বলেছেন পরে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (১৩০৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, যাহা মানব-সাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল, তখন ধর্ম তাহাকে প্রতিঘাত করিল।' প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একমত হলেও রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মানবধর্ম উচ্চতর। সেই ধর্মকে রক্ষা করতে না পারলে স্বজাতিধর্মও আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের এ কথা বলার ঐতিহাসিক কারণ ছিল। স্বজাতিধর্মানুরাগের

আতিশয্যে য়ুরোপে ন্যাশনালিজম্ আদর্শের প্রসার ঘটেছে। তিনি দেখেছিলেন য়ুরোপে ন্যাশনালিজমের প্রসার কেমন সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে। বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দশকে 'নেশন' বা জাতি নিয়ে পত্রপত্রিকায় আলোচনা প্রায়শ চোখে পড়ে। ভারতবর্ষ একটা জাতি কি না— এ নিয়ে বিতর্ক। অনেকেই য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়ে সেই সংজ্ঞা দিয়ে ভারতবর্ষকে বিচার করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধের সমকালীন। এই বিতর্কের দিনে বিবেকানন্দ স্বজাতি ধর্মরক্ষার উপরে সবটুকু জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর লেখা অনুসরণ করলে দেখা যায় তিনি 'নেশন' শব্দটা ব্যবহার করছেন না— 'জাতি' শব্দই ব্যবহার করছেন। 'নেশন' শব্দটা রাষ্ট্রতান্ত্রিক। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বলেছেন য়ুরোপীয় সভ্যতা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক, ভারতীয় সভ্যতা সমাজকেন্দ্রিক। য়ুরোপের ওই সভ্যতাই নেশনের জন্ম দিয়েছে। বহুজাতিক ভারতবর্ষে নেশনের সৃষ্টি হয় নি। এ সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে। বিবেকানন্দ জাতিত্বের কথা বলেছেন, জাতি ঠিক 'নেশন' নয়। রবীন্দ্রনাথ জাতির উপরে স্থান দিয়েছেন উচ্চতর ধর্মকে। বিবেকানন্দও ভারতীয় জাতির ধর্মপ্রকৃতির লক্ষণই স্পষ্ট করে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যার কথা বলতে গিয়ে মনুসংহিতার বচন উদ্‌ধৃত করেছেন, 'ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।' বিবেকানন্দের ধর্মও এই উচ্চতর মানবধর্ম।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রসঙ্গ স্বভাবতই এসে গিয়েছে। বিবেকানন্দ যেমন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'বর্তমান ভারত' বই লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খানিকটা য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির বিপরীতমুখী। ভারতবর্ষের শান্ত প্রকৃতি, ত্যাগের আদর্শ, কঠোর কৃচ্ছ্র ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা— এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই কবি গর্ববোধ করেছেন। এ-সব দিক দিয়ে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে একমত। বিশেষ করে 'নববর্ষ' (১৯০২) প্রবন্ধে 'ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে'— এই কথা ব'লে কবি বলছেন—

'বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, আমাদের চরিত্র ভগ্নবিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।'

ভারতবর্ষের এই ত্যাগের আদর্শে বিবেকানন্দ ছিলেন মুগ্ধ যদিও নৈষ্কর্ম্যে তিনি ছিলেন ক্ষুব্ধ। রবীন্দ্রনাথের মতে 'সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়— তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়।' বিবেকানন্দের আবির্ভাবের আগে রবীন্দ্রনাথের যে-অভিমত আমরা পেয়েছি য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে, বিবেকানন্দের উপস্থিতির পর সে অভিমতের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। বিবেকানন্দের প্রত্যয়দৃঢ় স্বদেশভাবনাই তার কারণ কিনা জানি না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কয়েকটি অমূল্য চিন্তাসূত্র দিয়েছেন। নেশনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছিলেন, ইতিহাস সব দেশের একই প্যাটার্নে হতে পারে না। ভারতে অজস্র বৈচিত্র্য। বিভিন্ন যুগে নানা জাতি ভারতবর্ষে এসে এখানকার জনসমাজে মিশে গিয়েছে, কিন্তু এই বিরাট দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই বৈচিত্র্যকে নিয়েই ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষের প্রতিভা হচ্ছে সমন্বয়ের প্রতিভা। বিচিত্রকে নিয়ে একসত্তা। তাকে তিনি বলেছেন বিচিত্রের মধ্যে এক। এই তত্ত্বটি বিবেকানন্দ বিশেষ করে ব্যাখ্যা করেছেন বেদান্তের আলোচনায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরিণামবাদ অধ্যায়ে তিনি এই তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন—

ভারত ছাড়া অন্যত্র সকল দেশের ধর্মে ছিল এই যে— দুনিয়াটা সব টুকরা টুকরা, আলাদা আলাদা। ঈশ্বর একজন আলাদা, প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা···ভগবান ঐরকম আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।

জ্ঞান মানে কি না, বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা, তফাত বলে আপাতত বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে ; এরই নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

বিবেকানন্দ-প্রদত্ত বেদান্তের এই সূত্রটিকে বড়ো চমৎকার করে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা ভারতের বহু বৈচিত্র্যকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে অন্তর্নিহিত ঐক্যকে মেনে নেওয়া হল। বিবেকানন্দের ইতিহাস-ব্যাখ্যা অবশ্য তথ্য ও দৃষ্টান্ত -নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিধারায় বিধাতার অভিপ্রায়কে রূপ পেতে দেখেছেন। বাহির থেকে বহু মানুষের ধারা যে এ দেশে এসেছে, তারা কোনো অদৃশ্য

অনুচ্চারিত আকর্ষণে ভারতবর্ষে এসে মহামানবের সাগর গড়ে তুলেছে। এবিষয়ে বিবেকানন্দ কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে বাস্তবযুক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি জানেন এ দেশে বহিরাগতরা এসেছে এ দেশের সমৃদ্ধিতে প্রলুব্ধ হয়ে, কোনো মৈত্রীভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে নয়। তবু বিভিন্ন যুগে ভারত-ইতিহাসের পর্যায়-গুলি ব্যাখ্যা করে বিবেকানন্দ এ দেশের একটি সমগ্র রূপ রচনা করলেন। শেষ পর্যায়ে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ' অধ্যায়ে তিনি বলছেন—

'পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতসমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে।'

রবীন্দ্রনাথও 'নববর্ষ' প্রবন্ধে এই পাশ্চাত্য অনুকরণ থেকে বিরত হয়ে স্বকীয়তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে বলেছেন। বিবেকানন্দের মতোই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আত্মপ্রত্যয় জাগাতে। বিবেকানন্দের আত্মপ্রত্যয় এসেছিল তাঁর অবিচলিত বৈদান্তিক বিশ্বাস থেকে। 'সর্বমানুষে ব্রহ্ম। কেউ আমার অবজ্ঞার পাত্র নয়। সকলকেই শ্রদ্ধা করব, নমস্কার করব মানুষের মধ্যে যে নারায়ণ আছে তাঁকে'। 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি বিবেকানন্দের উদ্ভাবন। এই নারায়ণ বিরাজ করছেন দরিদ্র দুঃখী মানুষের মধ্যেও। সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে বিবেকানন্দ মানুষকে একটি পরম গৌরব দান করেছেন। বিবেকানন্দ যে-ভারতকে চোখের সামনে দেখেছিলেন, সে-ও এই দরিদ্র ভারতবর্ষ। 'নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'— এমন আবেগপূর্ণ আহ্বানে ভারতবর্ষের একটি নতুন মূর্তি জেগে উঠল। এতদিন সবাই শহুরে শিক্ষিত মানুষকে নিয়ে ভারতবর্ষের কল্পনা করেছে, বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টি ফেরালেন লাঞ্ছিত মানুষের প্রতি। নারায়ণকে তাদের মধ্যে অনুভব করতে বললেন। তিনি আমাদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই নারায়ণকেই দেখলেন দরিদ্র ও অবজ্ঞাতদের মধ্যে। ১৯১০-এ লেখা 'অপমান' কবিতায় এই নারায়ণকেই তিনি স্মরণ করলেন—

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

অথবা

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধুলা তাহার লেগেছে দুই হাতে;
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে।

বিবেকানন্দের অদ্বৈতদৃষ্টির সঙ্গে মিলেছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টি। তিনি একদিকে যেমন মানুষের মধ্যে নারায়ণকে দেখেছেন, তেমনি ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখেছেন শূদ্রের অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে যুগান্তরের আবির্ভাবকে।

দার্শনিক হিসাবে বিবেকানন্দ এবং কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন নি, তাই দুঃখ দারিদ্র্য দেশ জাতি— এ-সবই তাঁর কাছে কঠোর সত্য। আবার অদ্বৈতবাদীর মতোই তিনি মানতেন এই বিচিত্র বিধৃত আছে একের সত্যে। অবিদ্যার আবরণ মোচন করে এককে জানতে হয়। আবরণ-মোচনের নামই জ্ঞান। জ্ঞানের উদয় হলেও বিচিত্র অস্তিত্বহীন হয় না, উচ্চতর সর্বব্যাপী আত্মানুভূতির অধীন হয়। বিবেকানন্দ আত্মিক উপলব্ধি অর্জন করতে বলেছেন, বাস্তব-বিচিত্রের সর্বাধিপত্যকে খর্ব করার জন্ত। জড়শক্তি যেন আত্মাকে অধিগত না করে। আত্মা মুক্ত স্বাধীন। এ-বিশ্বাস আমাদের নেই বলেই আমরা দুর্বল, জড় অবস্থার অধীন হয়ে পড়েছি। বিবেকানন্দ বলতেন, দুর্বলতাই পাপ, জ্ঞানই শক্তি। তাঁর দেওয়া শিক্ষার সুবিখ্যাত সংজ্ঞা— পূর্ণতার অভিব্যক্তি ঘটানোকেই শিক্ষা বলে। বিবেকানন্দ কর্মী পুরুষ, জ্ঞানকে কর্মের প্রেরণারূপে নিযুক্ত করতে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টিতেও এই বিচিত্র জীবন এবং অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা বার বার উচ্চারিত হতে শুনি। সৌন্দর্যের রচনাতেও যেমন তিনি প্রকৃতির অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে এক প্রাণের লীলাকে দেখেছেন, মানবজাতির অজস্র বিভিন্নতাতে তেমনি এক মহামানবকে দেখেছেন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মূলে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই দুর্ধর্ষ ব্রহ্মবাদ ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে এই বিশ্বাস লাভ করে থাকবেন, কিন্তু বিবেকানন্দের

উদাত্ত কণ্ঠ যখন বাঙালিকে উদ্‌বোধিত করছিল তখন রবীন্দ্রনাথও বিবেকানন্দ থেকে তার সমর্থন অবশ্যই পেয়েছিলেন। সমর্থনের দরকার ছিল না, তাঁর মানসিক গঠনই ছিল ভারতীয় ব্রহ্মবাদীর। উপনিষদ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। কর্মী-দার্শনিক আর কবি-দার্শনিকের পার্থক্য এই যে, একজন দেখেন একই বিচিত্ররূপে প্রকাশিত, অন্যজন বিচিত্রকে দেখেন এককে অভিব্যঞ্জিত করতে। দুজনেই ব্যক্তিত্ববাদী (individualist) এবং সমষ্টিবাদী (universalist)। বিবেকানন্দের মতে, অনন্তের মধ্যেই ব্যক্তিত্ব। অনন্তই স্থির অপরিবর্তনীয়। 'There is no individuality except in the Infinite. That is the only condition which does not change'. রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ জীবনে ও প্রকৃতিতে অখণ্ড অনন্তকে বিশ্বাস করতেন বলেই তাঁরা ব্যক্তিত্ববাদী। বিবেকানন্দের কাছে অনন্ত প্রকাশিত অখণ্ড মানবতারূপে, রবীন্দ্রনাথের কাছে অনন্ত প্রকাশিত প্রকৃতির চিরন্তনতায় এবং মানুষের মর্মগত ঐক্যে। রবীন্দ্রনাথ পরে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে নিন্দা করেছেন, বিভিন্ন দেশে শান্তির বাণী বহন করে গিয়েছেন। বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে বেদান্তের বাণী প্রচারের প্রায় কুড়ি বছর পর রবীন্দ্রনাথ বৈদান্তিক দৃষ্টিতে মানব-ঐক্যের প্রচার করেন। বিবেকানন্দের এই বাণী প্রচারকালে পাশ্চাত্যে চলছিল ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা। তিনি তাই সহিষ্ণুতা এবং ঐক্যের কথাই বলেছেন বেদান্তের ব্যাখ্যার ছলে। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯১৩-র পর বিভিন্ন দেশ পর্যটন করছিলেন, তখন ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রমত্ততা।

আর-এক দিক দিয়ে দুজনের চিন্তাগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁরা উভয়েই জড়ের চেয়ে আত্মাকে বড়ো বলে জানতেন। আত্মার আবরণ মোচন করার নাম শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

The object of education is to give man the unity of truth, Formerly when life was simple all the different elements of man were in complete harmony. But when there came the separation of the intellect from the spiritual and the physical, the school education put entire emphasis on the intellect and the physical side of man. We devote our sole attention to children giving information not knowing that by this emphasis we are accentuating a break between the intellectual, physical and the spiritual life.[৮]

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই সামঞ্জস্য নেই। আমাদের ঝোঁকটা একতরফা

—জৈব প্রয়োজন মেটানোর উপায় লাভ। আসলে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত সব-কিছুর সামঞ্জস্য করে অন্তর্জীবনের বিকাশসাধন। অন্তর্জীবনের বিকাশ বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন—

We must make the purpose of our education nothing short of the highest purpose of man, the fullest growth of freedom of soul. It is pitiful to have to scramble for small pittance of fortune. Only let us have access to the life that goes beyond death and rises above circumstances, let us find out God, let us live for the ultimate truth which emancipates us from the bondage of the dust and gives us the wealth, not things but of inner light, not of power but of love.[৯]

বিবেকানন্দ নানাভাবে কি এই কথাই বলেন নি? আত্মাকে অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। জড়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন inner light বিবেকানন্দ তাকে বলেছেন পূর্ণতা!

উল্লেখসূত্র

১. এই লেখাটির প্রথমাংশ 'স্বদেশ' বইতে "নূতন ও পুরাতন" নামে এবং দ্বিতীয়াংশ 'সমাজ' বইতে, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" নামে সংকলিত হয়। র.-র. ১১, ১২ বিশ্বভারতী
২. য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (১৩৬৭), পৃ. ২৩।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪।
৪. "মানসী" কাব্যে এ বিষয়ে বিদ্রূপাত্মক কবিতা আছে।
৫. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 'উভয় সভ্যতার তুলনা'।
৬. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 'স্বধর্ম ও জাতিধর্ম'।
৭. ঐ, ধর্ম ও মোক্ষ। 'ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান তার প্রকাশ।' পত্রাবলী ৭৯, বাণী ও রচনা, ৬, পৃ. ৪০০
৮. রবীন্দ্রনাথ, *Personality*, 'My School'
৯. পূর্বোক্ত।

ঐতিহাসিক বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র (১৮৬১-১৯৩০) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে ১৮৯২ খৃস্টাব্দে রাজশাহীতে। তখন রাজশাহীর জেলা জজ ছিলেন আই. সি. এস. লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৫-১৯১৫) এবং অক্ষয়কুমার সেখানকার উকিল। লোকেন পালিত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের ছোটো। 'জীবনস্মৃতি'তে লোকেনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্‌সিটি কলেজে ইংরাজি-সাহিত্য-ক্লাসে তখন সেখানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু।··· তাহার পর কয়েক বৎসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন যখন ভারতবর্ষে ফিরিল তখন সেই কলেজের লাইব্রেরি ঘরে হাস্যোচ্ছ্বাস-তরঙ্গিত যে আলোচনা শুরু হইয়াছিল তাহাই ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণ যৌবনের দিনে সাধনার সম্পাদক হইয়া অবিশ্রাম গতিতে যখন গদ্যপদ্যর জুড়ি হাঁকাইয়া চলিয়াছি তখন লোকেনের অজস্র উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দেয় নাই।"

১৮৯২ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নামে সাধনার সম্পাদক না হলেও পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। সাধনার অনেক লেখার মূলে লোকেনের উৎসাহ ও প্রবর্তনা ছিল। লোকেনের আমন্ত্রণেই এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে বেড়াতে যান। সাহিত্যোৎসাহী জেলাজজের বাড়িতেই স্থানীয় সাহিত্যিক ও লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁদের অন্যতম।

অক্ষয়কুমার পেশায় উকিল কিন্তু সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ[১], 'গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা' নামে একটি পত্রিকার তিনি সম্পাদক। ইতিহাস-বিষয়ক নানা লেখা তিনি এতে প্রকাশ করতেন। ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ এতই গভীর ছিল যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নাম দিয়ে একটা ধারাবাহিক রচনার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন। ইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই ইতিহাস— বিশেষত বাংলার ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক হিসাবেই তাঁর

বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর বাংলার ইতিহাস এবং শিল্পসম্বন্ধীয় রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ইতিহাস-পাঠ আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার অঙ্গ। তখন বাঙালি পাঠকেরা বিশ্বের ইতিহাসই পড়ত, বাংলার ইতিহাস জানত সামান্যই। বাংলার ইতিহাসের উপাদান তখনও তেমন সংগৃহীত হয় নি। সেজন্য ইংরেজের লেখা ইতিহাস— যতটুকু পাওয়া যায়, তারই উপর নির্ভর করতে হত। হিন্দু যুগ সম্বন্ধে তো প্রায় কিছুই জানা ছিল না। মধ্যযুগ সম্বন্ধে জানা যেত মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখায়। মীনহাজউদ্দিন, গোলাম হোসেন বা সলিমুল্লার মতো ঐতিহাসিকদের রচনাই ছিল সে-বিষয়ে আকরস্বরূপ। চার্লস স্টুয়ার্টের (১৮১৩) মতো বাংলার ইতিহাসের লেখকদের এঁরাই ছিলেন একান্ত নির্ভর। চার্লস উইলকিনস, এইচ. টি. কোলব্রুকের মতো প্রাচ্যতত্ত্ববিদরাই প্রাক্-মুসলমান যুগের ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ। এঁদের পরে আসেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পূর্বসূরী। বাংলার সামগ্রিক ইতিহাসের অন্য স্টুয়ার্ট মার্শম্যান লেথব্রীজের বই ছিল একমাত্র ভরসা। কিন্তু এর ফলে বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার তার বর্ণনা দিয়েছেন—

Even when positive evidence was being brought to light about the past greatness of the Hindus, there was a conscious and deliberate effort to minimise the importance. This was sought to be done by various ways. One was to deny the antiquity of Indian culture by suggesting the lowest possible (or even impossible date) for her literary works like the Vedas and Epics. Another method was to belittle the culture by suggesting that Indians borrowed most if not the whole of their culture from the Greeks. The poor evidence on which such theses were boldly ennunciated even by learned scholars demonstrated a prejudiced mind.[৩]

এটা ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রসঙ্গেও বিদেশী ঐতিহাসিকদের মনোভাব একই রকম ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত ও বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে নি। বিদেশীদের রচিত ইতিহাসই দীর্ঘকাল পড়তে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

মীনহাজউদ্দিন লিখে গিয়েছিলেন, বখতিয়ার খিলজী সতেরো জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাংলাদেশ জয় করেছিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন বাধা দেবার কোনো চেষ্টা না করে প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক গল্প দীর্ঘকাল বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। শুধু ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃতি ঘটেছে বলেই যে তাঁদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল, তা নয়, এই ঘটনায় তাঁদের জাতীয়তাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অনুরূপ আর-একটি ঘটনা সিরাজদ্দৌলার কাহিনী। বিদেশী ঐতিহাসিকেরাই অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে। সপ্তদশ অশ্বারোহীর বাংলা জয় পরবর্তী কালে অসত্য প্রমাণিত হয়েছে, অন্ধকূপহত্যাও অতিরঞ্জিত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দুটি ঘটনারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিষয়ে আমাদের যেমন নির্ভর করতে হত এলফিনস্টোন এবং জেমস মিলের উপর, বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়েও আমাদের নির্ভর করতে হত মার্শম্যান লেথব্রীজের উপর। এদেশী ইতিহাস রচয়িতারা ইংরেজ ঐতিহাসিকদেরই অনুসরণ করতেন। বাংলা দেশের স্বাধীন ইতিহাস রচনার যুগ তখনও প্রবর্তিত হয় নি।

উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকেই স্বাধীন দৃষ্টিতে স্বাধীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা শোনা যেতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী (১৮৬৯) উপন্যাসে এর আভাস দিলেন। বঙ্গদর্শনের (১৮৭২) বিভিন্ন প্রবন্ধে[৪] তিনি স্পষ্টভাবে এ বিষয়ে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রাপ্ত উপকরণগুলিকে নতুন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা দরকার। তিনি নিজেই 'বাঙালীর উৎপত্তি' নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন। তখন বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমেরই (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রভাব। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়, তখন বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রভাবেই অক্ষয়কুমার প্রভাবিত। বঙ্কিম শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসই লেখেন নি; বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর দেশাত্মমূলক লেখাও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বঙ্গদর্শন চলেছিল ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত বঙ্কিমের সম্পাদনায়। শুধু তাঁর সম্পাদনাকালে নয়, তার পরেও নানা রচনায় তিনি বাঙালির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে গিয়েছেন। বঙ্গদর্শন বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করবার জন্যেই যেন আবির্ভূত। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙালার ইতিহাস'-এর (১৮৭৪) সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখে-ছিলেন,

'সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শম্যান স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধপুরাণ মাত্র।'[৫]

বঙ্কিম বার বার অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। এই অতীতই সেকালের কবি ও ঔপন্যাসিকদের লেখায় নানা বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পরাধীন জাতি স্বভাবতই অতীত ঐতিহ্যেই আত্মগরিমাকে খুঁজে পায়, সেই গরিমা সত্যই হোক আর কাল্পনিকই হোক। আত্মসচেতনতা এমনি করেই আসে। এটা যে নতুন শিক্ষানীতির ফল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক-পূর্ব যুগে এই সচেতনতা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন এই আত্মসচেতনাকে ভাষা দিয়েছে। বঙ্গদর্শনকে ঘিরেই রজনীকান্ত গুপ্ত, রামদাস সেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো ঐতিহাসিকেরা দেখা দিলেন। তখনও অক্ষয়কুমার তাঁদের মধ্যে ছিলেন না। তাঁর বাংলা সাহিত্যে উপস্থিতি বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর। তিনি যখন এলেন— স্বাধীন ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়েই এলেন। তাঁর সিরাজদ্দৌলার প্রবন্ধমালা যখন প্রকাশিত হল, তখন রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে লিখেছিলেন,

'বাঙ্গালা ইতিহাসে তিনি যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন সেজন্য বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন'।[৬]

১৮৯২-তে রাজশাহীতে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসভায় আমন্ত্রিত হয়ে প্রবন্ধ পড়েছেন। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' এ রকম একটি সভায় পঠিত। অক্ষয়কুমার তখন রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। অনুমান করা যায় তিনিই এই সভার আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের'[৭] প্রবন্ধটি আজ প্রায় বিরানব্বই বছর পরেও সমান তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধেই তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার কথা বলেছিলেন। তার পর সারা জীবনই নানা উপলক্ষে এ বিষয়টির অবতারণা করেছেন। এই প্রবন্ধেই বিস্তৃতভাবে তার প্রথম উত্থাপন করেন। সাধনা পত্রিকায় যখন এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর মতো বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর এটি বিশেষ সমর্থন লাভ করেছিল।[৮]

অক্ষয়কুমারের নিজের বিষয় ইতিহাস, তার সঙ্গে এই প্রবন্ধের বিশেষ যোগ নেই মনে হতে পারে। তথাপি অক্ষয়কুমারের মানসিক গঠনে এই প্রবন্ধের প্রভাবকে তুচ্ছ করা যায় না। কারণ অক্ষয়কুমার তাঁর অধিকাংশ ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ বাংলাতেই লিখেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশিত হতে থাকে 'সাধনা'য় (১৩০২ বঙ্গাব্দ) এবং ভারতীতে (১৩০২-০৩)। পরে ১৯১৬ সালে ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটিতে অন্ধকূপ হত্যা নিয়ে যে আলোচনা সভা হয়েছিল তাতে অক্ষয়কুমার যোগ দিয়েছিলেন। *Bengal Past and Present* (1916, Jan.-March)-এ তাঁর সারগর্ভ প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। এর পর তিনি দুটি বই লেখেন 'সীতারাম রায়' এবং 'মীরকাসিম'। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় এবং হিরণ্ময়ী দেবী-সরলাদেবী-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় বই দুটি ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল।[৯] এঁরা দুজনে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা।

রবীন্দ্রনাথ 'সিরাজদ্দৌলা' বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র তথ্যসংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন।[১০] দ্বিতীয় আর-একটি সমালোচনা তিনি করেন ভারতীতে।[১১] সেকালের ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক সিরাজদ্দৌলা বইটির সম্পর্কে প্রতিকূল সমালোচনা করলে অক্ষয়কুমারের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনাটি লেখেন। সেই সূত্রে বিদেশী লেখকদের লেখা ইতিহাস পড়বার দুর্ভাগ্যর কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। বিদেশীরা এদেশীয়দের প্রতি এতই বিরূপ যে কোনো ভারতীয় লেখক যুক্তিনিষ্ঠা সহকারে কোনো ঘটনা বিবৃত করতে পারে এটা তাঁরা ভাবতেই পারেন না। এই বিদেশী লেখকরাই আবার নিজেদের দোষ ত্রুটি একেবারেই দেখতে পান না। এই দৃঢ়মূল সংস্কারের বাধা অতিক্রম করে অক্ষয়কুমার স্বাধীন চিন্তার সূচনা করলেন, রবীন্দ্রনাথ এতেই উৎফুল্ল হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই অক্ষয়কুমার ত্রৈমাসিক 'ঐতিহাসিক চিত্র' সম্পাদনা আরম্ভ করেন (১৮৯৯)। পত্রিকা প্রকাশের আগেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (১৩০৫ ভাদ্র) ঐতিহাসিক চিত্রের আসন্ন প্রকাশের ঘোষণা করেছিলেন,

'বাঙ্গালা দেশে আজকাল ইতিহাসের চর্চা বিশেষরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বিক্ষিপ্ত উদ্যমগুলিকে একত্র করিয়া একখানি ঐতিহাসিক পত্র বাহির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। উপযুক্ত সম্পাদক উপযুক্ত সময়ে এ কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা আমাদের আনন্দের বিষয়।'

তিনি এ কথাও বলেন,

'এখন আমরা মোগল রাজত্বের মধ্য দিয়া পাঠান রাজত্ব ভেদ করিয়া সেনবংশ পালবংশ গুপ্তবংশের জটিল অরণ্যমধ্যে পথ করিয়া পৌরাণিক কাল হইতে বৌদ্ধ কাল এবং বৌদ্ধ কাল হইতে বৈদিক কাল পর্যন্ত অখণ্ড আপনার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছি। সেই মহৎ আবিষ্কার ব্যাপারের নৌযাত্রায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' একটি অন্যতম তরণী। যে-সকল নির্ভীক নাবিক ইহাতে সমবেত হইয়াছেন ঈশ্বর তাঁহাদের আশীর্বাদ করুন, দেশের লোক তাঁহাদের সহায় হউন।'

রবীন্দ্রনাথের এই উচ্চ আশা ঐতিহাসিক চিত্র পূর্ণ করেছিল। পত্রিকাটি স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও অক্ষয়কুমারের পরবর্তী গবেষণা ও প্রবন্ধ বাঙালির নব-জাগ্রত ইতিহাস-চেতনাকে সার্থক করেছিল। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রস্তাবনা ছিল। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ সহকারেই বলেছিলেন বঙ্গদর্শন যেমন 'সাহিত্য প্রাসাদের বড় সিংহদ্বারটা' খুলে দিয়েছিল ঐতিহাসিক চিত্র তেমনি খুলে দেবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের 'প্রকাণ্ড রুদ্ধ বাতায়ন'। কী কী কাজ ঐতিহাসিক চিত্র করবে তার একটা তালিকা দিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার। তার মধ্যে ছিল ভিন্ন ভাষা থেকে তথ্যের অনুবাদ, বিদেশীদের ভারত-ভ্রমণের বিবরণ, নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ, ঐতিহাসিক প্রতিবেদনের সমালোচনা, বাংলার রাজা-জমিদারদের বিবরণ সংকলন। আমাদের নিজেদের ভাষাতে আকর-উপকরণ পাওয়া যাবে— এই কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাঁদের বন্ধুত্ব-সম্পর্কের আর-একটা দিক ছিল। সেটাও কম অর্থপূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্রষ্টা; অক্ষয়কুমার ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়-কুমারের লেখা পড়তেন শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-দর্শেও অক্ষয়কুমারের প্রভাব পড়েছিল। সাহিত্য কল্পনার সৃষ্টি। উপন্যাসের নাটকের চরিত্র বাস্তব দ্বারা অনুপ্রেরিত হতে পারে, কিন্তু লেখক তাদের সৃষ্টি করেন কল্পনা দিয়ে। ইতিহাসের সত্য ও বাস্তবের সত্যে তাই বিরোধ বাধা স্বাভাবিক। অক্ষয়কুমার তখনকার বড়ো লেখকদেরও বাস্তবচ্যুতির জন্য সমালোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। নবীনচন্দ্র সেন, 'পলাশির যুদ্ধ' লিখে এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' লিখে অক্ষয়কুমারের সমালোচনাভাজন হয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধে (১৮৭৫) সিরাজদ্দৌলাকে আঁকা হয়েছে অত্যাচারী ভোগসর্বস্ব অনভিজ্ঞ রূপে। আর বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে (১৮৭৫) মীরকাশিম দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, শাসন পরিচালনায় অদক্ষ। সেই উপন্যাসেই মীরকাশিমের সেনাপতি তকি

খানকে আঁকা হয়েছে ভিলেন রূপে। এ-সবই ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী বলেই অক্ষয়কুমারের মনে হয়েছে।[১২] কিন্তু অক্ষয়কুমারও সমালোচনার বাইরে ছিলেন না। 'পূর্ণিমা' পত্রিকার সম্পাদক 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান' সম্প্রদায় (১৩০৫ শ্রাবণ) লিখে বঙ্কিমকে সমর্থন করলেন এবং আক্রমণ করলেন অক্ষয়কুমারকে। এবার রবীন্দ্রনাথই তাঁর বন্ধুর সমর্থনে এগিয়ে এলেন। ভারতীর 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে (১৩০৫ শ্রাবণ, পৃ ৩৭৮-৮০) লিখলেন, অক্ষয়কুমার আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁর মতামত কখনোই উপেক্ষণীয় নয়। এই বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে তিনি নিজের মত যোগ করলেন। অক্ষয়কুমারের বক্তব্য, সাহিত্যিক কখনোই ঐতিহাসিক সত্যের বিচ্যুতি ঘটাতে পারেন না। সে-অধিকার তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ বললেন, লেখকের সেই স্বাধীনতা আছে। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত প্রবন্ধ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৩০৫ আশ্বিন) লেখা হয়। সংস্কৃত আলংকারিকেরা ন'টি রসের কথা বলেছেন কাব্যপাঠে যার আস্বাদন হয়। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে আর-একটি রস যুক্ত করলেন— ইতিহাস-রস। ইতিহাস-বিষয়াশ্রিত উপন্যাস পড়লে যে বিশিষ্ট রসের স্বাদ পাই সেটাই রবীন্দ্রনাথের মতে ইতিহাস-রস। মৌলিক সৃষ্টিতে কল্পনার স্বাধীনতা থাকতেই হবে কিন্তু বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা-সংস্থানে এই কল্পনাই বিশেষ স্বাদের সৃষ্টি করে। উপন্যাসে অবশ্যই আমরা ইতিহাসের সত্য চাই না। উপন্যাসে ভুল লিখলে ইতিহাসে তার সংশোধন করে নেব কিন্তু তা বলে কোনো সাহিত্যগ্রন্থ পাঠের নান্দনিক অভিজ্ঞতাও আমাদের কাছে মূল্যহীন নয়। বহু বৎসর আগে অ্যারিস্টটল সাহিত্যের এই ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কাব্যের সত্য এবং ইতিহাসের সত্য কোন্‌টির মূল্য বেশি? ইতিহাসের সত্য বিশেষ স্থান এবং কালের দ্বারা বদ্ধ। কাব্যের সত্য উচ্চতর সর্বজনীন নীতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ সমস্যা ও সমাধানকে আরো স্পষ্ট করে বললেন যে সর্বজনীন বা অলৌকিক অনুভূতি একটা বিশেষ ইতিহাস-ক্ষণের দ্বারা সৃষ্ট, *সেই অনুভূতি অধিকতর ইন্দ্রিয়বেদ্য (concrete) এবং তাতে সৃষ্টি হয় ইতিহাস-রস। এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ* ব্যাখ্যা করেছিলেন অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিতর্কের সূত্রে।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে কিছু পত্রালাপ হয়। অক্ষয়কুমার কোনোমতেই ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত হতে দিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু এই বিতর্কে বাংলা সাহিত্যেরই লাভ হয়েছে। এর ফলে সাহিত্যতত্ত্বের একটা নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যখানির দীর্ঘ সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি এর উল্লেখ করেছেন।

১৮৯২ থেকে ১৯০১—এই নয় বছরই রবীন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের কাল। ১৯০১-এর পরেও তাঁদের সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলা যায় না।[১৩] কিন্তু কবি ও ঐতিহাসিকের আর-এক জায়গায় মিলন ঘটেছিল। ইতিহাস-চর্চা ছাড়াও অক্ষয়কুমারের আর-একটি বিষয়ে গভীর উৎসাহ ছিল। তিনি ছিলেন রেশমশিল্পে উৎসাহী, রেশমের চাষও তিনি করেছেন। ভারতীতে ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া রেশম চাষ সম্পর্কেও প্রবন্ধ লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে বাস করতেন। বন্ধুর পরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও নিজের জমিদারিতে রেশম চাষের চেষ্টা চালিয়েছিলেন।[১৪] স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) তখনও বহুদূর। রবীন্দ্রনাথের সেই পরীক্ষা সার্থক হয় নি, কিন্তু সেখানেই ছিল ভবিষ্যৎ শ্রীনিকেতন বয়নশিল্পের পূর্বাভাস।

উল্লেখসূত্র

১. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০১) বইতে অক্ষয়কুমার একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিখেছিলেন। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র (৬৪ নং) এটির দীর্ঘ উদ্‌ধৃতি আছে। অক্ষয়কুমারের সাহিত্যকৃতির জন্য দ্রষ্টব্য ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, প্রবাসীর (১৩৩৬ চৈত্র) প্রবন্ধ এবং সরসীকুমার সরস্বতীর প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, খণ্ড ১৮, সংখ্যা ৩। প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা' (১৯৫২) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২. হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ)-সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্র। কুমারখালি থেকে প্রকাশিত। হরিনাথ অক্ষয়কুমারের পিতৃবন্ধু।

৩. 'Nationalist Historians', *Historians of India Pakistan and Ceylon* (ed. C. H. Phillips, 1967), p. 419.

৪. 'বাঙ্গালির বাহুবল' (১২৮১), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১২৮১), 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' (১২৯১), 'বাঙ্গালির ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (১২৮৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' (১২৮৮)।

৫. বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্গদর্শন, ১২৮১ মাঘ
৬. ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ, পৃ. ৩৭০
৭. সাধনা, ১২৯৯ পৌষ
৮. এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে পত্র লিখেছিলেন। সেই-সব পত্রের অংশবিশেষ 'সাধনা'তে উদ্ধৃত হয়েছিল।
৯. 'সীতারাম', সাহিত্য, ১৩০২ কার্তিক-চৈত্র এবং 'মীরকাশিম', ভারতী (১৩০৪)
১০. ভারতী, ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৪৩-৪৭। হেমলতা দেবীর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের' সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের গবেষণার সপ্রশংস উল্লেখ।
১১. ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ, পৃ. ৩৬৬
১২. 'সিরাজদ্দৌলা'র 'পলাশীর যুদ্ধ' অধ্যায় এবং ভারতী, ১৩০৪ বৈশাখ দ্রষ্টব্য।
১৩. রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে গৌড়রাজমালার দুই খণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার আছে। চিঠির তারিখ ১৩২৯ (১৯১২ খৃ.)। রবীন্দ্রনাথ রমাপ্রসাদ চন্দকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। রমাপ্রসাদই আসলে ওই সংকলন করেছিলেন। অক্ষয়কুমার ভূমিকা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ খুব আনন্দিত হয়ে এই অসাধারণ বইখানির জন্ম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।
১৪. দ্রষ্টব্য 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (১৩৫৮) তৃতীয় অধ্যায়, র.-র. ২৭, পৃ. ৩২৯-৩০, বিশ্বভারতী।

বিজ্ঞানীর তত্ত্ব কবির কল্পনা

জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি পড়লে বিস্মিত হতে হয়। দুটি অসাধারণ কালজয়ী প্রতিভা কী করে বন্ধুত্বের বন্ধনে ধরা দিল; আপন-আপন সাধনার নিরন্তর অনুসরণের মধ্যেও দুজনের সম্পর্ক গভীর ও নিবিড় হয়ে এসেছে, সে-কাহিনী আমাদের কাছে চিরন্তন ও শ্রদ্ধার বিষয়।

বিশেষত নিঃসঙ্গতাই হচ্ছে বড়ো প্রতিভার ধর্ম। তাঁরা আপনার স্বপ্ন ও আদর্শের মধ্যেই মগ্ন। অগণিত মানুষের মধ্যে থেকেও তাঁদের যেন সঙ্গী নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির জীবনে এই নির্জনতা যেন আরো স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র-জীবনীকার তাঁর এই নিঃসঙ্গতার উল্লেখ করেছেন। অসংখ্য কর্মের জালে জড়িয়েও একটা মুহূর্ত আসে যখন সেই জাল সরিয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। যৌবনকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এক-একটা আদর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, আবার নতুন কর্ম-পন্থার আহ্বানে তিনি সেখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। কাব্যপ্রেরণার দিক দিয়েও রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিবর্তনশীল নবীনতা রবীন্দ্রকাব্যপাঠককে বিস্মিত করে। চিন্তার দিক দিয়ে তিনি এক-একটি স্তরকে এমনি করেই অতিক্রম করে গিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যকে পেরিয়ে এসে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সভ্যতার সংকটের অন্তিম বাণীতে তিনি যুগান্তরণের স্বপ্ন দেখেছেন। এর মধ্যে কত কত নতুন সমস্যা, নতুন পরিবেশ তাঁর চিন্তাধারাকে শাণিত করে নিয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র দুজনেই প্রতিভার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খুঁটিনাটি কতদূর পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন বলা শক্ত। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রবন্ধ লিখলেন 'জড় কি সজীব' (বঙ্গদর্শন ১৩০৮, শ্রাবণ) এই প্রবন্ধ পড়ে জগদীশচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। পদার্থবিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যার নিছক বিজ্ঞানঘটিত তত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক হয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বুঝতে পারা হয়তো সম্ভব ছিল না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি সুদূর ঐতিহ্যের ধারা দেখতে পেয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র রয়্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতার উপসংহার করে-ছিলেন এই বলে—

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things— the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it— it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago.[১]

এই উদ্‌ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষে যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি।" জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রাণের যে লীলা উদ্‌ঘাটিত হল, রবীন্দ্রনাথকে সেই তথ্যটিই মুগ্ধ করেছিল। ঋষিদের উপলব্ধ সত্য যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হল, রবীন্দ্রনাথ যেন অতি সহজেই তখন তাঁর ঔপনিষদিক শিক্ষা এবং কবিদৃষ্টি নিয়ে জগদীশচন্দ্রের সত্যটি অন্তরে গ্রহণ করে নিলেন। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সত্য যেন একটা সৃষ্টি, অখণ্ড চেতনার প্রগাঢ় উপলব্ধি যা জড় এবং জীবনকে মৈত্রীবন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রেও এই উপলব্ধির কবিত্বময় প্রকাশ আছে—

'যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে— সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।' (শিলাইদা ২০ আগস্ট, ১৮৯২)।

রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনা দিয়ে এই চেতনার উপলব্ধি করেছেন, প্রায় সেই সময়েই জগদীশচন্দ্র গবেষণাগারে এই সত্যটিকে সপ্রমাণ করতে সচেষ্ট। কবি-জীবনের এই অধ্যায় এবং বৈজ্ঞানিক-জীবনের এই অধ্যায়টির মধ্যে ঐক্যই দুজনকে এমন নিবিড় বন্ধুত্বে বেঁধে দিতে সহায়তা করেছিল বলে মনে হয়। এই সত্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বাণী। জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক হয়েও পরমাশ্চর্য আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতায় অভিষিক্ত। এইজন্যেই তাঁর বাংলা রচনা এমন শিল্পস্পর্শে প্রদীপ্ত। বস্তুকে শুধু বস্তুরূপে দেখেন নি বলেই তাতে যুক্ত হয়েছে কল্পনার আভা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'তোমার "অব্যক্ত"র অনেক লেখাই আমার পূর্বপরিচিত— এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরানী

করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত— কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে '।[২]

এই উক্তি বন্ধুত্বজনিত প্রশস্তি মাত্র নয়, জগদীশচন্দ্রের রচনার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তাঁরাই সে-কথা জানেন। সুতরাং তাঁদের বন্ধুত্বে সহায়তা করেছিল দুজনের মননচেতনার সাদৃশ্য। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিকসুলভ বিশ্লেষণী বুদ্ধি তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধির অখণ্ডতাকে কোনো দিক দিয়েই ক্ষুণ্ণ করে নি। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি সত্যই অর্থগভীর—

'ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে।'[৩]

'I believe that a part of my nature is logical which not only enjoys making playthings of facts, but seeks pleasure in an analytical view of objective reality'.[৪]

নিজের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কাব্যসমালোচকদের কাছে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হবে। রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন বলে শুধুই আবেগপ্রবণ ছিলেন এমন কথা বলা তাঁর সমগ্র বিচার নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনী অনুধাবন করলে তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে পড়বে। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "বালক-বয়সেই রবীন্দ্রনাথ যে ভাবুকতা, চিন্তা ও বিচারশক্তির (critical faculty) পরিচয় দিয়াছিলেন— সেকালে যে সকল গদ্য-প্রবন্ধ ও আলোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ছিল।··· ষোল বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ বৎসর— এই দশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা ও লিখিত প্রবন্ধ তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে এই প্রতিভার আদি-উন্মেষ কোন পথে হইয়াছে। বাস্তবিক এত অল্পবয়সে মানসশক্তির (intellect) এমন জাগরণ কবিজীবনে অতিশয় বিরল।"[৫] এই মানসশক্তি শেষ পর্যন্ত অব্যাহতরূপে বিকাশ লাভ করেছে। কবিতাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গিয়েছে মানসচেতনার নিত্যনব রূপ। সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা সাহিত্য— সব-কিছুর আলোচনাতেই তার প্রমাণ অক্ষুণ্ণ। তাঁর বক্তব্য অবশ্যই আদর্শবাদিতায় পূর্ণ ছিল কিন্তু যুক্তি এবং বিশ্লেষণে কখনোই তিনি অস্পষ্ট ছিলেন না। তিনি 'শব্দতত্ত্ব' লিখেছেন, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' লিখেছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত সর্বজনশ্রদ্ধেয়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দিকে চিন্তায় অপূর্ব স্বচ্ছতা এসেছিল। পূর্ববর্তী যুগের

বাক্যালংকারের পদ্ধতি তিনি পরিহার করলেন। তিনি লিখলেন 'বিশ্বপরিচয়' এবং 'বাংলাভাষা-পরিচয়'। এই সময়েরই লেখা 'তিনসঙ্গী'তে সংকলিত গল্পগুলির নায়কদেরও তিনি বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় প্রতিভাবানরূপে কল্পনা করেছেন।

এটাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং গ্যেটের সঙ্গে এই দিক দিয়ে তাঁর মিল। কিন্তু অনুরূপ আর বেশি নেই। কল্পনা ও মননের যুগ্মধারার প্রতিভা সত্যই বিরল। এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল বলেই এই নিঃসঙ্গ কবির বৈজ্ঞানিকের বন্ধুত্ব অর্জনে বিলম্ব হয় নি।

সেই যুগটাও স্মরণীয়। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ঘটল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সম্ভবত ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে।[৬] রবীন্দ্রকবিজীবনে তখন চিত্রা-কথা-কল্পনার যুগ। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশের ঘরে। জগদীশচন্দ্র চলেছেন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জনের পথে আর রবীন্দ্রনাথের তখন মধ্যাহ্নপর্ব আরম্ভ হয়ে গেলেও তেমন সর্বপরিচিত হন নি। তখনও রবীন্দ্রনাথ জমিদারির কার্যে ব্যাপৃত, ব্রাহ্মধর্ম আলোচনায় উৎসাহী। রাজনীতি ও দেশের সামাজিক অবস্থা নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় নিরত।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার আদর্শের দিক দিয়ে তাঁর সমসাময়িক আন্দোলন থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র ছিলেন না। ভারতবর্ষের অতীত গৌরব রবীন্দ্র-নাথের কবিস্বপ্নকে আচ্ছন্ন করেছে। ভারতবর্ষের যে নিজস্ব পথ ও আদর্শ আছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে য়ুরোপীয় মদমত্ত সভ্যতার উপরে। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্য ছাড়াও পূর্ববর্তী অন্যান্য কাব্যেও প্রাচীন ভারতের শান্তিময় গৌরবমণ্ডিত জীবন সৌন্দর্যপ্রভা বিকীর্ণ করে-ছিল। সে-সময়কার প্রবন্ধ ইত্যাদিতেও একই সুর ধ্বনিত। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতায় ত্যাগের বাণী ও অধ্যাত্ম মহিমাকে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ-রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। এই ঐতিহ্যবোধ এবং জাতীয় আদর্শ বল সঞ্চয় করছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ভারত-সংস্কৃতির বাণী প্রচারে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকের ইতিহাস-চিন্তায়। ভগিনী নিবেদিতা উদাত্ত ভাষায় লিখেছেন,

I want a far greater work, such as only this Indian man of science is capable of writing, on Molecular Physics,— a book in which that same great Indian mind that surveyed all human knowledge in the era of the Upanisads & pronounced it one,

shall again survey the vast accumulations of physical phenomena...[৭]

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—

And I feel also that if we do not help ourselves in this matter, if we have not patriotism enough to make our one scientist independent for life and devoted to the cause of science and of our country,— we shall lose our chance for ever and deserve to lose it.[৮]

জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ যে-সব পত্র লিখেছিলেন তাতে এই আদর্শকেই বার বার উচ্চারিত হতে শুনি—

'ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই— তোমাদের সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে— সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্মল সূর্য্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন।'[৯]

এই ভাষাতে এবং এই আদর্শে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের অন্তরে প্রেরণার আগুন জ্বালতে চেয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রও বলেছেন 'আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে।' তাঁর সাধনা যে ভারতসংস্কৃতিরই বিকাশের ধারায় এসেছে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জগদীশচন্দ্রকেও তাই তিনি এই গুরুভার বহন সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছেন। জগদীশচন্দ্রের সাধনা ব্যক্তির নয়, জাতির। এই আদর্শের দীপ্তিতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা। জগদীশচন্দ্রের দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় রাজার দাক্ষিণ্য ছিল অকুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এমন প্রস্তাবও করেছিলেন, গভর্নমেণ্ট যদি জগদীশচন্দ্রকে ছুটি না দেয়, তবে তিনি যেন সরকারি কাজ ছেড়ে দেন, তাঁর ব্যয়ভার রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সুহৃদ্‌গণই বহন করবেন। এই আশ্চর্য সৌহৃদ্যের প্রতিদানে জগদীশচন্দ্রও বন্ধুকে বিশ্বের গুণীসমাজে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছিলেন—

'তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব?'[১০]

তার পর রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তখন তাঁর সম্বর্ধনাসভায় জগদীশচন্দ্রই হলেন সভাপতি। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সংক্ষিপ্ত সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৭-এ জগদীশ-চন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত দুজনের বন্ধুত্ব অন্তনিরপেক্ষ আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দুজনের পত্র-সংখ্যা বেশি নয়। প্রথম যুগের সেই আদর্শবাদ তাঁদের পত্রে আর নেই। এর কারণ বোধহয় এই যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এবং দেশের পরিবর্তনশীল চিন্তাধারার সঙ্গে যে যোগ রক্ষা করে চলতেন, জগদীশচন্দ্র বোধহয় সে-রকম সক্রিয় যোগ রাখতেন না; সম্ভবত এইজন্যই তাঁদের চিঠিতে এই অভিমত-বিনিময় নেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

'রবীন্দ্রনাথের সহিত জগদীশচন্দ্রের যে নিবিড় যোগ এককালে ছিল তাহার কথা আমরা এই জীবনী মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ক্রমে কালের ব্যবধানে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা হেতু দুইজনের মধ্যে পূর্বের সে নিবিড়বন্ধন শিথিল হইয়া যায় তৎসত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন।'[১১]

জগদীশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর বসুবিজ্ঞান মন্দিরে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে (৩০ নভেম্বর) রবীন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি বক্তৃতার প্রথম বক্তৃতা দেন। সেই ইংরেজি বক্তৃতাটি চিঠিপত্রের ষষ্ঠ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেটি পড়লে বোঝা যায় কত সুন্দর ছিল তাঁদের বন্ধুত্ব।

উল্লেখসূত্র

১. চিঠিপত্র ৬, পৃ. ১১১
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮ ক
৫. কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬
৬. চিঠিপত্র ৬, পৃ. ১৫৫
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫
১১. রবীন্দ্রজীবনী ৪, পৃ. ১০৪।

নতুন ভাবনার সঙ্গী প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন ১৮৮৬ সালে। সেই বছর প্রমথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরী একসঙ্গে একই জাহাজে যাত্রা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেবার মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আশুতোষ বিলেত থেকে কৃষ্ণনগরের বাড়িতে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আসেন। তখনই প্রথম প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়। প্রমথ চৌধুরী সেই সময় কলেজের ছাত্র। তার আগেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাম তাঁর শোনা ছিল। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের নাম তিনি যখন প্রথম শোনেন তখন তাঁর বয়স আট বৎসর। তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশিত হত 'জ্ঞানাঙ্কুরে'। 'রবি ঠাকুর কবি কিনা'— এই নিয়ে আশুতোষ চৌধুরী ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আলোচনা হত। তার কয়েক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথের কাব্য তিনি প্রথম পড়েন। কাব্যটির নাম 'ভগ্নহৃদয়'। হেয়ার স্কুলের কোনো সহপাঠীর অনুরোধে তিনি 'ভগ্নহৃদয়' পড়েছিলেন। কিন্তু সে কাব্য তাঁর মনে কোনো রেখাপাত করে নি।

কৃষ্ণনগরেই প্রথম দুজনের সত্যকার পরিচয় হল। শুধু মৌখিক নয়। প্রমথ চৌধুরী যে একজন প্রতিভাবান তরুণ, রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন। তার বিবরণ প্রমথ চৌধুরীই রেখে গিয়েছেন[১]—

'আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে দক্ষিণে একটি লম্বা চওড়া ঢাকা বারান্দা ছিল এবং তার দক্ষিণে একটি মাঝারি গোছের খোলা বারান্দা ছিল। একদিন সন্ধ্যার পর সেখানে দাদা ও রবীন্দ্রনাথ বসে তাল সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে আসবার কিছু পূর্বে কলকাতায়, বোধহয় মেডিকেল কলেজে তাল সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। আমি ঢাকা বারান্দায় অন্ধকারের ভিতর বসে তাঁদের আলোচনা শুনছিলুম। শুনে দাদাকে একটি প্রশ্ন করলুম। সেই রাত্রে দাদার মুখে শুনি যে আমার প্রশ্ন শুনে রবীন্দ্রনাথ দাদাকে জিজ্ঞাসা করেন 'এ প্রশ্ন কে করলে?' দাদা বলেন 'আমার একটি ছোট ভাই।' রবীন্দ্রনাথ নাকি দাদাকে

বলেন, 'তোমার ও ভাইটি দেখছি অতি বুদ্ধিমান ও চতুর।' আমার সেই প্রশ্নটি ছিল এই যে— রাস্তা দিয়ে একটি ঘোড়া যদি সমান জোরে দৌড়ে যায়, তবে তার সমপদবিক্ষেপের শব্দ কি কানে মিষ্টি লাগে না ?— যদিচ তার ভিতর কোনো সুরস্বর নেই, আছে শুধু সমান সমান ব্যবধান।— তিনি কৃষ্ণনগরের মতো পাড়াগাঁয়ে এসে, একটি রুগ্ণ ছোকরার মুখে এরকম প্রশ্ন বোধহয় প্রত্যাশা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, আমি প্রথমেই আবিষ্কার করি তিনি দেহে ও মনে একটি লোকোত্তর পুরুষ।"

তার পর প্রমথ চৌধুরী কলকাতায় আশুতোষ চৌধুরীর মট্‌স্ লেনের বাড়িতে এসে থাকেন। রুগ্ণ শরীরে পড়াশুনা খেলাধুলা বন্ধ ছিল। বিলেত থেকে তখনকার দিনের আধুনিক কবি রসেটি সুইনবার্নের কাব্য নিয়ে এসেছিলেন আশুতোষ চৌধুরী। অনেক ফরাসী বইও এনেছিলেন। বাড়িতে বসে বসে প্রমথ সেই বই পড়া অভ্যাস করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়ই আসতেন। ইতিমধ্যে আশুতোষের সঙ্গে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভাদেবীর বিবাহ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলি লেখেন। আশুতোষ চৌধুরী এই বই সম্পাদনা করেন। বই ছাপা হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলি আশুতোষকে পড়ে শোনাতেন। প্রমথ সেই সময় উপস্থিত থাকতেন। তিনি বলেছেন—

"কবিতা বস্তুটি কি, সে বিষয়ে তাঁদের আলোচনা শুনতুম। তার থেকেই আমার ধারণা হয় যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি আছে যা হেম-নবীনের ছিল না। এই আলোচনার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন যেন জেগে উঠল। তিনি কবে কি বলেছেন তা অবশ্য আমার মনে নেই। তবে যেমন তিনি আমাদের পরিবারে সংগীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি আমাদের মধ্যে কাব্যচর্চারও আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, এই পর্যন্ত বলতে পারি। খুব সম্ভবতঃ আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি।"

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশের পূর্বে তাঁদের মধ্যে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল আত্মীয়তার সূত্রে। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়েন এবং আলোচনা করেন।[৩] যে যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিশক্তি সম্বন্ধে বাঙালি পাঠক নিঃসন্দেহ ছিল না সেই যুগে চৌধুরী পরিবারে রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি অনুরাগ গড়ে উঠেছিল। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগেই রবীন্দ্রনাথ এমন ভক্ত লাভ করেছিলেন, যিনি রবীন্দ্রযুগেই দ্বিতীয় সাহিত্য-অধিনায়ক হয়ে উঠবেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তখনও

পর্যন্ত বাংলা রচনা করেন নি। ১৮৯০তে যে বৎসর তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন, সেই বৎসর প্রমথ চৌধুরী প্রথম বাংলা প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি লিখলেন 'জয়দেব'কে নিয়ে। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উৎসুক ছিলেন। তিনি চিঠিতে লিখলেন,[৪]

'জয়দেব সম্বন্ধে কি করচ? কিছু লিখ্‌লে কি? জয়দেবকে কি ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝ্‌তে পারচি নে। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও?'

প্রমথ চৌধুরী জয়দেবকে উঁচুদরের কবি বলে স্বীকার করতে চান নি। যে সাহিত্যসভায় প্রবন্ধটি পড়া হল, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কবি অক্ষয় বড়াল। তিনি নবীন লেখককে অভিনন্দিত করলেন, যদিও চিত্তরঞ্জন দাশ এবং জ্ঞানেন্দ্র-নাথ গুপ্ত[৫] প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হন। এই প্রবন্ধটি স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল অনেকাংশ বাদ দিয়ে। অনেকদিন পর 'সবুজপত্রে' প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত। এই সময় থেকে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাহিত্য নিয়ে পত্রালাপ চলে। তার কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যের কিছু আলোচনা করেন। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ সমালোচনাবুদ্ধি ও রসজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ যে তখন থেকেই মুগ্ধ ছিলেন তা বুঝতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেখে। এই-সব লেখাতেও রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের কতকগুলি অভ্রান্ত দিক্‌নির্দেশ আছে, যেগুলি পরের যুগের সমালোচকদের খুবই কাজে লেগেছিল। একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন,[৬]

"আমার ভারতবর্ষীয় শান্তপ্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করচে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। এক দিকে কবিতা আর এক-দিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিস্ফলতা এবং ঔদাস্য।"

'জয়দেব' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যে চিন্তার স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ্য করে থাকবেন যদিও এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্য জানা যায় না। কিন্তু তার পর থেকেই প্রমথ বাংলার লেখক হয়ে উঠলেন। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে আযৌবন মগ্ন হয়ে থাকবার জন্যেই সম্ভবত তিনি এক নতুন রসসৃষ্টি লাভ করেন, যা বাংলা সাহিত্যের রুচির সঙ্গে ঠিক মেলে না। কারণ 'জয়দেব' রচনার পরেই সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় এস্পার মেরিমির

Etruscan Vase নামে একটি গল্প অনুবাদ করেন 'ফুলদানি' নাম দিয়ে। এই গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ কঠোর সমালোচনা করেন। দুই কারণে রবীন্দ্রনাথ আক্রমণ করেন[৭]—

"প্রথমত ফুলদানির মত গল্প বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভূ'ত করা অনুচিত বলে; দ্বিতীয়ত পাকা ফরাসি লেখকের লেখা কাঁচা বাঙলা লেখকের অনুবাদে শ্রীভ্রষ্ট করা হয়েছে বলে। আমি শেষোক্ত আপত্তি গ্রাহ্য করি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যে বঙ্গসাহিত্যে চলতে পারে না সে কথা মানি নি। আমি অবশ্য সে সমালোচনা পড়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এরকম সমালোচনা আশা করি নি। তারপরেই আমি মেরিমের কার্মেন তর্জমা করি, কিন্তু সেটি শেষ করতে পারি নি বলে প্রকাশ করি নি। কার্মেন অনুবাদ করবার কারণ, তার বিষয়বস্তু ফুলদানির চাইতে ঢের বেশি অসামাজিক। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজ্‌মকে আমি কোনকালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করি নি। তার পরিচয় আমার 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধেও পাবেন।"

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে শিলাইদহের পল্লীপরিবেশে বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনা নিয়ে গল্প রচনায় মগ্ন সেই সময় প্রমথ চৌধুরীর এই শ্রেণীর ঐতিহ্যবিযুক্ত গল্প স্বভাবতই তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর মনের সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্য তাঁকে যে আকর্ষণ করত, তাঁর নিজের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করত তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ আছে 'পঞ্চভূত' রচনায়। রাজশাহীতে সেই সময় জজ ছিলেন লোকেন পালিত। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে গেলেন। সেখানকার সাহিত্যিক আসরে আসতেন জগদিন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শরৎকুমার রায়। যে-সব বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা চলত তার থেকেই রবীন্দ্রনাথ উপকরণ পেয়েছিলেন পঞ্চভূতের। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন লোকেনের সঙ্গে তর্কে তাঁর মতামতের অনুকূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং জগদিন্দ্রনাথ। এই সময় থেকে পরবর্তী কয়েক বৎসর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক রবীন্দ্রনাথ বাংলার জাতীয় আন্দোলন ও ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনায় মগ্ন হয়ে রইলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন ও অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন জাতীয়তাবাদী ও কর্মব্রতী নেতারূপে। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার চিন্তাধারা উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিম-বিবেকানন্দ যুগের পরিণামরূপে দেখা দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী কর্মী পুরুষরূপে পরিচিত নন। সুতরাং এই সময়ের আন্দোলনে তাঁকে সেরকম দেখা যায় না। কিন্তু তিনি প্রবন্ধ রচনায় বিরত ছিলেন না।

সাধারণের ধারণা এই যে, প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবল' রূপ বুঝি 'সবুজপত্রে'র যুগের। কিন্তু সবুজপত্র প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্বে 'ভারতী' পত্রিকাতে তিনি লিখেছিলেন 'কথার কথা', 'আমরা ও তোমরা', 'খেয়ালখাতা', 'তরজমা', 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ', 'সনেট কেন চতুর্দশপদী'। চলতি বাংলার পক্ষে প্রমথ চৌধুরী যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন ভারতী পত্রে দুটি প্রবন্ধে— 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু-ভাষা' (পৌষ, ১৩১৯) এবং 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' (চৈত্র, ১৩১৯)। বঙ্গভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ভারতীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন 'তেল নুন লকড়ি' নামে (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩১২)। এটি সম্ভবত গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল ১৯০৬-এ, পরে 'নানা কথা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরীর পরবর্তীকালের অন্য প্রবন্ধ থেকে ভাষাতে না হলেও মতামতে কিছু আলাদা। স্বদেশী যুগের প্রভাব যে তাঁর চিন্তার মধ্যেও প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তিনি বলছেন,

"আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশি না হই, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের তন মন ধন দেশের পায়ে বিকতে হবে, বিদেশের পায়ে নয়।"

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় বহু গানে কবি স্বদেশের পায়ে আত্মোৎসর্গ করবার জন্যই উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন। স্বদেশী শিল্প স্বদেশী আচার ব্যবহার রক্ষা, স্বদেশী চিন্তা ও ভাবনার অনুসরণ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কখনও গুরু প্রবন্ধ লিখেছেন কখনও ব্যঙ্গ করেছেন, কখনও বক্তৃতা করেছেন। রবীন্দ্র-জীবনের এই দিকটা মোটামুটি সকলেরই জানা। কিন্তু তাঁর এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে যেটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেটাই বিশেষ করে লক্ষ করবার। রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ বলেছেন সামাজিক সাম্প্রদায়িক অন্যান্য অনৈক্য দূর করে একপ্রাণ হয়ে উঠতে। একপ্রাণতা যদি না আসে তবে রাজনীতির প্রয়োজনেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারব না। হিন্দুসমাজে এই ভেদ ও আত্মবিরোধ ঘোচানোই দরকার হয়ে পড়েছে। সব রকম সামাজিক ভেদকে মেনে চলব অথচ বলব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এক হও। এরকম আত্মপ্রবঞ্চনা আমাদের বিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাবে মাত্র। প্রমথ চৌধুরীও যেন এরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন,

"যে প্রথা অবলম্বন করলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, এমন কি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহারে চিরবিরোধ থেকে যাবে, আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন জাতীয় জীবনের প্রসারতা লাভের বিরোধী, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন

করতেই হবে, তার কোনো প্রমাণ নেই। গতিমাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানভূমি আছে। একটি দিক নির্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্বাবস্থার দ্বারা নিয়মিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়।"

২

১৯৯২-তে রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গেলেন। বিলাতে থাকতেই তিনি প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' (প্রকাশ মার্চ ১৯১৩) পড়ে ফেলেন। সেখান থেকে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে একটি বিখ্যাত চিঠি লেখেন[৮] —

"বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখি নি। এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই— এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি— তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হয় নি— কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছে!"

প্রমথ চৌধুরীর মতো বুদ্ধিপ্রধান লেখকের কাব্যপ্রয়াস স্বাভাবিক কারণেই ভাবালুতা-বর্জিত এবং তীক্ষ্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে নাকি সেকালে 'কি-জানি-কি'-র কবি বলা হত।[৯] রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা সম্পর্কেই শুধু নয় বলাকার যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের উপভোগ' (১৩১৪ মাঘ) নামে প্রবন্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন। এই অভিযোগ সত্য হোক অথবা মিথ্যাই হোক রবীন্দ্রকাব্যের নিশ্চয়ই এমন কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল যার মধ্যে এই অভিযোগের সুযোগ ছিল। সেদিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর কাব্য ছিল রবীন্দ্রকাব্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রীতির। শুধু বক্তব্যের স্পষ্টতার জন্যই নয়, প্রমথ চৌধুরীর ভাষাতে ও শব্দব্যবহারে অবশ্যই অভিনবত্ব ছিল। অকাব্যিক শব্দের ব্যবহার করে প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই রবীন্দ্ররীতির সচেতন বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন। ব্যঙ্গপরায়ণতা তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিতার আবেশকে বিনষ্ট করাই এর লক্ষ্য। এই-সব রবীন্দ্র-বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর কবিতার গুণগ্রহণে কার্পণ্য করেন নি। আমাদের মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতারও সমান প্রশংসা করেছিলেন।[১০] দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাও ছিল রবীন্দ্ররীতির বিরোধী এবং নিবিষ্ট পাঠক জানেন প্রমথ চৌধুরীর কাব্যের

সঙ্গে একই গোত্রে ফেলা কিছু অসংগত হবে না। রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রানুগামীদের বিরাগভাজন হলেও প্রমথ চৌধুরীর কাছে শ্রদ্ধা হারান নি। তার প্রমাণ আছে 'পদচারণ' কাব্যের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' কবিতায় (ভাদ্র ১৩২০)। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা জানিয়ে অন্তত দুটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন।[১১] 'নারায়ণে'র প্রতিপক্ষ সবুজপত্রে এই দুটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। পাঠকের কাছে ঔদার্য প্রতিপন্ন করার জন্য তা নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত একাত্মতা অকৃত্রিম ছিল তাতে সন্দেহ করি না। এ কথা জোর দিয়ে বলবার কারণ রবীন্দ্রনাথকে প্যারডি করে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দবিদায়ে'র দক্ষযজ্ঞের পর দ্বিজেন্দ্রলালকে সমালোচনা করতেও তিনি ইতস্তত করেন নি। সেই প্রবন্ধটির নাম 'সাহিত্যে চাবুক' (রচনা-কাল মাঘ ১৩১৯)।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করবার কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যের সম্পর্কেও একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন। বিলাত থেকে রবীন্দ্রনাথ ফিরে আসেন ৬ অক্টোবর ১৯১৩তে। শান্তিনিকেতন থেকে ২৬ অক্টোবর তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন,[১২]

"তোমার গদ্যপ্রবন্ধ সবগুলিই পড়েছি। তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি— কোথাও ফাঁক নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাস-বুনানি। এ গুণটি কিন্তু প্রাচ্য নয়।···তোমার গদ্য রচনারীতির মধ্যে যে নৈপুণ্য আছে আমাদের দেশের পাঠকেরা তার পূরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়। গদ্যলেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখিনি।··· সম্প্রতি আমাদের গদ্যলেখা নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁদের হয়েছে।"

এর কিছুদিন পর প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় বিখ্যাত পত্রিকা 'সবুজপত্র' বেরল। সবুজপত্র রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করল। ১৩২১-এর বৈশাখ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ এতে কবিতা দিলেন 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা'। তার পরে রবীন্দ্রনাথ এতে বহু বিখ্যাত রচনা প্রকাশ করেছেন। এ কথা অবশ্য সত্য 'বলাকা'র যুগে রবীন্দ্রমানসের যে নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ হল তার পূর্বসূত্র রবীন্দ্রকাব্যে পূর্বেই ছিল। কিন্তু 'সবুজের অভিযান' প্রভৃতি রচনায় যে কবিচেতনার উদ্দামতা আছে, তা কিছু আকস্মিক বলেই মনে হয়। এর মূলে কিছু প্রতিক্রিয়া থাকা অসম্ভব নয়। তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন,[১৩]

"আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য মানুষকে গাল দেয় কারণ তাতে পৌরুষ নেই—

বরঞ্চ সেটা কাপুরুষেরই কাজ— কিন্তু যেখানে যথার্থ বীর্যের দরকার— যেখানে সয়তানের সঙ্গে লড়াই, যে সয়তানের হাজার কণ্ঠ এবং হাজার বাহু, সেখানে দেখ্‌তে পাই বড় বড় সব সাহিত্যিক গুণ্ডারা কেবল পোষা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়চে আর সেই বৃদ্ধ পাপের পঙ্কিল পা আদর করে চেটে দিচ্চে। তোমাদের এইসব লেখা পড়ে আমার উৎসাহ হয়⋯।"

আশ্চর্যের বিষয় এ দিকে সবুজপত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এত উৎসাহ, অথচ ব্যক্তিগতভাবে কবি ক্লান্ত এবং অনুভব করছেন তাঁর সাহিত্যকর্ম শেষ হয়ে এসেছে,[১৪]

"মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না— সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে— পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। তা ছাড়া আমারও সাহিত্যলীলা শেষ হয়ে এসেছে— এখন আমার গাণ্ডীব তোলবার শক্তি নেই। সেইজন্য তোমাকে আমি একটি নবীন লেখকমণ্ডলীর কেন্দ্র ও অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।"

বহু চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাশক্তির প্রভূত প্রশস্তি করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মুক্ত চিন্তা আমাদের পুরোনো চিন্তাভঙ্গিকে পরিবর্তিত করে দিচ্ছিল। মতামতের দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রমথ চৌধুরীর এই স্বতন্ত্রতা ছিল নিজেরই সৃষ্টি। বিদেশী সাহিত্য থেকে তিনি এর আদর্শ ও শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের আত্মস্মৃতি থেকেই এ কথা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-শক্তির উন্মেষ ও বিকাশের ধারা আছে যা আমাদের সমাজ ও দেশের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এজন্য রবীন্দ্রনাথের মননবিকাশের স্তরগুলি যথেষ্ট স্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৯১২-র য়ুরোপ-ভ্রমণের পর যে নূতন দৃষ্টি লাভ করলেন, সংকীর্ণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে মানবত্বের যে বিরাট এবং প্রশস্ত মূল্যবোধ উপলব্ধি করলেন, প্রমথ চৌধুরীর চিন্তা সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। তার প্রমাণ 'বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ' প্রবন্ধটি। প্রথম মহাযুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ অবিমিশ্র দুঃখ বলে ভাবতে পারেন নি। তাঁর 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় দুঃখ-নিশার আসন্ন অবসানের আনন্দ ধ্বনিত হয়েছে। মানবসভ্যতার যুগান্তর এসে যাচ্ছে বলে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধেও ঠিক এই মনো-ভাবই প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী আমাদের দৃষ্টিকে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। বিদেশী সাহিত্য ইতিহাসের শিক্ষাকে আমাদের

জীবনে গ্রহণ করতে বলেছেন। সবুজপত্র এই নূতন জগতের দ্বার-উন্মোচন করতে চেয়েছিল। চলতি ভাষা স্বীকার তো তার একটা দিক মাত্র। চলতি ভাষায় শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে নামিয়ে আনা হল মাত্র, যে শিক্ষা ছিল সাধুভাষার গ্রন্থে বদ্ধ। সবুজপত্র বলল শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রাত্যহিক জীবনে ভদ্র হওয়া রুচিমান হওয়া এবং বুদ্ধিকে শাণিত করা— বিবিধ বিদ্যাকে আয়ত্ত করে মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নতুন সভ্যতা ও সমাজের উপযোগী হওয়া। অতুলচন্দ্র গুপ্ত স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছিলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য বঙ্কিম-কথিত সর্বাঙ্গীণ বৃত্তির সমঞ্জস করা নয়, চরিত্র গঠন করাও নয়; উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ করে সভ্য হওয়া[১৫]। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী বললেন, পুরোনো দর্শন দিয়ে আমাদের আর চলবে না।[১৬] ভারতীয় বা পাশ্চাত্য প্রচলিত দর্শনের জায়গায় এ যুগে নতুন দর্শন সৃষ্টি করতে হবে। বরদাচরণ গুপ্তের লেখার প্রশংসা বিশেষভাবে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'নতুন কিছু' করতে হবে।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ এই নতুন বুদ্ধিবাদের আন্দোলনে যোগ দিলেন। 'বলাকা'র কবিতায় নতুন মূল্যবোধের কথা বললেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সমালোচনা করলেন ঐতিহ্যাকৃষ্ট জাতীয়তাবাদকে। 'ভাষার কথা'[১৮] প্রবন্ধে নতুন চলতি ভাষায় আদর্শকে সমর্থন করলেন যদিও প্রবন্ধটি সাধুভাষায় রচিত। তবে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এখানেই যে প্রথমোক্ত জন মূলত Essayist কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবনদার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় বুদ্ধির বাধা অপসারণ করতে চেয়েছিলেন— ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। এই ব্যক্তিচেতনা দিয়েই সমস্ত মানবজাতি বুদ্ধির ক্ষেত্রে এসে মিলিত হতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এই সমগ্রতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছিলেন।

উল্লেখসূত্র

১. প্রমথ চৌধুরী, 'আত্মকথা', পৃ. ৭৪-৭৫
২. 'আত্মকথা', পৃ. ৮৫-৮৬
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' ৫, পৃ. ১৩০, পত্রের তারিখ ২১ মে ১৮৯০।
৪. তদেব, পৃ. ১৩৫, পত্রের তারিখ ৩ জুন ১৮৯০।
৫. জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত রমেশচন্দ্র দত্তের চতুর্থ কন্যা সরলাকে বিবাহ করেন ১৮৯৪

খৃস্টাব্দে। ইনি আই. সি. এস. হয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ইংরেজিতে রমেশ-চন্দ্র দত্তের একটি উৎকৃষ্ট জীবনী রচনা করেন।

৬. রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র' ৫, পৃ. ১৫০-৫১
৭. প্রমথ চৌধুরী, 'আত্মকথা', পৃ. ৯৪-৯৫
৮. রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র' ৫, পৃ. ১৬৭, পত্রের তারিখ ২২ এপ্রিল ১৯১৩।
৯. প্রমথ চৌধুরী, 'আত্মকথা', পৃ. ৯১
১০. দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা'র আলোচনা করেন ১৩০১ অগ্রহায়ণের 'সাধনা' পত্রিকায়, 'আষাঢ়ে'র আলোচনা করেন ১৩০৫ অগ্রহায়ণের ভারতীতে; 'মন্দ্রে'র আলোচনা করেন ১৩০৯ কার্তিকের বঙ্গদর্শনে।
১১. সবুজপত্র, ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ এবং সবুজপত্র ১৩২৩ আষাঢ়
১২. চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১৬৯, পত্রের তারিখ ২৬ অক্টোবর ১৮৯৩। খুব সম্ভবত এই তারিখ মুদ্রণ-ভ্রান্ত। রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডের তারিখ ২৬ অক্টোবর ১৯১৩ [১০ কার্তিক ১৩২০] : দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৩৪ পাদটীকা।
১৩. চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১৭৮, পত্রের তারিখ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
১৪. চিঠিপত্র ৫, পৃ. ১৮৯
১৫. সবুজপত্র, ১৩২০ ফাল্গুন : 'শিক্ষার লক্ষ্য'
১৬. সবুজপত্র, ১৩২২ শ্রাবণ ও পৌষ : 'নব্যদর্শন'
১৭. সবুজপত্র, ১৩২৩ মাঘ : 'নতুন কিছু'
১৮. সবুজপত্র, ১৩২৩ চৈত্র।

প রি শি ষ্ট

রবীন্দ্রচর্চার পঞ্চাশ বছর

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চা কিছুমাত্র মন্দীভূত হয় নি। বরং তাঁর মৃত্যুর আগে এবং পরের বছরগুলি তুলনা করলে বিস্মিত হতে হয় রবীন্দ্রচর্চার ক্রমবৃদ্ধি দেখলে। এই বৃদ্ধির রূপ অনেক রকম। আগে তো শুধু রবীন্দ্রনাথের রসসাহিত্যগুলির আলোচনা হত। পরে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে বাঙালি পাঠক ক্রমেই অবহিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে তাঁর ছবি নিয়ে আলোচনা কদাচিৎ চোখে পড়ত। তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তার বিচার-বিশ্লেষণ তেমন হত না সাময়িক প্রয়োজন ছাড়া। রবীন্দ্রসৃষ্টি এবং রবীন্দ্রমনীষার নানা দিক ছাড়াও রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের এবং রবীন্দ্র-জীবনের বহু প্রসঙ্গ আজকাল প্রায়শই চোখে পড়ে— তার সবটাই যে তাঁর মহত্বকে প্রতিপন্ন করার জন্য তা নয়।

১৯৩১-এ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়স উপলক্ষে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বিশ্বভারতীর পক্ষে 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সংকলন-গ্রন্থটির অসাধারণত্ব এখানেই যে এতে বাংলার শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় মনীষী লেখকদের লেখা সংকলিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে তেষট্টিজন সুপরিচিত লেখক। এঁদের সকলের লেখার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি আছে। পরবর্তীকালে এই-সব লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা তাঁর নিকটে থেকে দেখেছেন তাঁদের দৃষ্টিতে এবং মনোভাবে বিস্ময় এবং মুগ্ধতার ভাবই ছিল বেশি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে যাঁরা তাঁকে নিয়ে লিখেছেন তাঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথ তখন নেহাত প্রশস্তির বিষয় না থেকে হয়ে উঠেছেন গবেষণার বিষয়। এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের সমাজে ও

দেশে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে, অনেক কিছুই নতুন করে ভাবতে হয়েছে। সেই-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতার কথা বার বার মনে হয়েছে। নতুন নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করে নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের মননচিন্তাকে বিচার করে দেখা হয়েছে পরবর্তীকালে। 'জয়ন্তী-উৎসর্গে' অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' নামে একটি নীতিদীর্ঘ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বলা অনাবশ্যক অতুল গুপ্তের মতো মনস্বী সমালোচকের ওই ছোটো লেখাটির মধ্যে অনেক ভবিষ্যৎ আলোচনার সূত্র নিহিত ছিল। পরবর্তী কালে উপনিষদ, কালিদাস ও সংস্কৃত সাহিত্যের এবং বৌদ্ধ আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের যোগ দেখিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে সেভাবে কিছুই আলোচনা হয় নি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বচেতনার পরিপ্রেক্ষিকায় রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করে দেখা এখন আমাদের অভ্যাস হয়েছে। সেকালে সেরকম চিন্তার সূত্রপাত হলেও তার তথ্যাশ্রয়ী আলোচনা তেমন দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিভিন্ন দিকের তথ্যপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা যেমন পরে ক্রমেই বেড়ে গেছে, তাঁর জীবনী নিয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ-বিশ্লেষণও তেমনি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী একটি মাত্র খণ্ডে বেরিয়েছিল ১৯৩৩এ। পরে এই বই বৃহৎ চারটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা তাঁর মৃত্যুর পর কী রকম বাড়ছে।

তাঁর জীবনের তথ্য সংগ্রহ এবং আলোচনা যেমন বাড়ছে, তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিচারমূলক (critical) আলোচনাও বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেই তাঁর চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনী, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রবাসী পত্রিকায় বের হতে থাকে। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রজীবনীর অনেক মূল্যবান উপকরণ ছিল। সেই উপকরণের যথার্থ অনুশীলন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে হয় নি। প্রভাতকুমারের মতো ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় কবির জীবনের তথ্য সংগ্রহ করে গেছেন। ইতিপূর্বে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটোখাটো জীবনী রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রভাতকুমার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যে-পরিকল্পনা নিয়ে সুদীর্ঘকাল ধৈর্যের সঙ্গে যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করে রাখছিলেন তার তুলনা তখন ছিল না। সেই সময় আর-একজন তরুণ দূরদর্শী রবীন্দ্রানুরাগী নীরবে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের কাজে নিরত ছিলেন। তিনি পুলিনবিহারী সেন। তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ দুজন গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বাঙালি কবি ও লেখকদের জীবনী রচনা ও পুস্তক সম্পাদনা করছিলেন। পুলিনবিহারী

তাঁদের সহকর্মী রূপে তাঁর নিজস্ব লক্ষ্যে আদর্শ স্থির করে নিয়েছিলেন। সজনী-কান্ত দাসই রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা ও শৈশব জীবন নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান লেখাগুলি শনিবারের চিঠিতে এবং পরে 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' বইতে বেরিয়েছিল ১৯৬০-এ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়' বইতে (১৯৪২) রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত বইয়ের ব্যবহারযোগ্য কালানুক্রমিক তালিকা এবং রবীন্দ্র-নাথের প্রথম রচনার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। সেই ছিল রবীন্দ্র-গবেষণার সূত্রপাত। পরে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী (১৯৬২) প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের বই এবং জীবনের ঘটনাকে মিলিয়ে। এ-সব বই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর সাহিত্যের আলোচনার নতুন পদ্ধতির এভাবেই সূত্রপাত।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে তাঁর মৃত্যুর দু বছর পূর্বেই রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ আরম্ভ হয়ে যায়। রচনাবলী প্রকাশ হওয়ায় রবীন্দ্রচর্চায় বিশেষ সুবিধা হয়। রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের গোড়াতে প্রকাশক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর বাল্য রচনা সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু উদ্যোক্তারা ইতিহাস রক্ষার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের বিতর্ক হয়। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্মতি দেন। বাল্যরচনা ও অন্যান্য কিছু রচনা 'অচলিত সংগ্রহে' আলাদা করে ছাপার ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুর পরেই বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত দ্রব্য, চিত্র ইত্যাদি দিয়ে রবীন্দ্রভবনের সূচনা করে দেন। তখন রবীন্দ্রভবন ছিল বর্তমান উদয়ন বাড়ির এক অংশে তিনটি ঘর নিয়ে। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে বর্তমান বিচিত্রা গৃহ নির্মিত হয়। ক্রমে নানা ভাবে বহু পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রচিত্র, রেকর্ড, আলোকচিত্র এবং সেইসঙ্গে ঠাকুরবাড়ির দলিল ইত্যাদিও নানা ভাবে সংগৃহীত হয়ে বর্তমানে রবীন্দ্রভবন রবীন্দ্রচর্চার প্রধান উপকরণ-সংগ্রহশালায় পরিণত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য ফোটো ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা কয়েক হাজার চিঠি এই সংগ্রহশালার সম্পদ। এ-সব উপকরণ নিয়ে কাজ করবার জন্য বাইরের থেকে গবেষকরা আসেন। এই সংগ্রহশালাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এবং রবীন্দ্রগবেষণার প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন বই অবিলম্বে সংগৃহীত হয়ে থাকে। কেবল বাংলায় প্রকাশিত বই নয়, অন্যান্য ভাষায় রচিত বইও যথাসম্ভব সংগ্রহ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত বিভিন্ন

দেশে প্রকাশিত বহু সংবাদপত্রের কর্তিকা রয়েছে রবীন্দ্রভবনে। রবীন্দ্রনাথের নানা দেশ ভ্রমণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এর থেকে গড়ে তোলা সম্ভব। এ-বিষয়ে কিছু কাজও হয়েছে। শুধু ভ্রমণ তো নয়, বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কী ভাবে গৃহীত হয়েছে তার বহু সংবাদ এই-সব কর্তিকা থেকে পাওয়া যায়। এ দিকটায় অনুসন্ধান এখনও তেমন হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত এই-সব উপাদান থেকেই তার আলোচনা সম্ভব।

এই রবীন্দ্রভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেই প্রভাতকুমার রবীন্দ্রজীবনীর বৃহত্তর সংস্করণগুলি প্রস্তুত করেছিলেন। এখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্যাশ্রয়ী কাজ করতে হলে রবীন্দ্রভবনেই আসতে হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের যুগ, সমকালীন ভারত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের পক্ষে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালাই একমাত্র স্থান নয়, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি সুপরিচিত প্রাচীন গ্রন্থশালাগুলিরও সাহায্য নিতে হয়। তাতে পুরাতন পত্রপত্রিকা ও বইয়ের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রবীন্দ্রভবন গ্রন্থশালাতে তার সব-কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। প্রভাতকুমারের পর প্রশান্তকুমার পাল যে রবীন্দ্রজীবনীর নতুন করে তথ্য সংগ্রহ করছেন, তার জন্য তাঁকে রবীন্দ্রভবন মূলত অবলম্বন করতে হলেও বিভিন্ন পুরোনো গ্রন্থশালারই সাহায্য নিতে হচ্ছে। প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী বৃহৎ চারটি খণ্ডে বেরিয়েছে। চতুর্থ ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। পরে এগুলি পরিবর্ধিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু জানতে গেলেই, সে রবীন্দ্রজীবন সম্পর্কেই হোক আর রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কেই হোক, পাঠককে এই বইটাই দেখে নিতে হয় প্রথমে। এ বই লিখতে তিনি বহু পত্রপত্রিকা দেখেছেন যার সবই যে শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়, তা নয়। শুধু রবীন্দ্রজীবনের ঘটনার জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে এবং তাঁর মনোজীবনের ভাবনার সূত্র অনুসরণ করতে প্রভাতকুমারকে ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি নানা বিদ্যার খোঁজ রাখতে হয়েছে। প্রভাতকুমার তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন 'রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক'। এ নামকরণ যথার্থ। প্রভাতকুমার যে-রকম ব্যাপক জ্ঞানের প্রস্তুতি নিয়ে জীবনী লিখেছেন, তাকে বলা যেতে পারে 'রবীন্দ্রবিদ্যা'। রবীন্দ্রজীবনীতে তিনি কালগত এবং ভাবগত পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলেছেন। তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং এ বইতে লেখকের চিন্তাশীল মনের আভাসও পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রচর্চায় রবীন্দ্রজীবনীকেই শেষ কথা বলে আমরা মনে করেছিলাম। কারণ

রবীন্দ্রনাথের আরও বিবরণাত্মক জীবনী বেরিয়েছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীর মতো তথ্যে ও ব্যাখ্যায় পূর্ণাঙ্গ আর কোনো বই ছিল না। কিশোরপাঠ্য ও বয়স্ক-পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা বিপুল। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রবন্দনার মনোভাবটিই প্রধান। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপালনীর ইংরেজিতে লেখা পরিমিত আয়তনের *Tagore : A Life* বইটির মূল্য অসাধারণ। তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সাহিত্যোপলব্ধির এমন চমৎকার সমন্বয় দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের জীবন নিয়ে কিছু লেখা হয়েছে স্মৃতিচারণমূলক, যেমন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'রবীন্দ্রস্মৃতি', মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' রানী চন্দের 'আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ', সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি', রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' (ইংরেজি গ্রন্থ *On the Edges of Time*)। নির্মলকুমারী মহলা-নবীশের 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে', সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশে', কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্যভ্রমণ' বইগুলি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর আশ্চর্য রমণীয় স্মৃতিচারণ : **Tagore on the Banks on the River Plate.** এই-সব স্মৃতিচারণ থেকে রবীন্দ্র-নাথের চরিত্ররূপটিকে যেমন পাওয়া যায় তেমনি কিছু কিছু ঘটনা ও তথ্য পাওয়া যায় যা পূর্ণাঙ্গ জীবনীরচনার পক্ষে মূল্যবান। যতই দিন যাচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই এই শ্রেণীর স্মৃতিকথা এবং ডায়েরি বিরল হয়ে এসেছে এবং এই রচনাগুলিই আকর-গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করছে।

তথাপি রবীন্দ্রনাথের জীবনের পদ্ধতিসংগত বস্তুনিষ্ঠ কালানুক্রমিক ইতিহাস লিখতে হলে বোধহয় একটু দূরত্ব থাকলে ভালো হয়। প্রভাতকুমার খুবই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন, যদিও জীবনী রচনার সময় মানসিক দূরত্ব বজায় রাখতেও সচেতনভাবে সচেষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর এই রকম একটি জীবনী রচিত হল, যাতে সেই দূরত্ব রক্ষা করা অনেকটা সম্ভব হয়েছে। প্রশান্ত-কুমার পালের 'রবিজীবনী'র প্রথম খণ্ড বের হয় ১৯৮২-তে। পরে আরও চারটি খণ্ড বেরিয়েছে। প্রশান্তকুমারের সম্মুখে রবীন্দ্রজীবনীর মতো পূর্ণাঙ্গ জীবনী ছিল, তথাপি তাঁর মনে হয়েছে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজ করার সুযোগ আছে। ইতিহাস এভাবেই বার বার লিখতে হয়। দু রকমের প্রয়োজন তাতে সিদ্ধ হয়। প্রথমত নূতন উপকরণের সাহায্যে অনেক সংক্ষিপ্ত উল্লেখকে পরিপূরণ করা যায়; দ্বিতীয়ত, নূতন উপকরণের সাহায্যে পূর্বোল্লিখিত ঘটনাকেই নতুন করে বিচার করে দেখা যায়। প্রশান্তকুমার দু রকমের কাজই করেছেন। প্রভাতকুমারের প্রতি উল্লেখ ও

বিবরণকেই তিনি বিচার করে দেখতে চেয়েছেন। অগ্রগামী লিখে গেছেন বলেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন নি। দুজনের রচনাপদ্ধতিতেও পার্থক্য আছে। প্রভাতকুমারের রচনা ন্যারেটিভ গোছের এবং পূর্বেই বলেছি তিনি শুধু তথ্যেরই উল্লেখ করেন নি, ভাব ও ভাবনারও বিশ্লেষণ করেছেন। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আশি বছরের জীবনকে তিনি যে চারটি খণ্ডে লিখেছেন তার প্রথম খণ্ড উনবিংশ শতাব্দী, দ্বিতীয় খণ্ড বিংশ শতাব্দীর প্রথম আঠারো বছর, তৃতীয় খণ্ড তার পরের পনেরো বছর এবং চতুর্থ খণ্ড অবশিষ্ট জীবনকাল নিয়ে। প্রশান্তকুমারের প্রধান মনোযোগ ঘটনা ও তারিখের অনুক্রম নির্ণয়ে ও ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্ধারণে। রবিজীবনীর প্রথম খণ্ড ষোলো বছরের ইতিহাস ৪০৪ পৃষ্ঠায়। দ্বিতীয় খণ্ড ছয় বছরের ইতিহাস ৩৭১ পৃষ্ঠায়; তৃতীয় খণ্ড আট বছরের ৩২৬ পৃষ্ঠায়; চতুর্থ খণ্ড সাত বছরের ৩৪৯ পৃষ্ঠায়; পঞ্চম খণ্ড সাত বছরের ৪৫৫ পৃষ্ঠায়। এতেই বুঝতে পারা যায় তিনি চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতি দিনের ঘটনা সংগ্রহ করতে, প্রতি ঘটনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং বিবরণ সংগ্রহ করতে। ঘটনা বলতে শুধু সাংসারিক ব্যাপার নয়, গান রচনা, কবিতা রচনা, অভিনয়, গ্রন্থপ্রকাশ, বন্ধুসংসর্গ, চলাচল ইত্যাদি এবং তাদের সম্পর্কে পত্রিকায় বইতে বা অন্য কোনো স্মৃতিকথায় ধৃত মন্তব্য বিবরণ সংগ্রহ করে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো। প্রশান্তকুমার এতে কিছু নতুন ধরনের দলিল ও প্রমাণপত্র ব্যবহার করেছেন। জমিদারির কাগজপত্র, সমকালীন সংবাদপত্র, সরকারি রিপোর্ট— এ-সবও রবিজীবনী রচনার উপকরণ। পঞ্চম খণ্ড যে সময়সীমায় পৌঁছেছে অর্থাৎ ১৯০৭-এ তখনও রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি কাগজপত্র সংরক্ষিত হত না। তাঁর খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অনুভূত হয়েছে। হয়তো পরবর্তী খণ্ডগুলি রচনার সময়ে রবিজীবনীর লেখককে এতখানি নানা জায়গায় হাতড়ে বেড়াতে হবে না। এই পাঁচ খণ্ডেই তিনি যে বিস্ময়কর অনুসন্ধানের নিদর্শন দিয়েছেন, রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে তার তুলনীয় শীঘ্র কিছু পাওয়া যাবে মনে হয় না।

রবীন্দ্রজীবনী এবং রবিজীবনী এই দুটি বৃহৎ তথ্যমূলক গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের বই অবলম্বনে এ ধরনের বড়ো কাজ বিশ্বভারতীর বাইরে এ পর্যন্ত হয় নি। ১৯৯১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বইয়ের কপিরাইট বিশ্বভারতীর অধিকারে বলেই বাইরে থেকে রবীন্দ্রগ্রন্থসম্পাদন -জাতীয় কাজ করা সম্ভব হয় নি। বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের প্রধান এবং বলতে গেলে একমাত্র কাজ হচ্ছে রবীন্দ্র-রচনাবলী এবং আলাদা আলাদা ভাবে রবীন্দ্রনাথের

বই প্রকাশ করা। রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে ১৯৩৯-এ। পরে ১৯৭৪ সালে সাতাশ খণ্ডে এর প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের দুটি প্রধান সাহিত্যকীর্তি এর অন্তর্ভুক্ত হয় নি: তাঁর চিঠি এবং তাঁর গান। গীত-বিতানে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংগৃহীত হয়েছে। প্রভাতকুমার গানের কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করে রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠকের পক্ষে অতিপ্রয়োজনীয় কাজ করেছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রতি খণ্ডে যে মূল্যবান গ্রন্থপরিচয় সংযোজিত আছে, পাঠকদের পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। রবীন্দ্ররচনা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেয়ে যাওয়াতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে এটাই প্রাথমিক অবলম্বন। এই তথ্য এবং রবীন্দ্রজীবনী এবং রবিজীবনীর দেওয়া তথ্যের সাহায্যেই বিশ্বভারতীর বাইরে পাঠকসমাজ কোনো কাজ আরম্ভ করতে পারেন। গ্রন্থপরিচয়ে বিচার বা বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা থাকে না। এগুলি মূলত বিবলিওগ্রাফিক্যাল। কোনো বইয়ের সংস্করণগত পাঠবিভিন্নতা, অন্যত্র এ-সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ— এই ধরনের তথ্যই গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া থাকে। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে গ্রন্থপরিচয় বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্বভারতীর অনুমোদন নিয়ে নতুন ভাবে বিন্যাস করে, কিছু অগ্রথিত রচনা সংগ্রহ করে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী জনসাধারণে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই সংস্করণে গবেষণার নতুন উপাদান কিছু না থাকলেও রবীন্দ্রচর্চার প্রসারে যে প্রভূত সহায়তা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রার্থী গবেষক-ছাত্র এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে উৎসুক পাঠককে সাধারণত এই রচনাবলীকেই ব্যবহার করতে দেখা যায়। আজকাল যে-কোনো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে এই রচনাবলীর সেটকে আলমারির শোভা বর্ধন করতে দেখি। এর পরেও রচনাবলী দুবার ছাপা হয়েছে— তবে এখনও কোনোটিই সম্পূর্ণ হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রচনাবলীর নতুন করে মুদ্রণ আরম্ভ করেছেন ১৯৮০ থেকে। এখন পর্যন্ত এর পনেরোটি খণ্ড বেরিয়েছে। উপদেষ্টামণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করে প্রথমবারের শ্রমসাধ্য কাজটি প্রধানত করেছিলেন স্বর্গত অমিয়কুমার সেন। দ্বিতীয়বার করছেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয়বারে পাঠ অনুসরণ এবং বিন্যাসে অধিকতর সতর্কতার ফলে এটি শুধু সাধারণ পাঠকের নয় গবেষকদের পক্ষেও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষ উপলক্ষে বিশ্বভারতী রচনাবলীর একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। সুলভ হলেও এটি নয়নশোভন এবং এতেও পূর্ববর্তী সংস্করণের গ্রন্থপরিচয়টি যথাযথভাবেই দেওয়া আছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী বা রবীন্দ্রগ্রন্থের সম্পাদনার কাজ যেটুকু হয়েছে, সেটা বিশ্বভারতীই করেছে। রচনাবলী ছাড়া আলাদা আলাদা বইয়ের ক্রিটিক্যাল বা বিচারমূলক সম্পাদনা বিশ্বভারতীর উদ্যোগে সেরকম হয় নি। এই সূত্রে উল্লেখ করা যায় সূর্যাবর্ত নামে শঙ্খ ঘোষের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি নির্বাচিত সংকলন বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন ১৯৮৯-তে। রবীন্দ্রনাথ সঞ্চয়িতায় যে কবিতা নির্বাচন করেছিলেন সূর্যাবর্তে তার থেকেও পুনর্নির্বাচন করে এবং কিছু সঞ্চয়িতায় অগ্রথিত কবিতা দিয়ে ভিন্ন রুচিতে এটি করা হয়েছে। কবিতানির্বাচনে সাহিত্যরুচিই বড়ো কথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ সঞ্চয়িতার প্রকাশক হয়েও রবীন্দ্রচর্চায় নতুন রুচিকে স্বীকার করে নিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের বইগুলি প্রচুর পরিমাণে প্রাসঙ্গিক সহায়ক তথ্য এবং উদ্‌ধৃতি সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব সম্পাদকীয় সংযোজন একটি বিশিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করে এসেছে। এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন পুলিনবিহারী সেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন আর-একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি কানাই সামন্ত। তাঁদের উদ্যোগে বিশ্বভারতী এমন বই প্রকাশ করেছেন যে-বই রবীন্দ্রনাথ লিখে যান নি। কিন্তু বিভিন্ন রচনায় তাঁর উক্তি, মন্তব্য, আলোচনা, ভাষণ অথবা প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। এরকম রচনা সংকলন করে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন ভারতপথিক রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পল্লীপ্রকৃতি, সংগীতচিন্তা প্রভৃতি বই। এইরকম রচনা সংকলন করে সুদীর্ঘ ভূমিকা যোজনা করে এখনও প্রকাশিত হচ্ছে বিবিধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা। এর প্রথম বই 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা' বেরিয়েছিল ১৯৮২-তে। এর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিশ্বভারতীর উদ্যোগে কাজ হলেও এই বইয়ের প্রকাশক বিশ্বভারতী নয়।

পুলিনবিহারীর করা টেক্‌সচুয়াল এডিটিংয়ের দৃষ্টান্ত সন্ধ্যাসংগীত ১৯৬৯-এ বেরিয়েছিল। এই সম্পাদনার উদ্দেশ্য কোনো সঠিক পাঠনির্ণয় করা নয়, বিভিন্ন সংস্করণে কবি যে-সব পাঠ পরিবর্তন করেছিলেন তাদের সংকলন। কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। পুলিনবিহারীর এই আদর্শে পরে তৈরি হয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—কানাই সামন্তের দ্বারা প্রস্তুত। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ও 'রাজা ও রানী' করলেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। এই আদর্শে 'চিত্রাঙ্গদা'র সংস্করণ তৈরি করেছেন অশ্রুকুমার সিকদার। পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখরের সম্পাদনায় 'বাংলা শব্দতত্ত্বে'র নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হল।

গ্রন্থসম্পাদনার আরও দুটি পদ্ধতি পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত। তাদের একটিকে

বলা যায় হিস্টরিক্যাল পদ্ধতি আর একটিকে বলা যায় ক্রিটিক্যাল পদ্ধতি। ইতিহাসানুগ সম্পাদনার দৃষ্টান্ত একটিই আছে। নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের করা 'জীবনস্মৃতি' (১৩৫০)। এই বইতে সংযুক্ত টীকাটিপ্পনিগুলি জীবনস্মৃতির ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল, গ্রন্থে উল্লিখিত নানা ঘটনা ও ব্যক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই বইয়ের সম্পাদনার বিশিষ্টতাই সেখানে। বিশ্বভারতীর আর কোনো বই এই রীতিতে সম্পাদিত হয় নি। ক্রিটিক্যাল পদ্ধতিতে সম্পাদিত বই বিশ্বভারতী একটিই প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' প্রবোধচন্দ্র সেন নতুন-ভাবে বিন্যস্ত করে রবীন্দ্রনাথের ছন্দসম্পর্কিত অসংকলিত বিক্ষিপ্ত রচনা সংকলন করে দীর্ঘ বিচারাত্মক টীকাসহ সম্পাদনা করেছেন। তবে ক্রিটিক্যাল বলা হচ্ছে এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পরিভাষা, বক্তব্য এবং দৃষ্টান্তগুলিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। এটি বেরিয়েছিল ১৯৬২-তে। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের এই রীতির রচনাবলী এডিটিংয়ের দৃষ্টান্ত ওই একটিই। প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৪৬) সুপরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের বহু বই এবং পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার কাজ এখনও বাকি আছে। কয়েক বছর আগে 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা' নামে পাণ্ডুলিপির পরিচয়াত্মক দুই খণ্ড বই বেরিয়েছিল। প্রথম খণ্ডে ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি মালতী পুঁথির সম্বন্ধে আলোচনা— সেটি করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেন। পুঁথির কয়েক পৃষ্ঠার ফোটোচিত্র এতে ছাপা হয়েছিল। তা ছাড়া তাতে ছিল প্রমথনাথ বিশীর একটি মূল্যবান সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার'। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল মালঞ্চ নাটকের পাণ্ডুলিপি পরিচয়, মালঞ্চের নাট্যরূপ দেওয়ার কাল-নির্ণয়, মালঞ্চের বিভিন্ন খসড়ার পরিচয়। এতে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ ছিল 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা: উন্মেষ'। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৯৬৫-তে, দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে ১৯৬৮-তে। এই দুই খণ্ড প্রকাশের পর পাণ্ডুলিপি-পরিচয়জ্ঞাপক 'রবীন্দ্রবীক্ষা' প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ চিঠিপত্রের সম্পাদনা। এ কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল ১৯৪২-এ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সময়েই। সেই সময়ে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল—

'বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশবিভাগ এই সকল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া চিঠিপত্র নামে পর্যায়ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে কবির জীবিতকালে ছিন্নপত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী এবং পথে ও পথের

প্রান্তে নামে তিনখণ্ড পত্রসংগ্রহ ['পত্রধারা' নামে] তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। রচয়িতার চিরন্তন অধিকার বলে তিনি এই-সকল গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রের বহুস্থানে পরিবর্তন ও পরিবর্জন করিয়াছেন। *চিঠিপত্র* নামে এখন যে-সকল পত্র-সংগ্রহ বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে তাহাতে একান্ত অন্তরঙ্গ বা অবান্তর কোনো অংশ ভিন্ন পরিবর্জনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব না এবং পাঠের কোনো পরিবর্তন করিব না, বর্জিত অংশ যথারীতি চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইবে।'— চিঠিপত্র ১-এর ভূমিকা।

প্রথম খণ্ড কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্র। তার পর ১৯৮৬ পর্যন্ত তেরোটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন খণ্ড রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, কন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, প্রমথ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু, কাদম্বিনী দেবী, নির্ঝরিণী সরকার, প্রিয়নাথ সেন, হেমন্তবালা দেবী ও তাঁর পুত্রকন্যা, দীনেশচন্দ্র সেন, অমিয় চক্রবর্তী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা চিঠির সংগ্রহ। প্রথম দিকের খণ্ডগুলি তত সম্পূর্ণ ছিল না। পরে ক্রমেই পূর্ণতর হয়েছে। বিশেষত জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা ষষ্ঠ খণ্ড থেকে চিঠির পরিচয়জ্ঞাপক টীকার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তবে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা পত্রসংগ্রহের টীকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্রগুচ্ছ সম্পূর্ণই টীকাবিহীন। আবার রবীন্দ্র-রামানন্দ পত্রাবলীতে যথাসম্ভব টীকা সম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে পত্রখণ্ড সম্পাদনায় সর্বত্র সমতা রক্ষা করা হয় নি। তার কারণ বোধহয় চিঠিপত্র প্রকাশে বিশ্বভারতী সেরকম ভাবে কোনো পরিকল্পনা সরকারি ভাবে অবলম্বন করে নি। সেইজন্যই কবির মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে চিঠিপত্রের মাত্রই তেরোটি খণ্ড বেরিয়েছে। চিঠিপত্রের যে সম্পাদিত সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছে সবটাই বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা বেসরকারি উদ্যোগে হয়েছে এবং গ্রন্থনবিভাগ সেগুলি প্রকাশ করেছে। বিশ্বভারতী এজন্য কোনো দপ্তর এবং কর্মীমণ্ডলী গঠন করেন নি। অবশ্য রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প নামে একটি বিভাগ গ্রন্থনবিভাগ খুলেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল গ্রন্থনবিভাগের মুদ্রণের উপযোগী সংস্করণ প্রস্তুত করে দেওয়া। বিভাগটি কাজের পরিমাণের তুলনায় খুবই ছোটো। এই বিভাগ থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে 'রবীন্দ্র-বীক্ষা'। মানসী পাণ্ডুলিপি পরিচয়, রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপিকোষ, রবীন্দ্র-রচনার সূচী প্রভৃতি কিছু কাজে এই বিভাগটি বর্তমানে নিরত।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের বাইরে রবীন্দ্রচর্চার সংগঠিত সংস্থা কলকাতার রবীন্দ্রচর্চাভবন। এই ভবনটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৫-তে। প্রধানত যে একজন রবীন্দ্রোৎসাহী ব্যক্তি এই ভবনটি গড়ে তুলেছেন তিনি সোমেন্দ্রনাথ বসু। এখানে অবশ্য রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়। প্রধানত এটি ছিল রবীন্দ্রসাহিত্য শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনামূলক বইও প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের চিন্তা কর্ম রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জুড়ে থাকলেও ঠাকুরবাড়ি, ব্রাহ্মধর্ম, রামমোহন এবং রবীন্দ্রসান্নিধ্যের বিভিন্ন ব্যক্তি, অ্যাণ্ডরুজ, পিয়ারসন ইত্যাদি, ঠাকুর-বাড়ি-প্রভাবিত বাঙালি সমাজের কর্মক্রিয়ার আলোচনাতেই রবীন্দ্রচর্চাভবন নিরত। ঠিক এইরকম রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সম্পূর্ণ উৎসর্গিত আর কোনো সংস্থা রবীন্দ্রভবনের বাইরে নেই। এরই আদর্শে কলকাতার বাইরেও এই নামেই কয়েকটি সংস্থা আছে।

কেবলই রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠ, রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়ন, পরীক্ষাগ্রহণ এবং উপাধি বিতরণ গবেষণা বই প্রকাশ করার মতো উদ্দেশ্য নিয়ে আর কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নেই। কিন্তু এ দেশে বোধহয় এমন একটি পত্রিকা নেই যাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু লেখা বের হয় না। এককালে প্রবাসী, বিচিত্রা পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা ছাড়া তাঁর সম্পর্কে বহু লেখা ও সংবাদ প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা রবীন্দ্ররচনাবলীর সমালোচনা সূত্রে অনেক মূল্যবান লেখা প্রকাশ করেছিল। ১৯৪২ (১৩৪৯) থেকে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রকাশ। এতে নানা বিষয়ের সারবান প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত লেখাই প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশ ছিল এর নিয়মিত কর্তব্য।

কিন্তু এ-বিষয়ে 'দেশ' পত্রিকার উদ্যমই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠার (১৯৩৩) প্রথম সংখ্যা থেকেই এতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখা বের হয়ে আসছে। আটান্ন বছর রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ বেরিয়েছে সাতশো-র বেশি। আমাদের দেশে শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ পত্রিকাগুলির একটা অবশ্যকরণীয় কাজ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশও আজকাল অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রবীন্দ্রসংখ্যারই পরে দেশ নাম দিয়েছে সাহিত্যসংখ্যা। রবীন্দ্রনাথের জন্মমাসটিকে উপলক্ষ করে বাংলা সাহিত্যের কোনো কোনো দিকের বিশেষ আলোচনাই এর উদ্দেশ্য। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের চিঠি ছাপা অথবা তাঁর

সম্বন্ধে প্রবন্ধপ্রকাশ না করে কোনো সাহিত্যসংখ্যাই সম্পূর্ণ হয় নি। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র প্রবন্ধের মধ্যে বেশ-কিছু প্রবন্ধ রবীন্দ্র পর্যালোচনায় স্থায়িত্ব লাভ করেছে। তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, পুলিনবিহারী সেন, অমল হোম, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, শান্তিদেব ঘোষ, বিমলচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি প্রবীণ লেখকদের রচনায় ছড়িয়ে আছে নানা তথ্য, স্মৃতি, ব্যাখ্যা। আবার বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিত দত্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির রচনা সাহিত্যরস-বিশ্লেষণে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে যাঁরা স্মরণীয় হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এমন লেখক কমই আছেন যাঁর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় কোনো-না-কোনো রচনা দেশে প্রকাশিত হয় নি। সৌরীন্দ্র মিত্রের 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'পান্থজনের সখা'র রচনাগুলি দেশেই বেরিয়েছিল। বিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' (১৯৫২) এবং শিবনারায়ণ রায়ের 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' (১৯৫৪) একালে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা আলোচনার সূচনা ঘটিয়েছিল। শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রনাথের গান, নাটক অভিনয় সম্পর্কে বহু রচনা দেশে বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখে-ছিলেন দেশে। এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। রবীন্দ্রপ্রতিভার আরো নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন সময়ে এমন সব লেখা দেশে বেরিয়েছে, যা পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। তাঁর বিশ্ববীক্ষা, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, তাঁর বন্ধুজন, দেশ-বিদেশে তাঁর সমাদর, সংস্কৃত ও বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের গভীরতা, ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিকতা, বাংলার জাতীয় জাগরণে তাঁর ভূমিকা ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে যোগ্যব্যক্তিরা দেশের পাতায় পর্যালোচনা করেছেন। এর অনেক রচনাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে রবীন্দ্রচর্চায় নির্দেশক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণীয় হয়েছে।

রবীন্দ্রচর্চায় দেশ পত্রিকার একটি মূল্যবান দান হল রবীন্দ্রনাথের চিঠি প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের চিঠি এতে মুদ্রিত হয়েছে প্রায় দু হাজার। এই চিঠিগুলি সাধারণত রবীন্দ্রভবন থেকেই বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে সংগৃহীত এবং মূল্যবান টীকা দিয়ে সম্পাদিত। ১৯৩৫ সালেই দেশ পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসরে রবীন্দ্রনাথের চিঠি প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুর পর যাঁদের কাছে লেখা চিঠি ছাপা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আছেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, মহিমচন্দ্র ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নির্মলকুমারী মহলানবীশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ,

অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহু স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের চিঠি পরে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। দেশে প্রকাশের সময় টীকাটিপ্পনি দিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদনা করানো হয়েছে। প্রথম দিকের বহু পত্রের টীকা লিখেছেন পুলিনবিহারী সেন, পরে লিখেছেন প্রধানত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। যতদিন এ-সব পত্র বিশ্বভারতীর চিঠিপত্র সিরিজে প্রকাশিত না হচ্ছে ততদিন এই পত্র এবং টীকা ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে আকর হিসাবে গণ্য হবে।

সংস্থা বা গোষ্ঠীগত ভাবে রবীন্দ্রচর্চা ছাড়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে চর্চার পরিমাণ গত পঞ্চাশ বছরে এতই বেড়েছে যে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া সীমাবদ্ধ পরিসরে সম্ভবই নয়। এ-সব অবশ্য প্রায় সবটাই উপকরণ সংগ্রহ নয়, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, কল্পনা ও কর্মের পর্যালোচনা। এর মধ্যেও কিছু সাধারণ প্রবণতা ও প্রকৃতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দুটি প্রধান উপলক্ষ ঘটেছিল তাঁর সামগ্রিক প্রতিভার পরিচয় গ্রহণের। একটি তাঁর জন্মশতবর্ষে, আর-একটি তাঁর জন্মের একশো পঁচিশ বর্ষে। ১৯৬১-তে জন্মশতবর্ষে বেশ কয়েকটি মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরে সম্বর্ধনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' এবং *Golden Book of Tagore*। তার পরেই হল একশত বৎসরে। দ্বিতীয় উপলক্ষটি প্রথমবারের চেয়েও ব্যাপক আকার ধারণ করে। এবার রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালিত হয় স্বাধীন ভারতে সরকারের সহযোগিতায়। সাহিত্য অকাদেমি, সংগীত-নাটক অকাদেমি, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব সমিতি যে-সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল, তারা ছাড়াও ব্যক্তি প্রকাশক ও সংস্থাগত ভাবে স্মারকগ্রন্থ বেরিয়েছে। মৃত্যুর কুড়ি বছরের মধ্যেই জাতির কৌতূহল অনুসন্ধিৎসা বিচার ও বিশ্লেষণে কত বৈচিত্র্য অর্জন করেছে এই গ্রন্থগুলি তার নিদর্শন। সাহিত্য অকাদেমির স্মারকগ্রন্থ *Rabindranath Tagore 1861-1961 : A Centenary Volume* থেকে যে-কোনো পাঠকই সম্ভ্রমের সঙ্গে লক্ষ করবেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও মানব-সংস্কৃতিতে তাঁর দানের চিন্তা ভারতবর্ষের বাইরেও মনীষীদের চিত্তকে অধিকার করেছে। বিভিন্ন দেশের ভাবুক লেখকরা তাঁর যে-বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি করে লক্ষ্য করছেন, সেটি হচ্ছে তাঁর বিশ্বমানবতাবোধ। কবিতা-গল্প-উপন্যাসের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে যে-মুক্ত চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, সেটা তাঁদের বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছে। নোবেল প্রাইজ

পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দৃষ্টিপথে এলেন, আর কিছুদিন পর তাঁরা পেলেন রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতার পরিচয়। তিনি বিভিন্ন দেশে যে-সব ভাষণ দিলেন সাহিত্য তার বিষয় নয়। রাশিয়ায় গিয়ে তিনি আগ্রহ দেখালেন তাদের দেশ গঠনে। পৃথিবীর শান্তি-আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছেন— জওহরলাল নেহরু এই রবীন্দ্রনাথকেই বেশি করে জানতেন, তাঁর শিল্পকীর্তির চেয়েও। ইংরেজ লেখক রিচার্ড বলেছিলেন—

I believe that such men as Rabindranath Tagore are prophets of this desireable achievements. It is-useful today for a European to look at him from this point of view.

এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের একটা ভাবমূর্তি বাংলার বাইরে গড়ে উঠেছে। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ছিলেন কবি। তাঁর স্মৃতিচারণে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ যেন আর সুখদুঃখপীড়িত মানুষ নন, তিনি দেবোপম আলোকোজ্জ্বল পুরুষ।

কিন্তু বাঙালি লেখকরা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবোধে বিশ্বাসী হলেও তাঁকে তাঁরা নিজেদের মধ্যেই একান্তভাবে দেখতে অভ্যস্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাস, জাতীয় আন্দোলন, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষানীতি এই-সব নানা দিকের আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থ 'রবীন্দ্রায়ণ'-এ। এর প্রথম খণ্ডটি প্রধানত সাহিত্য-বিষয়ক। দ্বিতীয় খণ্ডটি রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যান্য দিক নিয়ে। তাতে চিত্রকলা সংগীত লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান-কৌতূহল নৃত্যনাট্য ইত্যাদি বিষয়ের রচনাও আছে। রবীন্দ্রচর্চার বিষয়ের ক্রমপ্রসারণই এর দ্বারা সূচিত। গোপাল হালদার -সম্পাদিত স্মারকগ্রন্থটির প্রবন্ধগুলি সামাজিক যোগ বিশ্লেষণের দিক দিয়ে রচিত। জন্মশতবর্ষে আরও কয়েকটি বই বেরিয়েছিল যাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশবাসীর চিন্তার ব্যাপকতার পরিচয় নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটে উঠেছে।

শুধু তো বাংলা ভাষাতে নয়, ভারতের অন্য ভাষাতে যেমন তেমনি ইংরেজিতেও রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপকতা দেখা যায়। অসমীয়া, গুজরাতী, হিন্দি, কন্নড়, মালয়ালম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলুগু, উর্দু ভাষাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বই লেখা হয়েছে। তবে এ-সব বইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা সাধারণ পরিচয়ই পাওয়া যায়। হিন্দিতে বিষ্ণু প্রভাকর যেমন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে মৌলিকতা-পূর্ণ বই লিখেছেন। সেরকম বই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অন্য ভাষায় লেখা হয় নি। ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সর্বস্বীকৃত। সেই সূত্রে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তুলনাও নানা প্রসঙ্গে এসে পড়ে। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে নানা প্রদেশ

থেকে শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা আসতেন ; গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁরা ফিরে গিয়েছেন এবং স্বদেশে রবীন্দ্রচর্চার পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। এরকম একজন শ্রদ্ধেয় নাগিনদাস পারেখ। তিনি এবং উমাশংকর যোশীর মতো বাংলা জানা ব্যক্তি গুজরাতে রবীন্দ্রচর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে তুলেছেন। হিন্দি অসমীয়া এবং ওড়িয়া লেখকরা প্রায় সবাই বাংলা জানেন। সেজন্য রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁদের প্রবেশ সহজ ও অনায়াসসিদ্ধ। ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার প্রসঙ্গে সাহিত্য অকাদেমির কথা আসবেই। রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে সাহিত্য অকাদেমিরই উদ্যোগে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কলকাতার বাইরে ইংরেজিতে বই বেরিয়েছে বিভিন্ন শহর থেকে— দিল্লি, মাদ্রাজ, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, লাহোর। তাদের কতকগুলি রবীন্দ্রবক্তৃতামালার সূত্রে রচিত, কতকগুলি স্বাধীনভাবে রচিত। লাহোরের Tagore Memorial Publication থেকে অন্তত পাঁচটি বই বেরিয়েছিল। এগুলি সম্ভবত (তারিখ নেই) জন্মশতবর্ষের আগেই বেরিয়েছিল। জন্মশতবর্ষে ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদ অথবা রবীন্দ্রবক্তৃতামালার সৃষ্টি হয়। এই পদে নিযুক্ত অথবা আমন্ত্রিত পণ্ডিতরা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। এই-সব ভাষণ প্রধানত রবীন্দ্রনাথের মানবকেন্দ্রিক দর্শন অথবা তাঁর কবিতা গল্প ইত্যাদি সাহিত্য প্রসঙ্গে। আবার কোনো কোনো ভাষণ তুলনাত্মক যেমন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, কিংবা রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁদের অনেকেই বাঙালি যেমন কাজী আবদুল ওদুদ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি, আবার অবাঙালি পণ্ডিত আছেন যেমন মুল্‌করাজ আনন্দ, কোমারাবোলু চন্দ্রশেখরন, বিশ্বনাথ নারবানে, গঙ্গাধর খানোলকর, সরযূপ্রসাদ চৌবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের বাইরে রবীন্দ্রচর্চা সম্বন্ধে কিছু ভেবে নিতে পারি। পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু রচনাবলীর অনুবাদ (অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে) মাত্র দুটি ভাষাতেই হয়েছে রুশ এবং জাপানীভাষায়। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি বইগুলির প্রকাশক বিলাতের ম্যাক-মিলান কোম্পানি। কিন্তু রবীন্দ্রচর্চা বলতে যে অনুসন্ধান প্রয়াস বোঝায় বাইরে তার সুযোগ এবং দৃষ্টান্ত কম। তুলনামূলকভাবে শেক্‌সপীয়রের কথা আসে। শেক্সপীয়র-চর্চা শুধু ইংলণ্ডেই বদ্ধ থাকে নি। নানা দেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পর্যায়ে শেক্সপীয়র-চর্চা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও হয়। ইংলণ্ডের

বাইরে শেক্সপীয়রকে নিয়ে লেখা হয়, গবেষণা হয়ে থাকে। বাইরে যে-সব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয়, কিংবা ভারতচর্চা (Indian Studies) হয়ে থাকে রবীন্দ্রসাহিত্য সেখানে অনুশীলিত হয়। পরিপূর্ণভাবে না হলেও কিয়দংশে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হয় বটে, কিন্তু আলাদা করে রবীন্দ্রনাথের উপর গুরুত্ব দেওয়া নেই। উইলিয়ম র‍্যাডিচি লণ্ডনেই বাংলা পড়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা নির্বাচন করে অনুবাদ করেছেন। পেঙ্গুইন সেই সংকলন প্রকাশ করেছে ১৯৮৫-তে। বিদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। সেটন হল ইউনিভারসিটিতে ডরোথি হিউজ বেয়ারার ১৯৭১-এ ইয়েট্‌স্-এর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। হেলেন লিজা গারবার প্লেটো এবং রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের তুলনা করে পিএইচ. ডি. পেয়েছিলেন ১৯৪০-এ, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। স্টিফেন হে ইতিহাসের ছাত্র। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ. ডি. পান ১৯৫৬-তে রবীন্দ্রনাথের চীন ও জাপানের প্রদত্ত ভাষণ বিষয়ে। ইনি পরে একটি বড়ো বই লিখেছেন *Asian Ideas East and West : Tagore and his Critics in Japan, China and India* নামে ১৯৭০-এ। এঁর আর-একটি বই *Rabindra-nath Tagore in America* (১৯৬২)। এরকম প্রথম উপাদান সংকলন ছিল অ্যালেক্স অ্যারনসনের *Rabindranath through Western Eyes.* বেরিয়েছিল ১৯৪৩-এ। আমেরিকানদের মধ্যে রবীন্দ্রচর্চা করেছেন মেরি লাগো। ১৯৬৯-এ তিনি মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণানিবন্ধ রচনা করলেন ইংরেজি সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প নিয়ে। পরে তিনি *Rabindranath Tagore* নামে ১৯৭৬-এ বস্টন থেকে বই প্রকাশ করেন। এঁরই সম্পাদিত সুপরিচিত বই *Imperfect Encounter,* ১৯৭২। এতে রদেনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠি (১৯১১-১৯৪১) মুদ্রিত হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হয় কেমব্রিজ ম্যাসাচুসেটস থেকে। অ্যারনসন কাজ করেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে। তাঁর, স্টিফেন হে এবং মেরি লাগো— এই তিনজনের বইই রবীন্দ্রচর্চায় মূল্যবান বলে বিবেচিত। সম্প্রতি এরকম আর-একটি বই বেরিয়েছে বিলাতপ্রবাসী তিন বাঙালির দ্বারা। বইয়ের নাম *Rabindranath Tagore and the British Press (1912-1941)*। সংকলন করেছেন কল্যাণ কুণ্ডু, শক্তি ভট্টাচার্য, এবং কল্যাণ সরকার। এঁরা লণ্ডনে স্থাপন করেছেন ট্যাগোর সেণ্টার। সেখান থেকেই এই বই বেরিয়েছে ১৯৯০-তে। অ্যাণ্ড্রু রবিনসন সত্যজিৎ রায়ের ভূমিকাসহ রবীন্দ্রনাথের ছবির

নির্বাচিত সংগ্রহ বের করেছেন ১৯৮৯-তে। বইটি রূপা কোম্পানি থেকে বের হলেও সংকলক বিলাতবাসী ইংরেজ। ১৯৮৫-তে লণ্ডনে ট্যাগোরিয়ানদের উদ্যোগে যে-আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রসম্মেলন হয়েছিল তাতে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে *Rabindranath Tagore : Perspective in Time* সম্পাদনা করেছেন মেরি লাগো এবং রোনাল্ড ওয়ারউইক। এই সম্মেলনটি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশ বছর উপলক্ষে। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যাক যে বিশ্বভারতীও একই উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ইংরেজিতে। তার নাম *Rabindranath Tagore in Perspective*— বইটি বেরিয়েছে ১৯৮৯-এ। কানাডায় একটি Rabindranath Tagore Lectureship Foundation আছে। টরেন্টো থেকে ১৯৮৯-এ জে. টি. ওকোলেনের সম্পাদনায় একটি বই বেরিয়েছে, তার নাম *Tagore, Homage in Canada.*

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যে-সব জায়গায় গিয়েছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে সংবাদ সংকলন করে মূল্যবান কাজ এখনও হতে পারে। কেতকী কুশারী ডাইসন থাকেন অক্সফোর্ডে কিন্তু তিনি আর্জেন্টিনায় গিয়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে একটি মনোরম বই লিখেছেন *In Your Blossoming Flower Garden,* বইটি সাহিত্য অকাদেমি দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৯-এ। ওকাম্পোকে নিয়ে বাংলায় প্রথম বই 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' লেখেন শঙ্খ ঘোষ ১৯৭৩-এ।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রালোচনার বৈচিত্র্যের কথা বলেছি। বর্তমানে রবীন্দ্র-সাহিত্যালোচনায় তথ্যের দিকে ঝোঁকটা দেখা যাচ্ছে বেশি। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্বভারতীর বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোষ-জাতীয় বইও প্রস্তুত হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের রবীন্দ্রশব্দকোষ (১৩৭১), সোমেন্দ্রনাথ বসুর রবীন্দ্র-অভিধান, নির্মলেন্দু রায়চৌধুরীর রবীন্দ্রনির্দেশিকা (১৯৬১), চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতির রবীন্দ্ররচনাকোষ (১৯৬২), পুলিনবিহারী সেনের রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (১৩৮০), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি (১৩৮৫)— বইগুলি রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নে প্রাথমিক প্রয়োজন মেটায়। সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদসূচী বইদুটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পুলিনবিহারী সেন ও জগদিন্দ্র ভৌমিক বিভিন্ন উপলক্ষে রবীন্দ্ররচনার সূচী প্রস্তুত করেছেন। তার মধ্যে কতকগুলি পুস্তিকাকারে বেরিয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনাতে বর্তমান প্রবণতা হচ্ছে সাহিত্যবস্তুর ভাব-

বিশ্লেষণকে রবীন্দ্রজীবনের ঘটনা বা ইতিহাসানুগত তথ্যসমাবেশের সাহায্যে স্পষ্ট ও নিরাবেগ করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা। অজিতকুমার চক্রবর্তীর আদর্শ অনুসরণ করে প্রমথনাথ বিশী সীমা-অসীম রূপ-অরূপের তত্ত্ব দিয়ে রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করেছিলেন তাঁর রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ ও রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ বই দুটিতে। মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' রবীন্দ্র কবিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাববিশ্লেষণ রূপনির্মাণের দিক দিয়ে। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা'য় সমালোচনায় সমাজ-সচেতনতার অবতারণা করেন। কিন্তু তিনিও কাব্যের রস উদ্‌ঘাটনেই মূল লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষাকৃত মুখ্য স্থান নিতে থাকে। ক্ষুদিরাম দাশের 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' কিংবা 'সমাজ প্রগতি রবীন্দ্রনাথ' বই দুটি বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি এদিকে ফিরিয়ে দেয়। ক্ষুদিরাম দাশ উপনিষদের প্রভাবকে অপেক্ষাকৃত গৌণ করে দেখেছেন এবং সমকালীন বাস্তবতাকেই কবিমানস পরিবর্তনে সহায়তা করেছে বলে মনে করেন। সাধারণ ভাবে আজকাল সাহিত্যসৃষ্টির মূলে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করা হয়। সেইজন্যে বাংলার রেনেশাঁসের পরিপ্রেক্ষিকায় রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করে তাঁর সাহিত্যকীর্তির মূল্যমান নির্ধারণের প্রয়াস দেখা যায়। এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা এখনও চলেছে। আবার যুগ এবং ইতিহাসের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখবার আর-একটা দিকও আছে। প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়ে কবি-আবির্ভাবকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা দেখা যায় শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ' এবং প্রবোধ-চন্দ্র সেনের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। এই দুই ধরনের আলোচনাই ইতিহাস-নির্ভর কিন্তু দুই দৃষ্টিভঙ্গির। দ্বিতীয়টির সূত্রে বৌদ্ধযুগ এবং বৌদ্ধআদর্শ দিয়েও রবীন্দ্রনাথকে বোঝানো হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগ দেখিয়ে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য বিশদ গ্রন্থ রচনা করেছেন। পম্পা মজুমদারের 'রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' এবং কল্যাণীশঙ্কর ঘটকের 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' ছাড়াও এ বিষয়ের আরো বই আছে। সুখময় ভট্টাচার্যের 'সংস্কৃতানু-শীলনে রবীন্দ্রনাথ' বইটি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। আজকাল রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আর-একটি দিকেও প্রবণতা দেখা যায়। বাংলার লোকজীবন এবং লোক-সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ ছিল রামায়ণ-মহাভারত-কালিদাসের প্রতি আকর্ষণের তুলনায় সেটিও বড়ো কম নয়।

রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে সমাজচেতনার অচ্ছেদ্যতাকে প্রমাণিত করতে চেয়েছেন

নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' নামের ছয় খণ্ডে লেখা বইতে। লেখক সমকালীন বিশ্ব-ইতিহাস এবং জাতীয় জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার যোগটিকে রবীন্দ্রজীবনের তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা কবিতার রসের আলোচনা নয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে কবিতার প্রমাণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে একটা শক্তভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা সামাজিক চিন্তার বাস্তব রূপ পাওয়া যায় এই বইতে। এই রীতিতে আজকাল রবীন্দ্রচর্চার একটা প্রবণতা গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের তথ্যমূলক আলোচনার আরো অন্যান্য দিক আছে যেমন তাঁর ভাবনাচিন্তা। ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে গভীর ঔৎসুক্য ছিল 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলাভাষা-পরিচয়ে' তার প্রমাণ আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা বইতে সে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'বাক্‌পতি' এই অভিধা নিয়ে বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। পবিত্র সরকার, শিশিরকুমার দাশের মতো ভাষা-বিজ্ঞানের আধুনিক পথিকরাও রবীন্দ্রনাথকে নতুন আলোতে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা ও ব্যাকরণচর্চা নিয়েও বই লেখা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে কতখানি যুগোপযোগী করে দেখবার চেষ্টা হচ্ছে তার আর-একটি দৃষ্টান্ত তাঁর দার্শনিক চিন্তার নতুন ব্যাখ্যা। আমরা এতকাল বেদান্ত বৈষ্ণব এই ভারতীয় তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হতে দেখছি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই আমাদের লোকধর্মকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই সূত্র ধরে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে বাউলের মনের মানুষের প্রসঙ্গও আসা স্বাভাবিক। এঁরা সমকালীন য়ুরোপীয় দর্শনের সঙ্গেও রবীন্দ্রদর্শনের মিল দেখিয়েছেন। অলোক ভট্টাচার্য তাঁর 'আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ' বইতে (১৯৮০)। রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক উপন্যাস চিত্রকলা— সাহিত্যের সকল সৃষ্টির মধ্যেই এই দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় লেখক বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে অস্তিবাদীর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী তাঁর গীতাঞ্জলির আলোচনায়। কিন্তু আবু সয়ীদ আইয়ুবের তিনখানা বই 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' (১৩৭৫), 'পান্থজনের সখা' (১৩৮০) এবং 'পথের শেষ কোথায়' (১৩৮৪) কোনোটাই কোনো বিশেষ প্রচলিত দার্শনিক তত্ত্বের পথ ধরে লেখা না হলেও স্বাধীন গভীর এবং সেইসঙ্গে এক মুক্ত উদার জীবনবোধের দ্বারা সমগ্র আলোচনা পরিশীলিত।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির অন্যান্য দিক নিয়েও প্রচুর আলোচনা হয়েছে। গল্প-

উপন্যাস নিয়ে চরিত্র-কাহিনী বিশ্লেষণমূলক গতানুগতিক ধারার মধ্যে নতুন একটি উদ্যমের সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গল্প-উপন্যাসের কাহিনীর মূলে আছে বিদেশী কোনো কাহিনী। বিষয়টির প্রতি প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অর্চনা মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা' (১৯৭০) বইতে। 'গোরা' উপন্যাসের সঙ্গে জর্জ ইলিয়টের 'হেলিক্স হোলট' এবং 'যোগাযোগে'র সঙ্গে গল্‌সওয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা', 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সঙ্গে রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'প্রিন্স অটো' উপন্যাসের সাদৃশ্য তিনি দেখান। তখন তাঁর লেখা কোনো বিতর্ক তোলে নি সম্ভবত বলবার ভঙ্গির জন্য। পরে প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস বিষয়টাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাকৃত জ্ঞানে গ্রহণ করেছেন এই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি 'গোরা' এবং 'রক্তকরবী' সম্বন্ধে লেখেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পও যে বিদেশী সাহিত্য থেকে নেওয়া— সে কথা বিস্তৃত ভাবে লেখেন 'রবীন্দ্রনাথের রহস্য গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮৪) বইতে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একালের তরুণ লেখকরা যে মোহমুক্ত হচ্ছেন তার আভাস তাঁদের নির্বিচার তথ্য উপস্থাপনাতে পাওয়া যায়। নিত্যপ্রিয় ঘোষের 'মুক্ত একক রবীন্দ্রনাথ', 'স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ' বইগুলিতে লেখকের অনুসন্ধানী রবীন্দ্রচর্চা বিশেষত্ব অর্জন করেছে। শঙ্খ ঘোষের 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' (১৩৮৯) বইতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা আধুনিকতাকে স্বীকার করতে পারে নি। শুধু সাহিত্য নয় তাঁর আচরণেও যে সংশয়ের অবকাশ আছে সে প্রশ্ন এঁরা তুলেছেন রবীন্দ্র-নাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির প্রসঙ্গেও। এমনি একটি বই লিখেছিলেন হেমেন্দ্র মিত্র— *Tagore Without Illusion* (1983)।

এরকম সমালোচনার মূল্য শেষ পর্যন্ত যাই দাঁড়াক, পূর্বযুগের রবীন্দ্রবিদূষণের থেকে এর প্রকৃতি আলাদা। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের চেয়ে এ-সব ক্ষেত্রে লেখকের সোৎসাহ রবীন্দ্রচর্চাই প্রবল। এই উৎসাহ সর্বত্রই আছে তাই রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও কীর্তির সব দিক নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। তার অনেকটা চর্বিতচর্বণ হয়ে যাচ্ছে সত্য, তবু অভিনবত্বও যথেষ্ট। রবীন্দ্রসংগীত-সম্পর্কিত বই এবং প্রবন্ধ কাব্যালোচনার চেয়ে নেহাত কম হবে না। শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত (১৯৮০) ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম (১৯৫৪) বা কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা, প্রফুল্লকুমার দাসের রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমায় মূল কথাগুলি সবই পাওয়া যাবে, তবু কিরণশশী দে'র 'রবীন্দ্রসংগীতে প্রামাণ্য সুর প্রসঙ্গে' বইতে কিংবা দেবব্রত বিশ্বাসের 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত'

বইতে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ পাওয়া যেতে পারে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গান, নাটক, নৃত্যনাট্য এবং অভিনয় নিয়ে আলোচনার প্রাচুর্য সাম্প্রতিক কালে লক্ষ করা যায়। বহুরূপী নামক নাট্যসংস্থাটি রবীন্দ্রনাটককে সাধারণ মঞ্চে নিয়ে এসে নতুন ধরনের নাট্যচেতনার সৃষ্টি করছে। অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের খুঁটিনাটি ইতিহাস লেখা চলেছে। রবীন্দ্রনাথকে কতভাবেই দেখা হচ্ছে। কেরানী রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, ক্ষমাপ্রার্থী রবীন্দ্রনাথ, আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ, আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ, বক্তা রবীন্দ্রনাথ, যেমন আছে, তেমনি আছে চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, মঞ্চে রবীনদ্রাথ, ফরাসিদের চোখে রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ, ভ্রমণকারী রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিও। রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান নামে পরিমল গোস্বামীর এবং 'রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার' নামে ক্ষুদিরাম দাশের বই কবিকে আর-এক দৃষ্টিতে দেখবার প্রয়াস। রবীন্দ্রসাহিত্যকে আর-এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রচিত্রকলা : রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকা' (১৯৮২)।

সকলের কথা কিংবা সব বইয়ের উল্লেখ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সমস্ত বৈচিত্র্যের উল্লেখ। শুধু একটি দিকের কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাভাষী দেশ রবীন্দ্রচর্চায় পশ্চিমবঙ্গের মতো ব্যাপকতা অর্জন করতে না পারলেও তাঁদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যে কতখানি তা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করতে হচ্ছিল বলেই পাকিস্তানের সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ হয়ে দাঁড়িয়েছেন অস্তিত্বের প্রতীক। তাই সেদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা দ্রুত প্রসার লাভ করছে। তাঁরা দাবি করেন রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উৎস পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ। গোলাম মুর্শেদের 'রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ' বইটি এই দিক থেকে অবশ্যই বিশেষত্বপূর্ণ।

—

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ১৩৩২। (১৯২৫)। সিরাজদ্দৌল্লা। কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। (সম্পাদক) ১৯৭৭। (১৩৮৪)। বঙ্কিমচন্দ্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। (সম্পাদক) ১৩৭৮ (১৯৭১)। অন্যোন্যদর্শন : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা : ক্লাসিক প্রেস

ক্ষিতিমোহন সেন। ১৩৯৪। (১৯৮৭)। দাদু, দ্বিতীয় সংস্করণ, শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ

পুলিনবিহারী সেন। (সম্পাদক)। ১৩৬৮ (১৯৬১)। রবীন্দ্রায়ণ খণ্ড ২। কলিকাতা : বাক্ সাহিত্য

পুলিনবিহারী সেন। ১৩৮০। (১৯৭৩)। রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী, খণ্ড ১। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

প্রবোধচন্দ্র সেন। ১৯৯২। (১৩৯৯)। বাংলার ইতিহাস সাধনা। পুনর্মুদ্রণ কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৩৬৩। (১৯৫৬)। রবীন্দ্রজীবনী, খণ্ড ৪। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

প্রমথ চৌধুরী। ১৩৫৩। (১৯৪৬)। আত্মকথা। কলিকাতা

প্রমথনাথ বিশী। (সম্পাদক) ১৩৬৪। (১৯৫৭)। ভূদেব রচনাসম্ভার। কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ

প্রশান্তকুমার পাল। ১৩৬৩। (১৯৫৬)। রবি-জীবনী, খণ্ড ১। কলিকাতা : ভূর্জপত্র

প্রিয়রঞ্জন সেন। ১৯৪৪। (১৩৫১)। বাংলায় ধ্রুববাদ। কৃষ্ণনগর কলেজ শত-বর্ষোৎসব স্মারকগ্রন্থ

বঙ্কিম রচনাবলী। ১৩৬৩। (১৯৬১)। পুনর্মুদ্রণ কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। (সম্পাদক)। ১৯৬৫। (১৩৭২)। রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা। কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

Durant. W. 1957. *The Story of Philosophy*. New York : Pocket Book Inc.

Phillips, C. H. (eds.). 1967. *Historians of India, Pakistan and Cylon*. London : Oxford University Press.

Radhakrishnan, S. 1983. *Indian Philosophy* : New Delhi : Blackie and Sons

Ramkrishna Mission. 1969. *The Cultural Heritage of India*. Vol 2 and 3, Reprint. Calcutta : Institute of Culture, Golpark

Sen, D. 1920. *The Bengali Ramayana*. Calcutta : University of Calcutta

Weber, A. 1878. *The History of Indian Literature*. Trubner.

Winternitz, M. 1927. *A History of Indian Literature*. Vol. 1, Calcutta : University of Calcutta.